শ্রীগজেন্দ্রকুমার মিত্র

বন্ধুবরেষু

ওগো, তোমরা কি তাঁকে দেখেছো ?

হিঃ—হিঃ—হিঃ,—পাগলী হাসছে।

ঐ যে,—ঐ দিক্ দিয়ে চলে গেল! সেই যে ভোরবেলা চিৎকার ক'রে ক'রে ছুটে পালালো তোমবা তাঁকে ধরতে পাবলে না।

যত সব হতচ্ছাড়া!—গালাগাল দেয় পাগলী।

পাগলী রাস্তাব ধুলোবালি ছুঁড়ে ছুড়ে মাবছে।

চোখ দুটো টক্‌টকে লাল। এলোমোলা চুল! আঁচলটা মাটিতে লুটোচ্ছে। আহা-হা! বড়লোকেব মেয়ে,—বড়লোকের ঘরে বিয়েও হয়েছিল। নিজের মেয়েবও বিয়ে দিয়েছে।—কিন্তু সেই মেয়েব বিয়ের রাতেই কি যে হ'ল!—তা দেখে মা'টা পাগল হয়ে গেল!

হবে না?—হবে না? ফিস্‌ফিস্ গুজ্‌গুজ্ কত কথা শোনা যায়।

পাগলী কাঁদছে।

ওগো, তোমবা তাঁকে দেখেছো? সেই যে তোমাদের সেই আউলিয়া! কোথা গেল সে?

আউলিয়া?—তারও ইতিহাস আছে।

ওই যে, পাগলীকে ধবে নিতে ওর বাড়ির লোকজন আসছে। আহা-হা কি যে হয়ে গেল!

আউলিয়া এখানেই ছিল। পাগল,—সিদ্ধ পুরুষ আউলিয়া। আউলিয়া চলে গেছে। কেন চলে গেল, কেউ জানে না। হ্যাঁ. পাগলীর মেয়েটা বেঁচে গেছে বটে। কিন্তু সেদিন থেকেই সুরুচিরাণী পাগল হয়ে গেল। ডাক্তার-বদ্যি হার মেনে গেছে।

সে যে অনেক কথা।

সুরুচিরাণীও সব কথা জানে না। কি করে জানবে?—তার জন্যই যে এত কাণ্ড ঘটেছে, সে কি এত কথা ভেবেছিল? আউলিয়া

এসে বসত ওই বটগাছটার তলায়।

এক দৃষ্টে তাকিয়ে থাকত আউলিয়া। সুরুচিরাণীও তাকে কত দেখেছে! কিন্তু আউলিয়ার রহস্য সেও জানত না।

—ঐ শোন!

—না, না, না। আমায় ছেড়ে দাও! ছেড়ে দাও!

চিৎকার করছে পাগলী।

আজ পাগলী খুঁজে বেড়াচ্ছে সেই আউলিয়াকে। আর তার আগের কথা,—প্রভাতের রঙ, আর সোনালী স্বপ্ন।

রাত্রিশেষের আকাশ।

খসে পড়ল একটি তারা। এ যেন একটা অঘটন। আউলিয়ার চোখের সামনেই এঁকে বেঁকে রুপোলী রেখা টেনে তারাটা নিচের দিকে নামতে নামতে কোথায় মিলিয়ে গেল।

আকাশের তারা;—না, ঐ তারার মাঝে কে যেন তারা হয়ে লুকিয়ে ছিল। তাকেই খুঁজছে আউলিয়া দিনের পর দিন।

আউলিয়া হঠাৎ যেন সম্বিৎ ফিরে পায়। চিৎকার করে হাঁক দিয়ে উঠল,—কে?—কে তুমি?

নিমেষের মধ্যে ঘটল এ ঘটনা। সঙ্গে সঙ্গে তারাটাকে লক্ষ করে ছুটে গেল আউলিয়া।

—দাঁড়া, দাঁড়া, দাঁড়া।

কিন্তু কোথায় কে? খসে পড়া তারা কি কেউ কোনোদিন খুঁজে পায়?—আপন মনে গজরাতে থাকে আউলিয়া।

উপরে মিটিমিটি শুকতারা জ্বলছে। তার মুখে যেন বিদ্রূপের হাসি। শুকতারাও কথা বলছে,—ভুল, ভুল। সবই ভুল। আমার নাগাল কি কেউ কোনোদিন পেয়েছে?

—না, না, না। পালিয়ে গেল। শুকতারার দিকে তাকিয়ে বিড়বিড় করে বকতে লাগল সে। তারপর আকাশের দিকে হাত

বাড়িয়ে দিল। দু'হাতের ভঙ্গী দেখে মনে হয়, গায়ের সমস্ত শক্তি উজাড় করে কাকে যেন টেনে নামাচ্ছে।

—না, হল না।—ক্লান্ত হয়ে দাঁড়িয়ে রইল আউলিয়া। হতাশার দৃষ্টি তার চোখে। অন্ধকার তরল হয়ে আসছে। মাটির উপর পড়েছে তার দীর্ঘায়ত ছায়া। জটা-জটা এলোমেলো চুল। মুখে লম্বা গোফ-দাড়ি। দীর্ঘ দেহ। ছ'ফুটেরও বেশী হবে।

একটি একটি করে তারা আকাশে মিলিয়ে যাচ্ছে। পুব আকাশে সাদা সাদা ছোপ পড়ছে। বইছে হিমেল হাওয়া, তরল অন্ধকারকে পুব থেকে পশ্চিমে যেন ঠেলে ঠেলে তাড়িয়ে দিচ্ছে।

দিগ্‌বলয়ের গায় শ্যামল উচুনিচু পাহাড়ী রেখা। তার উপর আকাশের গায়ে সাদাকালো মেঘের আস্তরণ। কে যেন সে আস্তরণ সরিয়ে দিচ্ছে। একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকে আউলিয়া।

মেঘের ফাঁকে ফাঁকে বেরিয়ে আসছে অপরূপ ছটা। হঠাৎ যেন বেরিয়ে পড়ল ঘোমটা-পরা এক কালো মেয়ের হাতের সোনালী কাঁকন! ঝিলমিল করে উঠল। কি সুন্দর!—প্রণাম করছে ঊষা। জবা-ভরতি সোনার থালা এগিয়ে দিয়ে সোনালী হাসি ছড়িয়ে দিচ্ছে সে মেয়ে। সে থালায় পা রেখে দিগ্‌বলয় থেকে বেরিয়ে আসছে। সূর্য,—দিবাকর। মিলিয়ে গেল ঊষা।

হিমেল হাওয়া আঙুল বুলিয়ে বুলিয়ে নদীরও ঘুম ভাঙিয়ে দিচ্ছে। শিউরে শিউরে উঠছিল তার বুক। ঊষার মুখের হাসির ঝিলিক তারও ঘুম ভাঙিয়ে দিয়েছে। ঘুম ভাঙার হাসি তার রুপালী ঠোঁটে।

আউলিয়া হাসছে।

হঠাৎ তার মুখ থেকে বেরিয়ে আসে—"জবাকুসুমসঙ্কাশং"—। কথাগুলো উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গেই গম্ভীর হয়ে যায় আউলিয়া। মনে হয় কোনো এক স্বপ্নরাজ্যে সে চলে গেছে।

আকাশের কোলে কে যেন রঙের তুলি বুলিয়ে দিচ্ছে। আউলিয়ার চোখের উপর ভাসে ছবির পর ছবি। দূরে, বহুদূরে যেন তার দৃষ্টি চলে

যায়। ঐ যে গাছপালা ঘেরা ছোট একটি গ্রাম। তার পাশ দিয়ে একটি নদী বয়ে যাচ্ছে। নদীর ঘাটে বড় একটা শিমূলগাছ। বিজয়ার ঘাট! বিজয়ার দিন বিসর্জনের মেলা। বাঁশি বাজিয়ে ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা ছুটাছুটি করছে। ঐ যে নদীর জল তোলপাড় করে একটা জাহাজ বিরাট আওয়াজ তুলে উজানের দিকে চলে যাচ্ছে।

—বাব্বাঃ কি ঢেউ! হেঁই, হেঁই. হেঁই—দুর্গা মায়িকী জয়! কাঁধে করে সাঁওতালরা বড় বাড়ির প্রতিমার কাঠামো নিয়ে আসছে। শাঁখ বাজছে। কাঁসর ঘণ্টা বাজছে। ঢাক ঢোলের বাজনা তা ছাপিয়ে উঠেছে। কলাবউ কোলে নিয়ে এগিয়ে আসছেন অশ্বিনী ভট্‌চাজ্‌।

আউলিয়া স্বপ্ন দেখছে, কিন্তু সত্য কি এ স্বপ্ন? তার মনে হচ্ছে সব লোকই তার যেন চেনাজানা। ঐ ঘাট, ঐ নদী, ঐ লোকজনের মাঝে সেও রয়েছে। এক একবার ঐ মিছিলের দিকে তাকায়, আবার নিজের দেহের দিকেও তাকায আউলিয়া!

—ঐ যে, বাজারের দিকে চলে গেছে লোক্যাল বোর্ডের সড়কটা। ঐ যে, ঐ যে সেই বাড়িটা। খট্‌ খট্‌ খড়মের আওয়াজ শোনা যাচ্ছে। নিকানো উঠোনের এক কোণে তুলসী বেদী। তারই গা ঘেঁষে একটি শিউলিগাছ। খড়মের আওয়াজে একটি ছোট ছেলের ঘুম ভেঙে গেছে। দু'হাতে চোখ কচলাতে কচলাতে ঘর থেকে বেরিয়ে আসছে একটি ছেলে। কতই বা তার বয়েস হবে!

—আর উঠোনে দাঁড়িয়ে আছে একটি পুরুষ। দীর্ঘ তার দেহ। ঊষার হাতছানি আকাশে। পূর্ব দিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে মন্ত্র বলছে সে পুরুষ—ওঁ জবাকুসুমসঙ্কাশং—। তার গলায় ধবধবে পৈতার গোছা।

আউলিয়ার মন তোলপাড় করে ওঠে। হঠাৎ যেন মনের রুদ্ধ কপাট খুলে যায়। চমকে ওঠে আউলিয়া।—সে তো আজকের কথা নয়। মনে হয় কোন্ যুগে কোন্ কালে তা ঘটে গেছে। কত চেনাজানা

ওই পুরুষটি। কিন্তু কিছুতেই মনে করতে পারছে না!—কোথায় তারা?

তবে কি এসব পূর্বজন্মের কথা? আউলিয়া কি তবে জাতিস্মর! পূর্বজন্মের কথা মনে পড়ছে!

কি বলতেন সেই ব্রাহ্মণ?—ব্রাহ্মমুহূর্ত। এ সময় দেবতারা নেমে আসেন পৃথিবীতে। আর আসেন যত সব শুদ্ধ আত্মা মহাপুরুষ। এই হিমেল হাওয়ায় তারা ভেসে বেড়ান। অন্ধকার যেমন দূর হয়ে যাচ্ছে, তেমনি তাদের স্পর্শ পেলে মানুষের তমোভাবও দূরে হয়ে যায়। এমনি মাহাত্ম্য এই ব্রাহ্মমুহূর্তের।

আউলিয়ার কানে ভেসে আসছে সে সব কথা। —কত খুঁজেছে, আজো খুঁজছে। কই, কাউকে তো দেখতে পায়নি এই হিমেল বাতাসে। তবে হ্যাঁ, দেখেছে, ফুল ফোটার সে আশ্চর্য ব্যাপার। একটি একটি করে পাপড়ি খুলছে। পুব আকাশে সোনার কাঁকনের ঝিলিমিলির সঙ্গে সঙ্গে হাসি ফুটে ওঠে ফুলগুলোর মুখে। চোখের সামনে সে কি অবাক কাণ্ড! তুলি নেই, রঙ নেই, কোনো কিছুই নেই। কারো হাত দেখা যায় না। কেমন নিঃশব্দে সব কাজ চলে। ফুলে ফুলে রঙের খেলা! কে এই যাদুকর অদৃশ্য শিল্পী!

একজন আছেন। তিনিই সব করছেন। এই যে সূর্য—সবিতা। তাঁরই মাঝে রয়েছেন সেই তেজোময় পুরুষ। তাঁরই খেলা এসব। তাঁর হাতের কাজ চলছেই। বিশ্বজোড়া তাঁর হাত। বিশ্বজোড়া তাঁর চোখ। আকাশে বাতাসে মিশে আছেন তিনি।—আউলিয়া এসব কথা কিন্তু বুঝতে পারে নি।

অবাক হবারই কথা। এত বড় পৃথিবী। দুখানি হাত একই সঙ্গে সারা পৃথিবীর বুকে ফুল ফোটায়!

হাসতেন সেই পুরুষটি।

গুন্‌গুন্ করে গানও গাইতেন—"ইচ্ছাময়ী তারা তুমি"। ভাবছে

আউলিয়া। মনে হ'ল সেই পুরুষটি তাকে বড় ভালবাসতেন। তাঁর কাছে কত আব্দার করত সে। অথচ কোথায় তিনি?

পর্দার পর পর্দা সরে যায়। দৃশ্যের পর দৃশ্য। আকাশে না নিজের চোখের ভেতরে? আউলিয়া তার দুটি চোখ হাত দিয়ে রগড়ায়। মাথাটা বারবার ঝাঁকিয়ে ওঠে। আবার সে আকাশের দিকে চোখ মেলে,—এক একখানি করে মুখ ভেসে ওঠে আকাশে।

দাদু!—হঠাৎ এই শব্দটি উচ্চারণ করে আউলিয়া। তারই দাদু,—তারই দাদু সেই শান্ত পুরুষটি।

তবে কি তারও ঘরবাড়ি ছিল? তারও বাপ-মা, ভাই-বোন ছিল। তারা আজ কোথায়? কোথায় তার বাড়ি, কোথায় তার ঘর? কিছুই মনে পড়ছে না।

না, না,—সে আউলিয়া। এই ঘরবাড়িওয়ালা মানুষগুলোর সঙ্গে তার কি সম্পর্ক?

—ঐ যে আবার দাদু মন্ত্র আওড়াচ্ছেন। আবার মিলিয়ে গেলেন। আবার, আবার সেই খড়ের ছাউনি ঘরখানি। খাটিয়ায় ক'রে দাদুকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছে। উঠোনে গড়াগড়ি দিচ্ছে এক বুড়ী। পিসীমা? —সত্যই তার এক পিসীমা ছিল! —ঐ যে আরো দুটি মুখ!—বাবা আর মা! আবছা আবছা মনে পড়ছে। একটি ছোট ছেলে অবাক হয়ে সে দৃশ্য দেখছে। পিসীমা তাকে বুকে জড়িয়ে ধরে হাউ হাউ করে কেঁদে উঠলেন।

সেই ছোট ছেলেটির মাঝে নিজের প্রতিচ্ছবি দেখে আউলিয়া। সবই কি তবে স্বপ্ন, না পূর্বজন্মের কথা। সেই বুড়ী পিসীমার কাছে কত গল্প শুনত সেই ছেলেটি।

আউলিয়া যেন সেই ছেলেটি সেজে আজ সে গল্প শুনছে। মায়ের কথা! মাকে যে কিছুতেই মনে আনতে পারে না আউলিয়া। কিন্তু মনে পড়ে যেন তার বাবা এক নিশীথ রাতে উধাও হয়েছিল, আর ফিরে আসে নি।

বুড়ী পিসীমা কাঁদছেন, আমাব কপালে এত শোকতাপ দিল রে হতভাগা! সবাই ছেড়ে গেল' তোকে নিয়ে আমি কোথা যাবো?

স্বদেশী ডাকাতি করতে গিয়ে প্রাণ দিয়েছে সেই ছেলেব বাবা। —পিসীমার কান্না আব থামে না!

আহা-হা, অবুঝ বালক! গাঁযেব সবাই তাকে ভালবাসে। পিসীমার আদবে বড় হয়ে ওঠে সে বালক।

এ কি? ঘব থেকে কোঁচড়-ভবতি নাবকেলেব নাড়ু নিয়ে পালিয়ে যাচ্ছে সেই ছেলেটি। পিসীমা বকাবকি কবছেন।

—ঐ যে জামগাছে উঠে একটা ডালে ঝাঁকুনি দিচ্ছে সে। ঝর-ঝর টপ্‌টপ্‌ শব্দ হচ্ছে।

—থামো, থামো। কি যে হচ্ছে? উঃ, উঃ, মাথাটা গেল যে। —একটি ফ্রক্‌পবা ফুট্‌ফুটে মেয়ে বলছে। মেয়েটি জাম কুড়োচ্ছে আব বকবক্ করছে। মাঝে মাঝে মাথায় হাত বুলোচ্ছে। মেয়েটি হাসছেও, আবাব চোখও রাঙাচ্ছে।

স্বপ্ন!—হঠাৎ চিৎকাব করে ওঠে আউলিয়া।

—কে? কে এরা?

তার চিৎকাবে নির্জন এ জঙ্গুলে জাযগায় কেউ সাড়া দেয় না।

•

টিলাগড়েব এ নির্জন জঙ্গুলে জাযগায় শেষ রাতে ফিরে আসে আউলিয়া। সামনে নদী। এদিক ওদিকে পাহাড়ী টিলা। নদীর ধারে বড় বটগাছটার তলায় কিছুক্ষণ ঘুমিয়ে আবার জেগে ওঠে।

কতদিন এ রকম অদ্ভুত স্বপ্ন দেখেছে। সে কোনো কিছুই বুঝতে পারে না। সবাই তাকে আউলিয়া বলেই ডাকে। যাযাবরের জীবন। আজকের স্বপ্ন কিন্তু বড়ই অদ্ভুত!

আবার তন্ময় হয়ে পড়ে। এবার দেখে তার সামনে বড় একটা পুকুর।—কাজলপুকুর। থই থই করছে জল। পুকুরের উত্তর-পশ্চিম কোণে একটা তালগাছ। ঝুপ্‌ঝুপ্‌ করে তাল পড়ছে জলে। কালো

কালো বাউস্ মাছগুলো ভেসে উঠছে। ঐ যে রূপসীতলা। পলাশ আর শ্যাওড়া বনের ঝোপের মাঝখানে মস্তবড় সিঁদুরলেপা বেদী। ফুল বেলপাতা ছড়িয়ে আছে এধারে-ওধারে। আবার সেই মেয়েটি আর ছেলেটিকে দেখতে পায় আউলিয়া। ছেলেটির হাত ধরে টানাটানি করছে মেয়েটি। দু'জনে একসঙ্গে জলে ঝাঁপ দিল।

কাজলপুকুরে ঝুপ্‌ঝাপ্ শব্দ হচ্ছে। ডুব দিয়েছে সেই মেয়ে। ঐ যে মাথা তুলেছে। খিলখিল করে হাসছে। আর মুখ দিয়ে পিচকারির মত জল ছড়িয়ে দিচ্ছে।

—ধরতে পারল না!—আবার ডুব দিলে সেই মেয়েটি।

নাঃ, সত্যি তাকে ধরতে পারল না। কোথায় সে?—আউলিয়ার মনে যেন বাস্তব সত্য হয়ে ওঠে সেই স্বপ্ন?

আবার বিকট হাসি হাসে আউলিয়া—হাঃ—হাঃ—হাঃ।

কাক ডাকে। ঝাঁকে ঝাঁকে পাখি উড়ে আকাশে।

আউলিয়া,—দরবেশ!

মাঝে মাঝে দেখা দেয় এই আউলিয়া। কেউ বলে হিন্দু, কেউ বলে মুসলমান। কেউ কেউ বলে, আউলিয়ার আবার জাত কি? —সিদ্ধপুরুষ।

সিদ্ধপুরুষের জাতের বালাই নাই।

কেউ কেউ আবার তত্ত্বকথাও বলে।—কিন্তু যে সে পাগল নয়! পরশমণির পরশ পেয়েছে। তাইত পাগল হয়ে গেছে। সোনাদানার কোন মূল্য তার কাছে নেই। আর জাতকুল ত তার কাছে সবই ভুয়া। সবই মায়ার বাঁধন।—মায়ার খেলা।

তার আচার আচরণ পাগলের মতই বটে। সকলেই তাকে ভয় খায়। তার পরিচয় কেউ জানে না। ছেলেবুড়ো সকলের কাছেই তার একই পরিচয়—পাগলা আউলিয়া।

কেউ কেউ বলে রজব আউলিয়া। তার আর কোনো পরিচয় নেই,

কোথায় বাড়ি, কোথায় ঘর কেউ জানে না। অথচ রজব এই নামটি কারা দিল, কিংবা কি করে জানল কেউ বলতে পারে না। এই নিয়ে মাঝে মাঝে তর্কও ওঠে।

পঞ্চাশ বছরের বুড়োও বলে, সেই ছোটবেলা থেকে আমি তাকে একই রকম দেখে আসছি।

ছোটো ছোটো ছেলেমেয়েরা অবাক্ হয়ে যায়। পঞ্চাশ বছর ধরে একই রকমের রয়ে গেছে!

ওরা ত জানে না, নিজের পরিচয় আউলিয়া নিজেই ভুলে গেছে। সে নিজেই অনেক সময় একথা ভাবে। সবই এলোমেলা হয়ে যায়। যা মনে পড়ে, সবই মনে হয় স্বপ্ন!

কেউ জিজ্ঞেস করলে মাঝে মাঝে আনমনা হয়ে ওঠে। নামের একটা আওয়াজ কানে ভেসে আসে। কোন্ এক দূর কালের ছবি ভেসে ওঠে চোখে। কোনো কিছুই মনে পড়ে না।

ধরতে গিয়েও ধরতে পারে না। অনেকক্ষণ কান খাড়া করে চুপ করে বসে থাকে। তারপর মাথাটা ঝাড়া দিয়ে ওঠে।

নাম?—রজব। না, না রাজীব! হাওয়ায় যেন নামের আওয়াজ ভেসে ভেসে আসছে।—হ্যাঁ, নাম একটা ছিল বই কি? কত নাম? এক একবার সন্দেহ জাগে—এরকম কি কোনো নাম তার সত্যি ছিল?

নিশ্চয়ই ছিল। ওরা যার যা খুশি তাই বলে ডাকে,—আউলিয়া, দরবেশ, পাগলা ফকির, সাধুবাবা।

সকলেরই নাম আছে। নাম?—এ যে এক একটা ছাপ! নামের ছাপেই মানুষের পরিচয়। তার কি কোনো নাম নেই! নাম আছে বলেই সুনাম আর দুর্নাম।

হিঃ—হিঃ করে হাসে আউলিয়া,—বেশ হয়েছে। তার কোনো নাম নেই। সুনাম আর দুর্নামের বাইরে চলে গেছে আউলিয়া! এ তো ভালই হয়েছে। নামের ভার তারা সইতে পারে না, তাই সকলেরই কাঁধে নামের ভার চাপিয়ে দিতে চায়। বাবা-মা নাম রাখে।

সুন্দর অসুন্দর কত নাম!

আপন মনে ভাবতে থাকে আউলিয়া—

সত্যি কি সে সিদ্ধপুরুষ? লোকগুলো বড় বিরক্ত করে। এক একবার রাগে ফেটে পড়ে আউলিয়া। ওরা তার দয়া চায়! তার দয়ায় না কি সব বিপদ্ কেটে যায়?

দূর্—দূর্—সব হট্ যাও।

রাতের অন্ধকারে তার হুঙ্কার শোনা যায়। মাঝে মাঝে বিকট হাসি—হাঃ—হাঃ—হাঃ!

নদী। নদীর ধারে বড় শহর। শহর থেকে জালালপুরের দিকে একটা সড়ক চলে গেছে। সেই সড়কের পাশের বাড়িগুলোর লোকজন রাত্রে আউলিয়ার চিৎকার শুনতে পায়—সব ঝুট হ্যায়। সব ঝুটা হ্যায়! গরদান লেয়েঙ্গে—হাম দুনিয়াকা মালেক, দিল্লীর বাদশা, খবরদার! খবরদার!

ঘুমন্ত শিশু আতকে ওঠে। মায়েরা হাত জোড় করে প্রণাম জানায়। মুসলমানেরা হাত তুলে খোদার দয়া ভিক্ষা করে।—আউলিয়া এসে গেছে। এই হুঙ্কারই তার আগমনবার্তা জানিয়ে দেয়। বিশ্বাসীরা বলে, জবরদস্ত সাধু, সিদ্ধপুরুষ। অমঙ্গল দূর করতেই দেখা দিয়েছে আউলিয়া।

কোথায় থাকে আর কোথা থেকে আসে কেউ জানে না। মাঝে মাঝে এমনি আউলিয়া আসে। মাস দেড়েক থাকে আবার কোথা উধাও হয়ে যায়। আউলিয়ার সম্পর্কে নানা জনে নানা কথা বলে। অবিশ্বাস্য,—আজগুবি সব গল্প।

সতীশ উকিলের মুহুরী গিরিজা সরকারও আউলিয়ার নাম শুনলেই হাত জোড় করে প্রণাম জানায়।

—ওরে বাবা! যে সে মানুষ নয় এই আউলিয়া! বহু ভাগ্যে এমন মহাপুরুষের দর্শন মেলে। মস্ত বড় সাধক। জানো, সেবার করিমগঞ্জে লাগল ওলাউঠার মড়ক। ঘরে ঘরে লোক মরছে।

কুশিয়ারা আর নটীখালের ঘাটে ঘাটে চিতা জ্বলছে। মড়ার পর মড়া। শেষকালে এমন দাঁড়াল যে কোনো কোনো বাড়িতে রোগীর মুখে জল দেবার পর্যন্ত লোক নেই। মড়া দেখতে দেখতে সবাই কাঠ মেরে গেছে। এমন কি ছেলে চোখের সামনে মরে যাচ্ছে, মায়ের চোখে জল নেই। কাঁদবে কি করে? আর কাঁদবেই বা কে? ডাক্তার কবরেজ সব নাজেহাল। কোর্ট কাছারি বন্ধ। ইস্কুলে ছেলে নেই। দুপুরেও শহরটা কেমন যেন ভয়ে নিঝুম হয়ে গেছে; এমনি এক নিশুতি রাতে রজব আউলিয়ার জিগীর শোনা গেল—হুঁশিয়ার! সব ঝুটা হ্যায়, বিলকুল সব ঝুটা হ্যায়, হাম দুনিয়াকা মালেক।—আজব কাণ্ড! অমনি পরদিন থেকেই মড়ক বন্ধ হ'ল। চিতার আগুনও নিভল। লোকের মুখে হাসি ফুটল।

হাটে বাজারে মজলিসে এমনই গল্প চলে। গিরিজা সরকারের গল্প দিনে কম করে তিনবার করে সবাই শুনছে। আর ভয়ে বিস্ময়ে তাদের গা যেন কাঁটা দিয়ে উঠছে।

নন্দ পরামানিক ভূতপেত্নী বিশ্বাস করে না। অবশ্য কোথায় কোন্ ভূতকে কোন্ দিন জব্দ করেছিল, কোন্ ব্রহ্মদৈত্যর সঙ্গে তার হাকালুকীর হাওরে নিশীথ রাতে মোলাকৎ হয়েছিল, তার গল্প ফাঁদে। সেই নন্দ পরামানিক গিরিজা সরকারের গল্প শুনে মন্তব্য করে—যা বলেছো সরকার মশাই! আউলিয়াবাবা যে সে মানুষ নয়। একেবারে পরমহংস, কিছুতেই ধরা ছোঁয়া দেন না।

গিরিজা সরকার বলেন,—তা আর বলতে। করিমগঞ্জে ত আমার স্বচক্ষে দেখা। সুশীল ডাক্তারের জোয়ান ছেলেটা ত মরেই গিয়েছিল। ঘর থেকে বের করে আর কি! অমনি শোনা গেল,—আউলিয়ার জিগীর? আর যায় কোথা? সেই মরা ছেলে যেন সেই জিগীর শুনতে পেল। ধড়মড় করে উঠে বসল সেই ছেলে। নিজের চোখে দেখা নন্দ! সে ত অবিশ্বাস করতে পার না হে!

নন্দ পরামানিক গদ গদ হয়ে মাথা নাড়ে।

গিরিজা সরকার বলতে থাকেন,—আর এক কথা। জান ত আউলিয়া বেশীদিন এক জায়গায় থাকে না! আজ হয়ত দেখবে এই জিন্দাবাজারে, কাল দেখবে শিলচরে। পরশু চাঁদপুরে, তার পরদিন কলকাতায়। হিল্লীদিল্লী উনি চোখের নিমেষে পরিক্রমা করে আসতে পারেন।

নন্দ পরামানিক বলে—আমার ভায়রাভাইও একথা বলে। কলকাতার সাহেবসুবোও আউলিয়াকে দেখলে মাথার টুপী খুলে সেলাম জানায়।

গিরিজা সরকার বলেন—তা আর জানাবে না? রেসের টিপ বলে দেয় যে। জানো শীতকালে আউলিয়া কলকাতায় উধাও হয়। সেখানে বড়দিনে রেস খেলা হয় কিনা?

—রেস? সে আবার কি সরকার মশাই?

—আরে ঘোড়দৌড়। যে ঘোড়া জিতবে তার নাম বলে দেয়।

নন্দ বলে,—হ্যাঁ শুনেছি বটে, ঘোড়দৌড় খেলে অনেকে ফতুর হয়। আবার অনেকে একদিনে রাজা হয়ে যায়।

এমনি কত কথা কত গল্প কাহিনী চলে আউলিয়ার নামে। তারা নাম দিয়েছে রজব আউলিয়া। আউলিয়াকে কেউ তার নাম জিজ্ঞেস করলে হো-হো করে হেসে ওঠে। তারপর ক্ষেপে গিয়ে গায়ে থু-থু দেয়, ধুলোবালি তুলে ছুঁড়ে মারে।

—কি বললি আমার নাম? নাম কিরে হারামীর বাচ্চা? নাম? নামটা কি তোর সঙ্গে যাবে? দেখবি। সব ধুয়ে মুছে সাফ হয়ে যাবে।—নাম?

রাগে গর্‌গর্‌ করে ওঠে আউলিয়া। তারপর সেই বিকট হাসি—হাঃ—হাঃ—হাঃ! রজব আউলিয়া! আচ্ছা নাম দিয়েছে সব হারামীর বাচ্চা।

দিনের বেলা আউলিয়া বড় একটা রাস্তায় বের হয় না। ' কোথায় লুকিয়ে থাকে কেউ জানে না। সকলেরই ধারণা টিলাগড়ের জঙ্গলে

আউলিয়ার আস্তানা। কোনো কোনো দিন নবপল্লীর রাস্তার ধারে যে বটগাছটা আছে তার তলায় তাকে বসে থাকতে দেখা যায়। তারই খানিকটা দূরে সাদা রঙের একটা পাকা বাড়ি। ওই বাড়িটার দিকে আউলিয়া এক দৃষ্টে তাকিয়ে থাকে। আর আপন মনে বিড় বিড় করতে থাকে। আউলিয়ার কাছে বড় কেউ ঘেঁষে না। সকলেই ভয় করে এই আউলিয়াকে। ভয় করে না শুধু একজন,—এক বুড়ী ত্বনিয়ার মা। কিন্তু ত্বনিয়া বলে কেউ ছিল কিনা কেউ জানে না। বুড়ীই আউলিয়াকে এনে দেয় ভাত। কাছে বসে খাওয়ায়।

নবপল্লী। শহরের উত্তর অঞ্চলে নতুন নতুন ঘরবাড়ি উঠেছে। এ অঞ্চলে জঙ্গল আর জলাই ছিল। জঙ্গলটা একটানা টিলাগড়ের দিকে চলে গেছে। জঙ্গলের পরই টিলার পর টিলা। নবপল্লী নাম দেওয়া হয়েছে এর। কেউ কেউ আবার রসিকতা ক'রে সুরুচি কলোনীও বলে থাকে। তারও কারণ একটা আছে।

সাদারঙের সেই বাড়িটাই নবপল্লীর মধ্যমণি। এ বাড়িটাকে কেন্দ্র ক'রেই আশেপাশে আরো কয়েকখানি বাড়ি উঠেছে। এক সময়ে রায়বাহাত্বর কৈলাস দত্তই এই কলোনীর পত্তন করেছেন। নতুন অভিজাত পল্লী। এ পল্লীতে বাড়িকরা বড় গর্বের কথা। যে সে লোক এখানে বাড়ি করতে পারে না। পাঁচশো টাকা কাঠা থেকে এখন পাঁচ হাজারে দাঁড়িয়েছে। নিন্দুকেরা বলে, রায়বাহাত্বরের দূরদৃষ্টি ছিল। দশ বিঘা জঙ্গলে জলা জমি হাজার টাকায় কিনেছিলেন।

সত্যি নবপল্লীর বাহার আছে। আয়ত ক্ষেত্রের মত চারপাশে চওড়া রাস্তা। রাস্তার পাশে পাশে কদম, নিম আর দেবদারু গাছ। নবপল্লীর ঠিক দক্ষিণধার ঘেঁষে মিউনিসিপ্যালিটির বড় পাকা রাস্তা। সেই সাদারঙের বাড়িটার কথাই বলছি। তারও একটা ইতিহাস আছে। আগে এ জায়গায় একটা পুরোনো বাড়ি ছিল। সেই বাড়িটা ভেঙেচুরেই এখন এই সাদা বাড়িটা তৈরী হয়েছে। পুরোনো

বাড়ির শেষ মালিক ছিলেন এক বিধবা। তিনি রায়বাহাদুরের করুণায় এখন কাশীবাসী হয়েছেন।

বাড়িটা দেখলেই মনে হয়,— এ বাড়ির একটা আভিজাত্য আছে। মফস্বলের শহরতলীতে এরকম বাড়ি সহজে চোখে পড়ে না। বাড়ির চারিপাশে অনেকখানি খোলা জায়গা,—নানা ফলফুলের গাছে ভরতি। বাড়ির প্রশস্ত অঙ্গন; তাও বিলাতী কায়দায় সাজানো। মরশুমী ফুলের বাহার। মাঝখানটায় ত্রিকোণ ক্ষেত্রের মাঝখানে নানারঙের গোলাপের টব বসানো। নানা ধরনের মোটর গাড়ি প্রায়ই এ বাড়ির আঙিনায় এসে থামে।

আউলিয়া সমস্ত শহরটায় উন্মত্তের মত ঘুরে বেড়ায়। কিন্তু এখানে এলেই তার উগ্র মূর্তি আর থাকে না। তার চোখদুটিও কেমন যেন শান্ত ও সজল হয়ে পড়ে। রাস্তার ধারেই বিরাটকায় বটগাছ; নানা ধরনের পাখি কিচিরমিচির করছে। আউলিয়া বটগাছের কাছে এসেই থেমে যায়। বাড়িটার দিকে তাকায়। তারপর গাছের তলায় বসে পড়ে। বাড়িটার ভেতর থেকে কখনো বা রেডিওর সঙ্গীত কখনো বা পিয়ানোর আওয়াজ ভেসে আসে। বাড়িটার দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে আউলিয়া কখনো বা হাসতে থাকে কখনো বা বিড়বিড় করে বকতে থাকে। এমন শান্তভাবে আউলিয়াকে বসে থাকতে আর কোথাও দেখা যায় না।

হ্যাঁ, আর একটি জায়গা আছে পীরের দরগা। সেখানেও আউলিয়াকে দেখা যায়। কিন্তু সেখানে এমন চুপ করে বসে থাকে না। দরগার বেদীর চারদিকে উন্মাদের মত শুধু ঘোরে। হাতে থাকে একটি জ্বলন্ত মোমবাতি।

পীরের দরগা। তীর্থস্থানের মতই পুণ্যভূমি। নদীর ধারেই সরকারী তোষাখানা। তারই পাশ দিয়ে জৈন্তাপাহাড়ের দিকে এগিয়ে গিয়েছে একটা বড় রাস্তা। ঐ রাস্তার পাশে পাশে বড় বড় গাছ—বট, শাল, শিমুল, আর কৃষ্ণচূড়া। তোষাখানার পরই খেলার মাঠ। খেলার

মাঠের পর সরকারী স্কুল। তারপরই পীরের দরগা। বড় বড় গাছ আর ঝোপ সে দরগাকে প্রহরীর মত ঘিরে রয়েছে। সাদা চৌকোণা উঁচু পাকা চত্বরের উপর সাদা পাথরের তৈরী মস্ত বড় বেদী। পাঁচটা বেদী। ছায়াঘেরা বনের মাঝখানটা আলো করে যেন পাঁচজন সন্ত সাধু ধ্যানমগ্ন। দিনের বেলায়ও এখানে কেমন এক নিঝুম ভাব। কলরব-মুখর শহরের এ প্রান্তে এসে যেন আশ্চর্যভাবে সব কলরব থেমে গেছে।

পীরের দরগায় আলো জ্বলে। সন্ধ্যা থেকেই জ্বলে আলো। সারি সারি মোমবাতি জ্বেলে দেয় ইমাম মিয়া। পাশেই তার দোকান। তারই দোকানে মোমবাতি কিনতে পাওয়া যায়। অনেকেই মোমবাতি কেনে ; জ্বেলেও দিয়ে যায়। মোমবাতি জ্বেলে দেবার জন্য কেউ বা পয়সাও জমা দিয়ে যায়।

হাজার বাতি জ্বলে সারা রাত। বাতি নিভলেই নাকি অকল্যাণ। যারা বাতি দেয় তাদের মনে ভক্তির চেয়ে আতঙ্কই বেশী। এখানে এলেই গা ছমছম করে। অজানা আতঙ্কে শিউরে ওঠে গা। অনেকেই একথা বলে।

দুঃখীজন মানতও করে। দুঃখ থেকে মুক্তি পাবার জন্য মোমবাতি জ্বেলে দেয়। দুঃখের আঘাতে যারা জর্জর, অদৃষ্টের লাঞ্ছনায় যারা আর মাথা তুলতে পারছে না, নিজের উপর যারা ভরসা হারিয়ে ফেলেছে, তারাই দেয় আলো। তাদের ধারণা, তাদের প্রার্থনা,—দুঃখের আঁধার দূর হয়ে সুখের আলো জ্বলে উঠুক। পীরের দয়ায় আলোয় আলোময় হোক ছেলেমেয়ে বালবাচ্চার জীবন।

সকলেরই যে কামনা-বাসনা কিংবা প্রার্থনা থাকে তাও নয়, অনেকে ভয়েও মোমবাতি জ্বেলে দেয়, পাছে পীর তাদের অনিষ্ট করেন। অনিষ্টের বা ক্ষতির ভয়ই বেশীভাগ লোকের। ভাবে ভক্তি নয়, ভয়েই ভক্তি।

হিন্দু কিংবা মুসলমান কেউ বাদ যায় না। পাঞ্জাবীরা নতুন এসেছে।

তারাও বাতি জ্বেলে দেয়। সাহেবরা পর্যন্ত দরগার কাছে এলে মাথার টুপী খুলে হাতে নেয়। জবরদস্ত জেলা-ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন স্কট সাহেব। খাস বিলাতী সিভিলিয়ান। স্বদেশী আন্দোলনের সময় যিনি নির্বিচারে যত সব স্কুলের ছেলেদেরও সপ্তাহের পর সপ্তাহ হাজতে পুরে রাখার আদেশ দিয়েছিলেন। একজন পুলিশের সাব ইন্‌স্‌পেক্টারকে ঢিল ছোঁড়ার অপরাধে চাঁদনীচকের সমস্ত দোকান-দারকে দায়ী করেছিলেন। সেই স্কট সাহেবও নাকি পীরের দরগার পাশ দিয়ে যেতে মাথা নুইয়ে সেলাম জানাতেন। তাঁর মেমসাহেব তো রোজ দশটা করে মোমবাতি নিজের হাতে জ্বেলে দিতেন। এমনি কত গল্প শোনা যায়।

পীরের দরগার এমনি মাহাত্ম্য। হয়ত এখানে কোনো এক কালে কোনো পীরের আস্তানা ছিল, কিংবা পীরের সমাধি স্থান এটা। তারই যদি এত মাহাত্ম্য, তাহলে রজব আউলিয়ার যে অলৌকিক শক্তি আছে তা উড়িয়ে দেবার উপায় নেই। রজব আউলিয়া— পীর, দরবেশ। পাগলের ভান করেই এরা লোকের চোখে ধুলো দিয়ে বেড়ান!

খাস বিলাতী মেমসাহেব ভক্তিতে না হোক, ভয়েই পীরের দরগায় বাতি দিতেন। সাহেবের খানসামা ইম্তাজ মিয়া মেমসাহেবকে বুঝিয়ে ছিল, স্বদেশীরা যে-রকম বেপরোয়া হয়ে এখানে-ওখানে চোরাগোপ্তা বোমা আর গুলি চালাচ্ছে, একমাত্র পীরের দয়ায়ই সাহেবকে বাঁচানো যেতে পারে। এমন কি কলকাতা শহরের বুকের উপর দিনে-দুপুরে রাইটার্স-বিল্ডিং-এ চড়াও হয়ে কয়েকজন বিপ্লবী গুলি করে সাহেবদের যখন মেরে ফেলেছে, তখন এই মফস্বলের শহরে ভরসাই বা কি আছে? দু'টি নাবালিকা মেয়েও শোনা গেল কুমিল্লা না কোথায় এক সাহেব ম্যাজিস্ট্রেটকে গুলি করে খতম্ করে দিয়েছে। এমনি কত খবর!

রাত-বিরেতে এই দরগায় ঢুকতে কেউ সাহস করে না। যারা

বাতি দিতে আসে, ইমাম মিয়ার হাতেই বাতি জ্বেলে দিয়ে চলে যায়। দিনের বেলায়ও কেউ দরগার ভেতরে যায় না। দরগার গাছে গাছে ভূত-প্রেতের আস্তানা। তারাই না কি দরগা পাহারা দেয়। কিন্তু আাউলিয়ার ভয়ডর নেই। গভীর রাতপর্যন্ত দরগার ভেতরে বকুল গাছটার তলায় বসে থাকে। আর মাঝে মাঝে হাতে একটা মোমবাতি নিয়ে দরগায় চক্কর দেয়।

যত রাত বাড়ে, এ রাস্তা দিয়ে লোকজনের যাতায়াতও তত কমে যায়। ঝপাঝপ, পটাপট্ আওয়াজ শোনা যায় গাছের পাতায় পাতায় আর ডালে ডালে। ঝপ ক'রে কারা যেন এগাছের মাথা থেকে লাফ দিয়ে ওগাছের মাথায় চলে যায়। জ্যোৎস্না রাত্রে কেউ কেউ তালগাছের মাথায় ধবধবে দাড়িওয়ালা মূর্তিও নাকি দেখেছে। কচি ছেলের কান্না তো প্রায় শোনা যায়।

এ পাড়ার বুড়ো-বুড়ীরা বলে,—ও আর কিছুই নয়। শ্মশান থেকে যত সব কচি বাচ্চাদের টেনে তুলে এনে স্বর্গের পথে চালান দেয় পীরের সাকরেদরা। তাই এত কান্না শোনা যায়।

জিন্দাবাজারের যামিনী মহাজন। পীরের উপর তার অগাধ ভক্তি। তার কাররারের এই জমজমাটি না কি পীরেরই কৃপায়। তার গদীতে প্রায়ই এই দরগার বিভূতি নিয়ে আলোচনা বা তর্কবিতর্ক চলে।

একজন বলে ওঠে,—কচি শিশুর কান্না নয়, ওটা প্যাঁচার ডাক।

আর একজন উত্তেজিত হয়ে উত্তর দেয়,—কে বলে প্যাঁচার ডাক? আমার যে স্বচক্ষে দেখা। তালগাছের মাথা থেকে বাচ্চাগুলোকে ছুঁড়ে দেয়।

যামিনী মহাজন গম্ভীর হয়ে বেশীক্ষণ থাকতে পারেন না। তিনি হঠাৎ হাত জোড় করে কপালে ঠেকিয়ে বলতে থাকেন,—এ নিয়ে তর্ক-বিতর্ক চলে না। শম্ভু বাগ্দীর ইতিবিত্তটা মনে করে দেখুন। তার আজ এ অবস্থা কেন? আজ তাকে রাস্তার ধারে পড়ে থাকতে দেখছেন,—পঙ্গু অন্ধ। এক জায়গায় বসে হাত বাড়িয়ে ভিক্ষা

চাইছে। কিন্তু আসল বিত্তান্ত সকলে জানে না। এই শম্ভু বাগ্‌দী ডাকাত ছিল। ভয়ডর ছিল না তার। রাতদুপুরে ডাকাতি ক'রে বাড়ি ফিরছিল। দরগার সামনে যেই এসেছে, অমনি শুনল আউলিয়ার হুঙ্কার। শম্ভু বাগ্‌দী অমনি মূর্ছা গেল। উপুড় হয়ে পড়ে গেল রাস্তায়। ভোরবেলায় বেহুঁস অবস্থায় পুলিশের হাতে ধরা পড়ল। সেই থেকে কেমন যেন পঙ্গু হয়ে গেল শম্ভু বাগ্‌দী; মুখে আর রা নেই। কেমন যেন বোবা-কালা হয়ে পড়েছে। এখন চোখেও আর দেখতে পায় না।

শম্ভু বাগ্‌দীর গল্প শুনে অনেকেই আতকে ওঠে। কেউ কোনো প্রতিবাদ করতেও সাহস করে না। শম্ভু বাগ্‌দীপাড়ারই লোক; একটি মেয়ে রোজ হাত ধরে তাকে নিয়ে এসে রাস্তার বসিয়ে দিয়ে যায়।

যামিনী মহাজন বলেন,—ন্যায় অন্যায় কোনো কিছুই আউলিয়া বাবার চোখ এড়ায় না! শাস্তি পেতেই হবে। শম্ভু গর্হিত কর্ম ডাকাতি করেছে, তাই তার এ শাস্তি।

যামিনী মহাজনের সম্বন্ধে কিন্তু লোকের ধারণা অন্য রকম। নানা জনে নানা কথা বলে। যুদ্ধের সময় না কি মিলিটারী কন্‌ট্রাক্টে এত টাকাকড়ি হয়েছে। সামান্য মুদিখানার দোকান ছিল তার। ওপরওয়ালাদের সঙ্গে লাভের ভাগবাটোয়ারা ছিল; দেশী সৈন্যদের জন্য চাল সাপ্লাই করতেন যামিনী মহাজন। পাঁচশো মণ সাপ্লাই করে পাঁচ হাজার মণের বিল করতেন। তার উপর সেই পঞ্চাশের মন্বন্তর, মহা আকাল। যামিনী মহাজনের চালের কণা সোনার দামে বিক্রী হয়েছে।

সবই আউলিয়া বাবার কৃপায়। হাত জোড় করে বারবার কপালে ঠেকিয়ে অতি বিনয়ের সঙ্গে উত্তর দেন যামিনী মহাজন।

এখন যামিনী মহাজনের নানা কারবার। ইংরেজরা চলে গেছে। দেশের ভোলও পালটে গেছে। যামিনী মহাজনের কফি হাউসে

কলেজের ছাত্রদের ভিড় জমে। পলিটিক্স নিয়েই ছেলেদের বিতর্ক; আবার কেউ কেউ সাহিত্য নিয়েও আলোচনা করে। শহরে আগে সিনেমা হল ছিল না। যামিনী মহাজন সে অভাবও পূরণ করে দিয়েছেন। তাঁর "ছায়াছবি"-ঘর সন্ধ্যায় মুখর ও আলোময় হয়ে ওঠে।

হ্যাঁ, আউলিয়া-বাবার দয়ায় না আর কিছু?—ব্যাটা জোচ্চোর!—যামিনী মহাজনের কানেও যায়।

মাঝে মাঝে আর এক পাগলকে দেখা যায়। মনে হয় ভদ্রলোকেরই ছেলে। মাথা খারাপ হয়ে গেছে। লোকে বলে যামিনী মহাজনেরই খুড়তুতো ভাই। খুড়ো মারা যাবার সঙ্গে সঙ্গে ভাইকে ঠকিয়ে যামিনী মহাজন সমস্ত সম্পত্তি নিজের নামে করে নিয়েছে। ছেলেটাকে লেখাপড়া ছাড়িয়ে দোকানের কাজেই লাগিয়েছিল। দিনরাত চাকরের মত খাটাত। যামিনী মহাজনের অত্যাচারে আর নির্যাতনে এমন পাগল হয়ে গেছে।

আউলিয়া মাঝে মাঝে শহরের পথে টহল দিতে দিতে যামিনী মহাজনের গদীর সামনে এসে দাঁড়ান—গায়ে তালি দেওয়া লম্বা আলখাল্লা। হাতে ত্রিশূলের মত একটা লাঠি। মাথায় জটাজটা চুল। মুখে লম্বা গোঁফদাড়ি। দেখলে ভয়ই হয়।

তারপর হুঙ্কার ছাড়ে আউলিয়া—হু শিয়ার, হু শিয়ার!

যামিনী মহাজন ঠকঠক করে কাঁপতে থাকেন।

শহরের উত্তরে নবপল্লী।

নবপল্লীর সেই বটগাছের তলা। ঝাঁ ঝাঁ করছে দুপুরের রোদ। নীলে নীল হয়ে গেছে আকাশ। বটগাছের তলায় আউলিয়া বসে রয়েছে। মাঝে মাঝে রাস্তা দিয়ে দু' একটা মোটর গাড়ি চলে যাচ্ছে। নবপল্লীর এ ধারটায় আবার একটা নতুন বাড়ি উঠছে। মিস্ত্রি আর মজুরেরা কাজ করছে।

তাদের দিকে তাকিয়ে হেসে উঠছে আউলিয়া। আবার ভাবছে,—

—ভাঙা আর গড়া। ওরা কেমন ভাঙছে। আর গড়ছে। আমার জীবনে ভাঙাগড়ার কাজ শেষ হয়ে গেছে। ভাঙবার যেমন কোনো কিছুই নেই। তেমনি গড়বারও কিছু নেই আর।

আকাশে মধ্যাহ্নের সূর্য। চোখ ধাঁধিয়ে দেয়। ঝলমল টলমল করছে পারদের থালা। আকাশের দিকে তাকিয়ে ভ্রূকুটি ক'রে আউলিয়া। নাঃ, এ ব্যাটাই যত নষ্টের গোড়া। পাহারা দিচ্ছে। কোনো কিছুই লুকোবার জো নেই। রাতে লুকিয়ে থাকে বটে, কিন্তু রেখে যায় অগুনতি তারার চোখ। এক সূর্য কিন্তু অগুনতি তারা!

মুঠো মুঠো ধুলো ছুড়ে সূর্যের দিকে।

আবার বিড় বিড় করে বকতে থাকে আউলিয়া,—হিন্দু না মুছলমান? ওই সূর্যি ব্যাটার কি জাত আছে? তার কি কোনো ধর্ম আছে? তার কাছে তো সবই সমান। কত জাত আছে এই পৃথিবীতে; কিন্তু সূর্য তার ধার ধারে না।

বেশ খেলা করে সূর্য। ভোর বেলা আকাশের কোলে যখন উঁকি মারে, কালো একটা মেয়ে যেন পালিয়ে যায়,—পুব থেকে পশ্চিমে। কালো বটে, কালো সে যতই কালো হোক, এত রঙ থাকে তার শাড়ির আঁচলে। সবই লুকিয়ে রাখে সারারাত। সারা-রাত খেলা ক'রে সেই কালো মেয়ে। জীবজন্তুকে ঘুম পাড়িয়ে দেয়। গাছে গাছে পাতায় পাতায় হাত বুলিয়ে দেয়; ফুলের কুঁড়িকে যত্ন করে। তাইতো ভোরের বেলা ফুল ফোটে। সূর্যিটা উঁকি মারতে না মারতে কালো মেয়ে তার খেলা শেষ ক'রে উঠে পড়ে। কি জানি ওই ব্যাটাকে ভয়ই করে। শাড়ির আঁচল সামলাতে পারে না,—ছড়িয়ে দেয় আকাশের গায়। লজ্জায় রাঙা হয়ে ওঠে তার মুখ। সূর্যিটাও ভয়ানক পাজি। পিছু নেয় তার। আকাশে রঙের খেলা। শাড়ির আঁচলে কত রঙ। ঝিক্‌মিক্ করে ওঠে আকাশ। মেঘে মেঘে

শাড়ির রঙ ঝিক্‌মিক্ করে ওঠে। উধাও হয়ে যায় কালো মেয়ে।
সারাটা আকাশ এই সূর্য
হয়রান হয়ে পড়ে বেচারা সূর্য। এত বড় আকাশ। তার এদিক্
থেকে ওদিকে পাড়ি দেয়,—দিনের পর দিন, রাতের পর রাত। কত
যুগ, কত কাল কেটে যাচ্ছে। তবু ধরতে পারছে না। দিনের শেষে
আবার হেসে হেসে আকাশে হাসি ছড়িয়ে দেখা দেয় কালো মেয়ে।
লাল, নীল, হলুদ, সবুজ কত রঙ খেলে আকাশের গায়। কত দূরে ঐ
পশ্চিমের কোল থেকে সমুদ্রের ওপার থেকে উঁকি মেরে সূর্যিটাকে
পাগল করে দেয়। তাকে ধবতে গিয়ে ডুব মারে সূর্য। কালো
সমুদ্রটাকে তোলপাড় করে সারা রাত। এদিকে কালো মেয়ে রাতের
অন্ধকাবে আকাশে তার কালো শাড়ির আচল বিছিয়ে সারারাত
আকাশের বুকে খেলা করে তারা নিয়ে। এমনি চলছে বছরের পর
বছর, কালো মেয়েকে ধরতে পারল না সূর্য !

পুরুরবা ও উর্বশীর গল্প মনে পড়ে যায়। উর্বশীকে প্রেয়সীরূপে
পেতে চেয়েছিল পুরুরবা। পেয়েছিল উর্বশীকে কিন্তু বাধাবন্ধহীনা সে
নারীকে বাঁধবে কে ?

মাঝে মাঝে চমকে ওঠে আউলিয়া। এত কথা সে জানল কি
করে? নিজের কথাও ভাবে। তার জীবনেও কি এমন ঘটনা
কোনোদিন ঘটেছিল ? সে তো আউলিয়া, তার ঘরবাড়ি কিংবা
আপনজন কেউ নেই। উর্বশী !—নারী, স্ত্রীলোক—মেয়েছেলে !

হাঃ—হাঃ—হাঃ।

পাগলের হাসি।

নবপল্লীর ঐ সাদা রঙের বাড়িটা আউলিয়াকে যেন চুম্বকের মত
আকর্ষণ করে। এপথ দিয়ে যাবার সময় এখানে তাকে থামতেই
হয়। তাইতো এই বটগাছের তলায় বসে থাকে আউলিয়া। শুধু
দেখেই তৃপ্তি। এত বাড়ি রয়েছে, এত লোক রয়েছে, কই কারো
দিকে তো তার মন এমন করে আকৃষ্ট হয় না। বাড়িটাকে যেদিন

প্রথম দেখেছে, আর সেই মেয়েটিকে দেখেছে বাড়ির ভেতর, সেদিনই মনে হয়েছে এ বাড়িটার মাঝে এমন কোনো রহস্য রয়েছে, যার সঙ্গে তারও কোনো যোগাযোগ আছে। আউলিয়ার মনে তোলপাড় চলে ; কি রহস্য এ বাড়িটার ? সে তো স্বর্যি নয় যে কারো পেছনে পেছনে ঘুরে মরবে !

বাড়িটা তো নতুন। বাড়িটাতে বেশী লোকজনও নেই ; অবশ্য অনেক লোকই এখানে যাতায়াত করে। বড় বড় লোকের গাড়ি এসে দাঁড়ায় বাড়ির আঙিনায়।

দূর থেকে তাকিয়ে থাকে আউলিয়া—কেমন এক পুলকও জাগে মনে। মনে হয়, এবাড়ির মানুষগুলো তার কত চেনা। কিন্তু সব ভুলে গেছে সে। ভাবতে থাকে আউলিয়া—নাঃ, সবই ঝুটা। সবই ফক্কিকার। রাত আর দিন, কালো মেয়ে আর স্বর্য। উর্বশী আর পুরুরবা। লালকেল্লা আর আগ্রার তাজমহল।

শুকিয়ে গেছে যমুনা। যমুনার বুকে এখন চড়া পড়ে গেছে। পাঞ্জাবী উদ্বাস্তুরা বাড়িঘর তুলেছে। লালকেল্লার বারান্দায় দাঁড়িয়ে নিচে যমুনার উত্তাল তরঙ্গ দেখা যায় না, দেখা যায় নদীর চড়ায় বাঁদর নাচাচ্ছে এক দাড়িওয়ালা ভিখারী।—ঠুং ঠুং ঠাং ঠাং ডুগডুগির তালে তালে বাঁদর নাচছে।

দেখেছে আউলিয়া, সবই দেখেছে,—কিন্তু কোন্ যুগে দেখেছে কিছুই মনে করতে পারছে না। জাতিস্মর ! সে কি জাতিস্মর ! সবই তার পূর্বজন্মের কথা।

দিল্লীর চাঁদনী চকে—বিচার হচ্ছে। দিল্লীর বাদশার দুই নাবালক শিশুকে গুলি করে হত্যা করছে ইংরেজ। একটা চারপাইয়ের ওপর শতরঞ্চি পাতা। তার উপর বসে রয়েছেন দিল্লীর বাদশা বাহাদুর শাহ।—একি স্বপ্ন !

কোন্ বর্মা মল্লুকে তাঁর শেষ নিঃশ্বাস পড়েছে।

মনে পড়ে যায়, এক কিশোর ইতিহাসের পাতায় এ কাহিনী পড়ে চিৎকার করে উঠেছিল একদিন, ইংরেজকে হটাতে হবে। উন্মাদের বিপ্লবী ন্দোলনে যোগ দিয়েছিল। কে সে কিশোর, কে সে যুবা? আজো এই যবা তার চোখে স্বপ্নের ধাঁধা লাগায়, স্মৃতির পর্দায় ভেসে ওঠে তার ছবি—আবার মিলিয়ে যায়।

নাঃ, আউলিয়া নিজেই দিল্লী আগ্রা ঘুরে এসেছে। দেখে এসেছে ঔরঙ্গাবাদ। যেখানে জবরদস্ত সেই দিল্লীর বাদশা ঔরঙ্গজেব শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছিলেন।

আগ্রা দেখেছে আউলিয়া—ঐ যে তাজমহল দেখা যাচ্ছে। কীর্তি—কীর্তি! ভালবাসার কীর্তি! না, না, এ যে বিপুল উদ্দাম পাশবিকতার চরম তৃপ্তি! প্রেমকে অমর করবে? নিজে কি অমর হয়ে রইলে শাজাহান?

দিল্লী দেখেছো,—কৌরব আর পাণ্ডব কোথা? হস্তিনাপুর আর ইন্দ্রপ্রস্থ! হাসিও পায়, মাটি মাটিই রয়ে গেছে। কিন্তু তারা আজ নেই। পাঠান কিংবা মুঘলের দাপট ভেঙে গেছে। তবু সেই লালকেল্লাটা রয়ে গেছে। মুঘল বাদশার হুকুমে আর তরতর করে যমুনা উপরে উঠে আসে না তাদের পা ধুইয়ে দিতে। ভরে উঠে না আর লালকেল্লার সেই বিলাস সরোবর। যে জলে সাঁতার কাটত মুঘল-তরুণীরা—শাহজাদা আর শাহজাদীরা।

মতি মসজিদে ঔরঙ্গজেব আর নমাজ পড়তে বের হ'ন না। গোসলখানার কাচগোলকে আর সুন্দরীদের দেহাবয়ব ঝিলমিল ক'রে ওঠে না। হ্যাঁ, দেখেছে আউলিয়া,—সেই অগুনতি কাচগোলকে কাদের চোখের তারা যেন আজো চিক্‌চিক্ করে ওঠে। কিন্তু গোসলখানায় জল নেই। ফোয়ারায় আর জল ওঠে না। দেওয়ানই-আমে আর ময়ুর-সিংহাসন নেই। মর্মর মন্দিরগুলো আজ শুধু পুরোনো স্মৃতির ভার নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। সেই আমীর ওমরাহ আজ কোথায়?

দেওয়ান-ই-খাস আজ নীরব নিস্তব্ধ। এত বড় মুঘল সাম্রাজ্য! এত ছিল তার প্রতাপ। বাবর, হুমায়ুন, আকবর, জাহাঙ্গীর, শাজাহান, তারপর ঔরঙ্গজেব! এখানেই কালের ভ্রূকুটি! তারপর,—তারপর রক্তে লাল হয়েছে লালকেল্লার মাটি।

ইতিহাস?—ইতিহাসে পড়েছে আউলিয়া! ঐ স্কুল-কলেজের ছেলেদের মতন কি সেও একদিন স্কুল-কলেজে পড়েছে! নিজের দেহের দিকে তাকায় আউলিয়া,—কেমন যেন সন্দেহ জাগে।

না, না,—সে জাতিস্মর! সে আবার স্কুল-কলেজে পড়তে যাবে কেন? সে আকাশ থেকেই পড়েছে। আপনাপনিই সে বড় হয়ে উঠেছে। এমন গল্প তো অনেকই জানে আউলিয়া। মেনকার মেয়ে শকুন্তলা,—রামায়ণের সীতাও অম্‌নি মাটি ফুঁড়ে বেরিয়ে এসেছিল।

নামের বড়াই,—জন্মের বড়াই,—ধনের বড়াই কিছুই তো থাকবে না। এমন যে দিল্লীর বাদশা, তাঁর কি হাল হয়েছিল? আউলিয়া নিজের চোখে দেখেছে লালকেল্লা পড়ে রয়েছে, বাদশা নেই! তাঁদের ধন-দৌলত কোথা গেল, তাইতো গেয়েছিল বাদশা বাহাদুর শাহ,—

> ন কিসী কী আখ কা নূর হুঁ
> ন কিসী কা দিলকা করার হুঁ
> জো কিসী কো কাম না আ সঁকে
> মৈঁ বো এক মুস্তে গুবার হুঁ।

উর্দু কবিতার কলি আওড়ায় আউলিয়া।—আমি কারো নয়নের মণি নই, কারও হৃদয়ে আমার আসন নেই। আমি তুচ্ছ ধূলিমুষ্টির মত, যা কারো কাজে লাগতে পারে না।

আউলিয়ার মুখে নৈরাশ্যের হাসি,—সত্যি কথা বলে গেছে বাহাদুর শাহ—বাদশা বাহাদুর শাহ কবি হয়ে বেঁচে গেছে।

আউলিয়ার মুখে উর্দু বয়ান শুনে অনেকেই বিস্মিত হয়। —ধুরন্ধর জ্ঞানী, মহাপুরুষ এই আউলিয়া! তা না হলে এমন সুন্দর কথা তার মুখ দিয়ে বের হয়?

আউলিয়াকে সকলে ঘিরে থাকতে চায়। কিন্তু সাহস করে না। আউলিয়ার দয়ার কণামাত্র পেলে না কি মনস্কামনা পূরণ হয়ে যায়। তাই গালাগাল খেয়েও কেউ কেউ সাহস ক'রে তার কাছে আসে। তার পা জড়িয়ে ধরতে চায়।

দুর্, দুর্ করে আউলিয়া তাড়া করে। ধুলোবালি ছুঁড়ে মারে। কখনো বা লাঠি নিয়ে তাড়া করে। যামিনী মহাজন বলেন,—আউলিয়ার গালাগালই আশীর্বাদ। তার লাথি খেলে তো নসিব খুলে যায়। অবশ্য নসিব খোলাবার জন্য কেউ তার লাথি খেতে সাহস করে না।

ফটিক দত্ত, না ফটিক ডাটা। মিলিটারী সাহেবরা ডাকত ফটিক ডাটা বলে। আমেরিকান ক্যাম্প পড়েছিল টিলাগড়ের মাঠে। মাঠটায় যেন নতুন শহর বসে গিয়েছিল। শুধু সাহেব আর সাহেব,—আমেরিকান সৈন্যদের ছাউনি। আসামের দিকে এগিয়ে চলেছে মিত্রসৈন্যেরা,—ইংরাজ আমেরিকান আর তার সঙ্গে ভারতীয় বেলুচ্ আর গাড়োয়ালী সৈন্যেরা।

ফটিক দত্তের তখন বরাত খুলে গেল। কলেজের কাছে ছোট একটা চা-বিস্কুটের দোকান ছিল ফটিক দত্তের। শহরের ভদ্র অধিবাসীরা তখন সৈন্যদের দাপটে শহর ছেড়ে প্রায় পালিয়েছিল। ওদিকে জাপান এগিয়ে আসছে; মনিপুরে নাগাপাহাড়ে জাপানীরা এসে পড়েছে। কোহিমা ও ইম্ফল দখল করে ফেলেছে তারা,—এমনি গুজব ছড়াতে লাগল।—আসছেন সুভাষচন্দ্র,—নেতাজী!

ফটিক দত্ত এই সুযোগে হাঁস, মুরগী, ছাগল ভেড়ার মাংস জোগাতে লাগল মিলিটারী ছাউনিতে। ফটিক ডাটা তখন কনট্রাক্টার।

মাঠের ছাগল, ভেড়া সব প্রায় বে-ওয়ারিশ মাল। সাধারণ চাষা-ভূষারা প্রাণের ভয়ে অস্থির। রাত্রে বউ-ঝি নিয়ে ঘরে কেউ নিশ্চিন্তে ঘুমোতে পারে না। মেয়েরা দিনের বেলায়ও বাইরে বের হতে সাহস পায় না।

জেলার কর্তা তখন ইংরেজ-সাহেব। বিদেশী অতিথি মিত্রসৈন্যদের যাতে কোনো অসুবিধা না হয়, তার জন্য ফটিক ডাটাকে অনেক করে বোঝালেন।

ফটিক ডাটা তার প্রতি কথায় সেল্যুট করে জানালে,—ইয়েস্ সার্! ইয়েস্ সার্!

—বুঝলে ডাটা, ইউ আণ্ডারস্ট্যাণ্ড! আফ্‌টার ভিক্টোরি,—সরকার তোমাকে উপযুক্ত রিউয়ার্ড দেবে! ইউ নো—জাপান আর জার্মান ইওর ড্যাঞ্জারাস এনিমি। তোমাদের স্বাধীনতা যাবে। ইউ আণ্ডারস্ট্যাণ্ড,—ফ্রিডম্ ইজ মোস্ট ভ্যালুয়েবল। জাপান ইণ্ডিয়া জয় করলে তোমাদেরই লোকসান হবে। উই ইংলিশম্যান, আমাদের কোনো লোকসানই হবে না। তোমরা ফ্রিডম হারাবে। ইউ উইল লুজ্ ইওর লিবার্টি। ইউ আণ্ডারস্ট্যাণ্ড।

ফটিক দত্ত সবই বুঝেছিল। এবং সেই সুযোগ নিয়ে শহরের আশেপাশের গাঁয়ের যত ছাগল ভেড়া, হাঁস, মুরগী উজাড় করে দিয়েছিল। প্রচুর টাকাও পেয়েছিল ফটিক দত্ত।

যুদ্ধও শেষ হল। দেখা গেল ফটিক দত্তের নতুন পাকা বাড়ি উঠেছে। ফটিক দত্ত নয় ফটিক ডাটা এখন গন্যমান্য ব্যক্তি। দেশে তখন হাহাকার, চাল, চিনি ও কাপড়ের বাজারে আগুন লেগেছে। কনট্রোল ও রেশন, নতুন কথা শুনল দেশের লোক। ফটিক দত্তের মোটর তখন সরকারী মহলে ঘন ঘন যাতায়াত করছে।

ফটিক ডাটার বাড়িতেও সকলের ভোল পালটে গেছে। ফটিক ডাটার ছেলে মণি ডাটা কলকাতায় পাড়ি দিয়েছে। কলকাতায় সাহেবদের স্কুলে পড়ছে মণি ডাটা। আর ফটিক ডাটার মেয়ে ডলি ডাটা গেল বেথুন স্কুলে।

ফটিক গিন্নীর কিন্তু বিশেষ কোনো পরিবর্ত্তন হয় নি। তিনি তার ঠাকুর-ঘর নিয়েই আছেন। কিন্তু বাড়িতে বড় বড় সাহেবগুলো আর হীরাচাঁদ মুলুকচাঁদদের যাতায়াত বাড়ছে। বৈঠকখানা বিলাতী ড্রয়িং-

রূমে পরিণত হয়েছে। অবশ্য ফটিক ডাটা যখন ফটিক চাঁদ দত্ত ছিলেন তখন তার শয়ন ঘর আর বৈঠকখানা বলতে আলাদা কোনো কিছুই ছিল না। শহরতলীর পৈতৃক ভিটায় দুখানি মাত্র টালির ঘর ছিল। টিলাগড়ে কলেজের কাছে এক খড়ের ঘরে ছিল তার রেস্টুরেন্ট তথা চায়ের দোকান।

সেই ফটিক ডাটার চালচলনে এখন আভিজাত্য। এখন বাড়িখানাও বেশ আধুনিক ধবনের। হঠাৎ দেশ স্বাধীন হয়ে গেল, ফটিক ডাটা কিন্তু ফটিক ডাটাই রয়ে গেলেন। ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের প্রতিশ্রুত রায় সাহেব কিংবা রায় বাহাতুর উপাধি লাভের আর আশা নেই জেনেও ফটিক ঘাবড়ালেন না। কিন্তু তিন চাব বছর যেতে না যেতেই হঠাৎ যেন কি হয়ে গেল।

ফটিক ডাটাকে বড় একটা আর বের হতে দেখা যায় না। এতদিন কলকাতা, দিল্লী, পাটনা, বোম্বে ঘুরে বেড়িয়েছেন। খাস দিল্লীতেও না কি খাতির পেয়েছেন। প্রথম বছবের স্বাধীনতা উৎসবে তিনি না কি দশ হাজার টাকার বাজি পুড়িয়েছিলেন। শহবের লোকে এখনো তা ভোলে নি।

কানাঘুসায় শোনা গেল, ফটিক ডাটা জালিয়াতি, মিথ্যা ষড়যন্ত্র ও জাল সইয়ে সরকারকে হাজাব হাজাব টাকা ঠকিয়েছেন। চাল ও চিনির কারবারে বা কনট্রাক্টে এবং একচেটিয়া সবকারী সববরাহে তার এ কীর্তি ধরা পড়ে গেছে।

সেই ফটিক ডাটা!—একদিন ফটিক ডাটা এসে আউলিয়ার পায়ে পড়েছিলেন।

লাথি মেরেছিল আউলিয়া—ভাগ্ ভাগ্ হিয়াসে।

তবু হাতজোড় করে কেঁদেছিলেন ফটিক দত্ত—বাবা বাঁচাও!

আউলিয়া লাঠি নিয়ে তাড়া করেছিল। তারপর আপন মনে বিড়্ বিড়্ করে গেয়েছিল—

ন কিসী কী আঁখ কা নূর হুঁ
ন কিসী কা দিলকা করার হুঁ

নবপল্লীর বট গাছটার তলায় বসে রয়েছে আউলিয়া।

মনে কত কথা! ইদানীং তার মনের উপর কেমন যেন একটা সংশয়ের ছায়া পড়েছে ; দ্বন্দ্ব চলেছে মনে। সে অনেক দেশ ঘুরেছে, অনেক গাঁ, অনেক শহর। কত রকমের মানুষ। তার মত ঘরছাড়াদেরও দেখেছে। কিন্তু যারা ঘর ছেড়েছে, তাদের নিশ্চয়ই ঘর ছিল। তার কি ছিল? ছোট ছোট ছেলে মেয়েরা ছুটছে, খেলাধুলো করছে। সুখ তাদের হাসি। তারাও ঘরে ফিরে যাবে। তাদের মা-বাপ আছে।

আউলিয়ার কে আছে?

নাঃ, ঐ সাদা রঙের বাড়িটাই সব গুলিয়ে দিচ্ছে। মাঝে মাঝে একজন স্ত্রীলোক,—না, না, একজন মহিলা বেরিয়ে আসেন। বারান্দায় পায়চারি করেন। গাড়িতে ক'রে বেরিয়েও যান। সেই যে প্রথম দিন এঁকেই দেখেছিল। কে ইনি? যেদিন থেকে এই মহিলাটিকে দেখেছে, সেদিন থেকেই মনটা এমন ঘুরপাক খাচ্ছে।

যাদু,—যাদু—সবই মায়া!

কত মেয়ে তো দেখেছে আউলিয়া। ভোজপুর, নাগপুর, কামাখ্যা কুমারিকা, জয়পুর উদয়পুর, কাশী—কত ধরনের পোষাকে কত ধরনের মেয়ে। কত ধরনের তাদের অলঙ্কার, কত ধরনের শাড়ি। পাঞ্জাবে মেয়েরা পাজামা পরে, ওড়না পরে মেয়েরা। কামিজ পরে। অদ্ভুত, সব বিচিত্র খেলা।

মেয়ে!—স্ত্রীলোক!—নারী!—এদের ঘিরেই সংসারে সঙ্ সেজেছে যত মানুষ। মেয়ে নয় মায়া! হিন্দুরা বলে মায়া—মহামায়া। আউলিয়ার তো মায়া নেই।

সত্যি কি তার মায়া নেই? তবে? তবে কেন এ বাড়িটা দেখবার জন্য তার মন উতলা হয়ে ওঠে। ঐ বাড়ি না ঐ মেয়ে?—ঐ মহিলা। বড়লোকের বাড়ি! বড়লোক ওরা। আর আউলিয়া ভিখারী ফকির, তার ঘর নেই। আকাশই তার ঘরের চাঁদোয়া।

ঐ যে বাড়ির ভেতরে একখানা মোটর গিয়ে থামল। ভোঁস্ ভোঁস্ শব্দ করে আবার বেরিয়ে গেল। টবে সাজানো গোলাপ গাছে সব লালফুল—, গোলাপ! ঐ পাঁচিলেব কোণটা ঘেঁষে একটা কদম গাছ। অকালে কদমফুল ফুটেছে।

কদমফুল!—হঠাৎ যেন চমকে ওঠে আউলিয়া। তাব চোখের সামনে যেন এক কিশোবী বালিকা খিল্ খিল্ কবে হাসছে। হাতে তাব কদম ফুলেব গোছা। একটি ছেলে কদম গাছেব ডালে পা দুলিয়ে বাঁশি বাজাচ্ছে।

না, না, সবই ভুল!—কেন এমন হয? ওই ছেলেটা ও মেয়েটা এমন আলেয়াব মত তাব চোখ ধাঁধিয়ে কেন দেয়?—এ কি স্বপ্ন?

সাদা বাড়িব একতলাব বাবান্দায় বসে আছে একটি বুড়ো। হ্যাঁ, জবুথবুই হযে গেছে। মানী লোক!—চামড়া কুঁচকে গেছে; ভুরুর চুলগুলো পর্যন্ত পেকে গেছে। মাথায় টাক; পাশেব চুলগুলো সাদা ধবধবে। যখন দাঁড়ায়, মনে হয় এক কালে বেশ দশাসই পুরুষই ছিল। সোজা হয়ে এখন দাঁডাতে পাবে না। লাঠি ভর দিয়ে দাঁডায়।

মাঝে মাঝে একটি মেয়ে এসে হাত ধবে তাকে তোলে। মেয়েটার মুখে হাসি লেগেই আছে। কি সুন্দর চেহারা! টানা টানা বড় বড় চোখ। এবেলা ওবেলা শাড়ি বদলায়। মনে হয় কৈশোর পার হয়ে যৌবনে পা ফেলেছে। ঢল ঢল চাউনি।

দাদু! দাদু!—কি মিষ্টি তার স্বর!

মেয়েটাকে দেখলে মায়াই লাগে। মাঝে মাঝে আবার গাড়িতে চেপে মেয়েটা বেরিয়ে যায়। কয়েকটা ছেলেও আসে, তার সমবয়সীই হবে। না, তার চেয়ে বড়ই হবে।

কি ছুটোছুটি আর হুটোপুটিরে বাবা!—এযুগে লজ্জা শরমও পালিয়ে গেছে!

বাঃ, বুড়ো লোকটি কাউকে যেন কি বলছে। বকাবকিও করে

মাঝে মাঝে। ইজিচেয়ারে চিত্ হয়ে শুয়ে রয়েছে। কিন্তু মনে হয়. যারা আসছে কিংবা যাচ্ছে তাদের উপর নজর রেখেছে।

বসেই তো থাকে বুড়োটা। কোনো কাজই তার নেই। কাজ আর কি করবে? সবই গুছিয়ে নিয়েছে। এখন বাড়িগাড়ির মালিক। ওরা তো বলে লাখ লাখ টাকা ব্যাঙ্কে রয়েছে।

ভোগ করছে বুড়োটা!—ভোগ? রাতদিন বসে থাকা শোওয়া আর খাওয়া।—ভোগ? এর নাম ভোগ! হ্যাঁ, ধবধবে সাদা কাপড় পরে। গায়ের কোর্তাটাও ধবধবে। পাশে গড়গড়া। মাঝে মাঝে গড়গড়ার নলে মুখ দিয়ে ধোঁয়া ছাড়ে এই তো ভোগ!—হিঃ —হিঃ করে হাসে আউলিয়া।

ঐ যে কাসির শব্দ শোনা যাচ্ছে। কাউকে যেন ডাকছে বুড়োটা! তার হাঁক শুনলে এ বাড়ির সকলেই যেন ভয় পেয়ে যায়। বাড়ির কর্তা। আশি পেরিয়ে গেছে কোন্ দিন! তবু গলার আওয়াজের দাপট আছে।

বুড়ো হলে কি হবে? নিশ্চযই ওই ইজিচেয়ারটায় বসে বসে কল টেপে। সমস্ত শহরটার চাবিকাঠি যেন বুড়োর হাতে। তা না হলে বড় বড় হোমরা চোমরারা ওর কাছে আসবে কেন? জেলার কর্তা থেকে থানার দারোগা পর্যন্ত।

আরো অনেকে আসে, মোটা মোটা খদ্দরের ধুতিপরা, গায়ে খদ্দরের পাঞ্জাবী, কারো কারো কাঁধে ঝুলছে মোটা খদ্দরের চাদর। বিধবাদের মত শুদ্ধ শুদ্ধ চেহারা। দেখলেই কেমন কেমন লাগে। ওরাই নাকি এখন দেশের কর্তা। কিন্তু চাবিকাঠি আছে ওই বুড়োর হাতে।

কিসের চাবিকাঠি?—আউলিয়া হেসে ওঠে।

চাবিকাঠির কথা মনে পড়ে যায়। মনে পড়তেই আউলিয়া হাত মুঠো করে আর খোলে। বারবার এ রকম করতে থাকে আউলিয়া।

নবীন পোদ্দারের চাবিকাঠির কথা কে না জানে? হাসিও পায়।

সেই নবীন পোদ্দার থুড়থুড়ো বুড়ো হয়ে পড়েছে। টাকার কুমীর। শেষ বয়সে দানধর্মও শুরু করেছে। কিন্তু তার মরবার পর এত টাকা, এত সম্পত্তি কি হবে কার হাতে পড়বে, তাই ভেবেই অস্থির। একবার নয়, তিন তিনবার বিয়ে করেছে। তিনটি বউই নিঃসন্তান অবস্থায় মারা গেছে। হতাশ হয়ে পড়ল নবীন পোদ্দার। তাহলে কি তার টাকাকড়ি বারোভূতের ভোজে লাগবে?

বুড়ো বয়সে আবার বিয়ে করল নবীন পোদ্দার। এতোদিন তবু নিশ্চিন্তে ছিল, কিন্তু এই চতুর্থী আসার পর থেকেই পোদ্দারের কেমন এক সন্দেহ জাগল। সিন্দুকের চাবিকাঠি আগে ঘরে বিছানার কাছে একটা টেবিলের ড্রয়ারে রাখত পোদ্দার, এখন তা কোমরে ঝুলতে লাগল।

নতুন বউয়ের চালচলনে সংশয় জাগল পোদ্দারের মনে। নতুন শ্বশুরবাড়ির লোকজনও যাতায়াত করতে লাগল। বংশরক্ষা কবচ আর মাদুলীতে নতুন বউয়ের হাত আর গলা ভরে উঠল। কিন্তু তিন বছর কেটে গেলেও কোনো আশার আলো পোদ্দার দেখতে পেলো না। হঠাৎ একদিন পোদ্দার এসে আউলিয়াকে ধরলে,—বাবা, এ বয়সে আর ছেলেপুলে হবে না, তা জানি। কিন্তু আমার এ বিষয়-সম্পত্তির কি হবে? এ চাবিকাঠিটা কার হাতে দিয়ে যাবো। ওই বউটার হাতে পড়লে যে শ্বশুর বাড়ির বারো ভূতে সব লণ্ডভণ্ড করে দেবে। আউলিয়া বলেছিল,—সব বিলিয়ে দে ব্যাটা! সব বিলিয়ে দে। নবীন পোদ্দার চমকে ওঠে বলেছিল,—বলো কি বাবা! সব বিলিয়ে দেবো? তা হলে আমি খাবো কি? কতদিন বাঁচব, তার তো ঠিকঠিকানা নেই। আমার কি উপায় হবে? আউলিয়া বলেছিল,—উপায়? উপায় আবার কিরে ব্যাটা? আমায় দেখছিস্ না, আমার উপায় কে করছে? ভয়ে থতমত খেয়ে পোদ্দার বলেছিল, আচ্ছা, বাবা বলতে পারো এ বউটাও আমার আগে মরবে কি না?

আউলিয়া বিকট হাসি হেসেছিল—হাঃ—হাঃ—হাঃ! ভাগ্,—ভাগ্,—হিঁয়াসে ভাগ্! বউ মরবে, তুইও মরবি। চাবিকাঠি সঙ্গে নিয়ে যা ব্যাটা! চাবিকাঠির গোর্ দিগে যা?

সেই নবীন পোদ্দার মরল,—কিন্তু হাতের মুঠোয় চাবিকাঠি। মড়ার হাত থেকে চাবিকাঠি ছাড়ানো গেলো না। শেষকালে আঙুল কাটতে হল!

আউলিয়া হাসে,- ওই বুড়োটারও কি তাই হবে! না, না, এ বুড়ো তেমন নয়। কিন্তু এর চাবি যে মগজ চালাবার চাবিকাঠি।

—বড় বড় কথা কানে আসে—দল, পার্টি, ইলেক্‌শন। রাজ্যপাল, রাষ্ট্রপতি, মুখ্যমন্ত্রী, উপমন্ত্রী! যত সব নতুন নতুন কথা।

—ইংরেজ চলে যাওয়ায় বাংলা ভাষাটাও বদলে গেল না কি। এত সব নতুন নতুন কথা বানালে কে? হিন্দী?—রাষ্ট্রভাষা!—না, যত সব উদ্ভট কাণ্ড। দেশের ভোল্ পালটে গেছে, যত সব নতুন নতুন কথা, যত সব নতুন নতুন পদ, নতুন নতুন সব শাসক—রাজ্যপাল, অবর-রক্ষক, সমাহর্তা, পৌরপতি—।

এ বুড়ো তো তাদের কেউ নয়। তবু ওর কাছেই সকলে আসে। নিশ্চয়ই সলাপরামর্শ করতে আসে। বিজ্ঞ!—জ্ঞানীজন!. অশীতিপর বৃদ্ধ! এই মাথার ভেতর ওই বুড়ো মগজে এত বুদ্ধি ধরে।

ছোক্‌রা চাকর এসে গড়গড়ার কলকেটা বদলে দিয়ে যায়। আবার ধোঁয়া ছাড়ে বুড়ো। যারা আসে, তাদের কেউ কেউ কুশল জিজ্ঞাসাও করে। বুড়োর মুখে হাসিও দেখা যায়। কথাও ফুটে মুখে। দূর থেকে আউলিয়া তার কিছুই বুঝতে পারে না, শুনতেও পায় না।

সেই মহিলাটি মাঝে মাঝে উপর থেকে নেমে আসে। তার সঙ্গে প্রায়ই দু'একজন থাকে। কথা বলতে বলতে নেমে আসে তারা। তাদের মাঝে হোমরা চোমরা দু'একজন নিশ্চয়ই থাকে। বুড়োর চেয়ে মহিলাটির সঙ্গেই সকলের বেশী কথাবার্তা হয়। বারান্দায় একটা

গোল টেবিলের চারধারে কৌচ রয়েছে। পাশে চেয়ারও রয়েছে কয়েক খানা। তাদের তর্কবিতর্ক সলাপরামর্শ চলে। তু'একটি কথা কানেও আসে। মনে হয়, বুড়ো লোকটি মাঝে মাঝে টিপ্পনিও কাটে।

মহিলাটি একটু গম্ভীর প্রকৃতির, তবু তার শান্ত মুখে হাসি লেগে আছে। বয়স হয়েছে। তু'এক গাছি চুলে পাকও ধরেছে। তবু দেহের জৌলুষ কমে নি। ফর্সা গায়ের রঙ। বেশ আটসাঁট দেহ।

আউলিয়া ভাবে, কি এত কথা রে বাবা? এদের কথাই ফুরোয় না। প্রায়ই আউলিয়া এরকম দেখে। উকিল নয়, ব্যারিষ্টার নয়, নিতান্ত মেয়েছেলে। তাব সঙ্গে লোকের কি-ই বা এত সলাপরমর্শ? কি-ই বা এত কথা? ছেলে ছোকরারাও আসে। কথা বলতে বলতে পায়ের ধুলোও নেয়।

সুরুচি দেবী—এই বর্ষীংসী মহিলার নাম নামটাও শুনেছে আউলিয়া।

নিজের মনে আওড়ায় আউলিয়া, সুরুচি দেবী, সুরুচি দেবী। বেশ সুন্দর নাম তো! ছেলে ছোকরারা মাসীমা বলে ডাকে। হ্যাঁ, মাসীমা-ই বটে!—কিন্তু আউলিয়ার সঙ্গে কোন সম্পর্ক নেই। ইলেক্শন্ ফিলেক্শনের ধারও ধারে না আউলিয়া।

তবু মনে হয়,—ওই সাদা বাড়িটা তাকে চুম্বকের মতো টানছে। এ্যাঃ—শুধু কি এই বাড়ি? এই মহিলা,-এই সুরুচি,—চিরদিনই কি এই সুরুচিই ছিল? ওকে দেখলেই আউলিয়ার মনটা তোলপাড় করে ওঠে। কেন?—কেন?—ওকে তো জানি! কোথাও কি দেখেছি?—না, না, না। আমার নিজের পরিচয়ই আমি জানিনা! আর সুরুচি দেবীকে জানব?

স্বপ্নই দেখছে আউলিয়া।

কৈলাস দত্ত রায়বাহাতুর?—তারই মেয়ে এই সুরুচি দেবী। এক কৈলাস দত্তের কথা মনে পড়ে যায়। বাজারে তার মস্ত বড় কাপড়ের দোকান ছিল। ঝিক্‌মিক্ করে ওঠে স্মৃতির পাতা।

আবছা আবছা মনে পড়ছে,—দূরে, বহু দূরে যেন সে দৃশ্য দেখতে পাচ্ছে আউলিয়া। নন্-কো-অপারেশন আন্দোলন। বিলাতী-বর্জন করতে হবে। কি উৎসাহ আর কি উল্লাস। দলে দলে স্কুল কলেজের ছেলেরা বেরিয়ে আসছে। কাপড়ের দোকানে পিকেটিং করছে ছেলেরা।

বন্দেমাতরম্ —আল্লা-হো-আকবর।

কৈলাস দত্তর গদী ঘিরে রয়েছে ছেলেরা। সে [illegible], সে কি উদ্দাম কলরব। সে আওয়াজ এখনো কানে লেগে রয়েছে। পুলিশের লাঠি খেয়েছে ছেলেরা। বিদেশী সার্জেণ্টরা মাথা ফাটিয়ে দিয়েছে, মাটিতে ফেলে লাথির পর লাথি মেরেছে। তবু ছেলেরা এগিয়ে গেছে।

এ্যাঃ! সবই তো মনে আছে তার! চমকে ওঠে আউলিয়া। হঠাৎ উঠে দাঁড়ায়। হাতের লাঠিটা নিয়ে ঘুরপাক খায়,—মেরে ফেললে,—মেরে ফেললে!

আবার নিঝুম হয়ে বসে পড়ে।

—না, না, সবই ভূয়া, সবই স্বপ্ন! কোথা গেল তারা? কোথায় শ্যামলাল, কোথায় রহমান? আর কোথায় সেই দুর্দান্ত অমরেশ? জেলে পচে মরেছে তারা। কত বছর হয়ে গেল! তারপর কত বার দেশটা তোলপাড় হয়ে গেছে।

ডাকাতি করেছে, সরকারী তোষাখানা লুঠ করেছে,—গুলি করে সাহেবদের মেরেছে। আবার কেউবা বিলাতী কাপড়ে আগুন লাগিয়েছে। জেল খেটেছে। ফাঁসিকাঠে ঝুলেছে তারা।

তারা সবই কি মরে গেছে?—তাদের রক্ত কি ধুয়ে মুছে সাফ করে দিয়েছে ওরা? এদের মাঝে কই শ্যামলাল, সেই অপরেশকে তো দেখতে পাই না?

দেশ স্বাধীন হবে,—ইংরেজ চলে যাবে। আমরা স্বাধীন হয়ে সুখে থাকব। কিন্তু কোথায় তারা? দেশতো স্বাধীন হয়েছে। তাহলে শ্যামলাল আর অপরেশের দলও কি ভোল্ পালটেছে?

সেই তো দেখি, রাস্তায় রাস্তায় ভিখারী। চাল পায় না। কাপড় পায় না, চিনি পায় না।—ইংরেজ কি সব নিয়ে চলে গেছে ?

হেসে লুটোপুটি খায় আউলিয়া—বাঃ, বেশ জব্দ। খদ্দর পরো, চরকা চালাও, লবণ বানাও। মনের আনন্দে থাকো। মাঠভরা ধান গোয়াল ভরা গোরু এত সব গেল কোথা ? হাঃ—হাঃ—হাঃ !

সবই তো ছিল। ঐ যে ছবি দেখছে আউলিয়া। আউলিয়া তো তাদেরই একজন ছিল ? কত যুগ কত বছর পার হয়ে গেছে ; কত জন্মান্তর ! আউলিয়া ছিল যুবা ছেলে !

ঐ যে সেই ছেলে। পুলিশের লাঠি পড়ছে ছেলেদের ওপর। ছেলেটির মাথা ফেটে গেছে। পড়ে গেছে মাটিতে। পড়ে গেছে দশ বারোটি ছেলে। একটি মেয়ে এগিয়ে আসছে। কার মেয়ে ? কি সাহস তার। ভয় নেই, ডর নেই এগিয়ে আসছে। তার পিছু পিছু আসছে অনেকে। থামো, থামো—।

যারা লাঠির ঘা খেয়ে পড়েছিল। তাদের তুলে নিচ্ছে ওরা ! হাস-পাতাল খুলে দিয়েছে। নিজের হাতে ব্যাণ্ডেজ বেঁধে দিচ্ছে সব মেয়েরা। অনুপম ডাক্তার দাঁড়িয়ে রয়েছে। বেশ তো মনে পড়ছে। অনুপম ডাক্তার ! তাদের অনুপমদা। তাঁকে কি ভোলা যায় ?

মেয়েদের দল, তারা স্বেচ্ছাসেবিকা হয়েছে। ঐ মেয়েটি দলের আগে আগে চলেছে। তাদের নেতৃত্ব করছে। কতই বা বয়স হবে ! হাঁ, মনে পড়ছে। কোন্ মেম সাহেবদের স্কুলে পড়ত মেয়েটা। দূর ছাই,—নামটা মনেও পড়ে না।— আউলিয়া নিজের দাড়ি টানতে থাকে।

গাঁ থেকে কত ছেলে এসেছে শহরে পিকেটিং করতে। কোথা বাড়ি, কোথা ঘর কেউ খবর রাখে না। কি উৎসাহ তাদের। তারা লাঠির বাড়ি খেল,—রক্ত দিল।

আবার জেলে যেতে হবে। ইংরেজের জেল। তাদের কেউ কোনোদিন জেলও দেখেনি ! আগে শুনেছে,—চোর, ডাকাতদেরই

জেল হয়। জেল-যাওয়াকে রীতিমত ঘৃণাই করত তারা। ভয়ও ছিল মনে। কিন্তু আজ কি উৎসাহ! তাদের চোখমুখ উল্লাসে ভরা—আনন্দ ঝরে পড়ছে।

বিচার হ'ল। ম্যাজিস্ট্রেটের এজলাস দেখাও তাদের পক্ষে নতুন। নতুন সবই। উকিল-মোক্তারও তাদের কাছে নতুন। কাঠগড়া থেকে নেমে এল তারা। কড়া পাহারা। তারই মাঝে সেই মেয়ের দল এল মালা হাতে। ফুলের মালা পরিয়ে দিল সেই মেয়েটি। শহরের কত গণ্যমান্য ব্যক্তি উৎসাহের কথা শোনালেন। কিন্তু সে তো দেখেছে,— সেই মেয়েটি একবার তার দিকে তাকিয়ে চোখও মুছেছিল। তার চোখ দু'টি ছলছল করছিল।

সেই ছেলেটি ছিল দলের নেতা। তারই হ'ল বেশীদিনের জেল। সেই ছেলেটি,—ঐ যে দেখা যাচ্ছে। কিন্তু সেই ছেলেটি কে? আউলিয়া সেই ছেলেটির মাঝে নিজের প্রতিচ্ছবি দেখে!—কোন্ এক জন্মের কথা!

দুরন্ত অসীমসাহসী সেই ছেলে। চোখে-মুখে হাসি। কাউকে যেন গ্রাহ্যই করে না। দোহারা গড়ন, গায়ের রঙ ঠিক ফর্সা বলা চলে না। বারবার পেছনে ফিরে তাকাচ্ছে ছেলেটি—আঠারো-উনিশ বছরের জোয়ান ছেলে।

তাদের গাঁয়ের সকলেই ভয় পেয়ে গিয়েছিল। জমিদার সর্বানন্দ চৌধুরী নিজেই ভয়ে ঠক্‌ঠক্ করে কেঁপেছিলেন,—এ কি হ'ল রে বাবা! ইংরেজ তাড়াবে!

বাপ-মাকে খেয়েছে হতভাগা ছেলে! এখন আমায় খাবে!—বক্‌বক্ করছে এক বুড়ী। দুহাতে কপাল চাপড়াছে।—স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে আউলিয়া।

পিসী?—পিসীমা!—হ্যাঁ, সেই ছেলেটির পিসীমা। মায়ের কথা মনে নাই। বাবার কথা কিছু কিছু মনে পড়ে।

যেমন বাপ! তেমন ছেলে। সে হতভাগাও এমনি ডাকাত

ছিল,—তা না হলে বামুনের ছেলে এমন পিরবিত্তি কেমন করে হ'ল? ডাকাত, ডাকাত! কাউকে মানত না। কে কি করেছে না করেছে,—তোর অত খোঁজ খবরে দরকার কি? এখন হ'ল তো? ছেলেও বাপের ধর্ম পেয়েছে।—বুড়ী বকছে।

—হ্যাঁ, বলতেন বটে আমার বাবা। এই ছেলেটি বাপের নাম রাখবে! কিন্তু কি যে হ'ল, পোড়া কপাল আমার! তা না হলে নিজের সব খুইয়ে বাপেব বাড়িতে বাপভাইয়েব সংসার আগলাতে হবে আমাকে। বউটি লক্ষ্মী ছিল তাই ওই হাড়হাভাতেদের হাত থেকে বেঁচে গেছে।—মাঝে মাঝে চোখের জল মোছে বুড়ী।

আবাব চলছে বকব বকব,—তিন বছরের ছেলে বেখে গিয়েছিল বউ! মরবার সময় আমাব হাত ধবে কত কেঁদেছিল, কথা বলতে পাবে নি। আহা-হা সতীলক্ষ্মী আমাব!—কাঁদছে বুড়ী।

তিন বছরের ছেলে দাওয়ায় ছুটাছুটি করছে। বাড়িতে কান্নার বোল উঠেছে। পায়ে আলতা, মাথায় সিঁদুব লেপে দিয়েছে,—চোখ চেয়ে রয়েছে ছেলেটির মা। লালপাড় শাড়িতে কেমন মানিয়েছে।

দাহু কাঁদেন নি—। তবু তাঁবও চোখে জল ঝরেছিল। হ্যাঁ, নামটাও মনে পড়ছে—উমাশঙ্কর! গলায় ধবধবে পৈতে। মাথায় চন্দনের তিলক।

—তারা, তারা মা!—দাত্বর গলার স্বর যেন বের হচ্ছে না।

কারা কাঁধে ক'রে খাটিয়া নিয়ে চলে গেল।—হরিবোল,—বলহরি হরিবোল। ছোট ছেলেটি অবাক হয়ে দেখছিল। কোথা নিয়ে যাচ্ছে তার মাকে।

এমনি দৃশ্যের পর দৃশ্য,—আউলিয়া দু'হাতে চোখ রগড়ায়। তারও চোখে বুঝি জল এসেছে!

বড় হয়ে উঠল ছেলেটি।

তার বাবার কথা ইনিয়ে বিনিয়ে বলছেন পিসীমা। বামুনের ছেলে হয়েও বামুনের আচার-বিচার মানত না। এমন যে উমাশঙ্কর

পণ্ডিত, তাঁর ছেলের এ কি ধারা! লেখাপড়া করতে করতে ছেড়েই দিলে। এত যজমান শিষ্য!—তাদের দিকে ফিরেও তাকায় না। উমাশঙ্কর কত বোঝালেন। সুন্দরী বউ দেখে বিয়েও দিলেন। ছেলেও হল একটি। কিন্তু কোন ফলই হল না।

—বাঃ, আউলিয়া যেন বই পড়ছে; বইয়ের পাতা উলটে যাচ্ছে। কত ছবি, কত কথা, কত নাম! উমাশঙ্কর! উমাশঙ্করের ছেলে দেবশঙ্কর। সবাই ডাকে—দেবু।

হ্যাঁ, দাদুর মুখে শুনেছিল সে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের কথা। সুরেন বাড়ুজ্জে আর বিপিন পালের কথা। তাদের দেশেরই ছেলে সুশীল সেনকে বেত মারার অর্ডার দিয়েছিল কিংসফোর্ড ম্যাজিস্ট্রেট। তার জন্যই ক্ষুদিরাম গেল সেই সাহেবকে মারতে। ফাঁসি হ'ল ক্ষুদিরামের।

এপাড়া-ওপাড়া ঘুরে বেড়ায় দেবু। কোথায় মড়ক লেগেছে। কার বাড়িতে কে জ্বরে বেহুঁস হয়ে পড়ে আছে, কার হাঁড়ি কোন্ দিন চড়ছে না,—তার খবর রাখছে। ঘর থেকে চাল নিয়ে গিয়ে কার হাঁড়িতে ঢেলে দিয়ে আসছে। ঘরে কোন কিছুই রাখবার জো নেই। পিসীমা বুড়ী গালাগালি করছে।

শুধু কি নিজের ঘরের জিনিস দিয়ে আসছে?—যার তার গোয়ালে চুপি চুপি ঢুকে দুধ দুইয়ে এপাড়ায়-ওপাড়ায় বিলিয়ে দিয়ে আসছে। ইদ্রিস মিয়ার বাচ্চা ছেলেটা দুধ পায় না। গগন মালাকরের বউটা রক্তশূন্য হয়ে পড়েছে,—তারও দুধ খাওয়া দরকার। গনির গাঁয়ে মড়ক লেগেছে, ওষুধপথ্যি জোগাতে হবে। ডাক্তার চাই। চলল অনুপম ডাক্তারের কাছে। আর অনুপম ডাক্তারটাই বা কেমন?—ওই দেবুটাকে আস্কারা দিচ্ছে। এই তো দেবুর ইতিহাস।

সেই দেবুর মাথায় খুন চাপল। স্বদেশী করতে হবে; কয়েক মাস গাঁ থেকে কোথায় উধাও হল। তারপর একদিন বাড়ি ফিরে এল। বেশ নিশ্চিন্দি দু'চার দিন কাটল। দেবু যেন ঠাণ্ডা হয়ে গেছে।

গাঁয়ের জমিদার সর্বানন্দ চৌধুরী। সর্বানন্দের ছেলে জীবানন্দ চৌধুরী,—জীবানন্দ দেবশঙ্করেরই সমবয়সী। জীবানন্দও বিদ্যামন্দিরের সিঁড়ি ভেঙ্গে বেশী দূর উঠতে পারেনি। সর্বানন্দ বলতেন,—কি হবে বাবা! বেশী লেখাপড়া করে। নাম সই করাটা শিখলেই আমার যা আছে, তা খায় কে? একই তো ছেলে।

জীবানন্দও গাঁয়ে গাঁয়ে ঘোরে। কিন্তু সে আর একরকমের ঘোরা! পাড়ার বউঝিরা সন্ত্রস্ত হয়ে উঠে। ছিরিপুরের মালাকরেরা তো কয়েক বার সর্বানন্দের কাছে নালিস জানিয়ে গেছে।

সবই বয়সের ধর্ম বাবা!—সব ঠিক হয়ে যাবে! আর আমার অবর্তমানে জীবু তো তোদের দেখাশোনা করবে। তখন আর এনিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করিস না,—ভ্রূকুটি ছিল সর্বানন্দ চৌধুরীর চোখে।

জীবানন্দের ইয়ারবন্ধুও জুটেছিল অনেক। বাজার-পাড়ায় তাদের আড্ডা ছিল। ইদানীং মদও ধরেছিল জীবানন্দ। মানুষকে মানুষ বলে গ্রাহ্যই করত না।

অবনী পালের বিধবা মেয়ে শ্যামলী! সেই শ্যামলী একদিন এসে কেন যে দেবুর পায়ে পড়ে কেঁদেছিল কেউ জানে না। তারপর আবার উধাও হল দেবু।

আর ফেরে নি দেবশঙ্কর। কিন্তু দিনকয়েকের মধ্যে জীবানন্দের লাস পাওয়া গেল বাজার-পাড়ার পথে। কে বা কারা যেন টুক্‌রো টুক্‌রো করে কেটে ফেলেছে তাকে। পুলিস এ খুনের কোনো কূল-কিনারা করতে পারল না। তারপর ছয়মাস পর একদিন খবর এল—কোথায় ডাকাতি করতে গিয়ে পিস্তলের গুলিতে প্রাণ দিয়েছে দেবশঙ্কর,—ডাকাতি,—স্বদেশী ডাকাতি।

বাড়িতে কান্নার রোল উঠেছিল,—না, না ভুল কথা। এপাড়ায়-ওপাড়ায় অনেকেই কেঁদেছিল। তারা এসে দাঁড়িয়েছিল উমাশঙ্করের কাছে।—সবই তো লেখা রয়েছে বইয়ের পাতায়। আউলিয়ে পড়ছে,—বইয়ের পাতা,—না স্মৃতির পাতা!

শুধু বইয়ের পাতায় পড়া নয়, আউলিয়ার সামনে এসে দাঁড়িয়েছে সেই ছেলেটা। কি আশ্চর্য ?—কে—কে তুমি ?

—আমি, আমি,—আমায় এখন চিনতে পারবে না। আমি যে হারিয়ে গেছি। —হাসছে ছেলেটা। সুন্দর জোয়ান ছেলে।

—আমার গল্প শুনবে তুমি ? এই তো রাতদিন আমারই স্বপ্ন দেখছো, আর আমার কথা ভাবছ, আমায় চিনতে পারবে কেন ? যেখান থেকে চলে এসেছো, সেখানে তো আর ফিরে যেতে পারবে না !

ছেলেটির মুখের দিকে তাকায় আউলিয়া।

শোনো, তবে বলছি। অনেক কথা জমা হয়ে রয়ে গেছে। মনের কথা বলবার মতো আর কাউকে খুঁজে পাচ্ছি না। হ্যা, আর এক জনকে বলতে পারতাম, কিন্তু সে ধরাছোঁয়ার বাইরে। সেই মেয়েটি—! তার নাম আমিও ভুলে গেছি। সেই যে আমরা একসঙ্গে খেলাধুলা করতাম। কত সাঁতার কাটতাম কাজলপুকুরে। দত্তদের বাগানে পেয়ারা চুরি করতাম। আর চৌধুরীদের জামগাছের জাম পাড়া, সবই ভুলে গেছো।

কাজলপুকুর !—আউলিয়ার চোখের সামনে ভেসে ওঠে একটি মস্ত বড় পুকুর,—তাতে সাঁতার কাটছে ওরা কারা ?

ছেলেটি বলতে থাকে, বড় দুরন্ত হয়ে উঠেছিলাম আমি। রাতদিন খেলা আর খেলা,—স্কুলের সেরা ছেলে। অথচ দুরন্তপনায় পাড়ার সকলেই অতিষ্ঠ। পণ্ডিতমশাই বলতেন, হবে না ? শঙ্কর ঠাকুরের নাতি তো ? তারপর সেই স্বদেশী হুজুগ ; স্কুল ছাড়লাম, জেলে গেলাম। ফুলের মালাও গলায় পরলাম। হাসতে থাকে ছেলেটা।

আউলিয়া তার মুখের দিকে তাকিয়ে বিস্মিত হয়,—তুমি জেলে গেলে ?

হ্যাঁ, জেলে গেলাম। বাড়িতে বুড়ো পিসীমা, রাতদিন গজর

গজর করে। পাড়ার লোকের নালিশে পিসীমা অতিষ্ঠ। পড়াশোনায় আর মন বসল না। আর সেই মেয়েটিও আর গাঁয়ে নেই; সে চলে গেছে শহরের কোন্ এক মিশনারী স্কুলে।

কৈলাস দত্তের কথা মনে পড়ে?—কৈলাস দত্ত। বাজারে যার মস্ত বড় কাপড়ের দোকান। সেই কৈলাস দত্ত। থানার দারোগা থেকে শহরের ডেপুটি পর্যন্ত সকলেই তাকে চিনত। এ অঞ্চলে কোনো তল্লাসীর ব্যাপার ঘটলে কৈলাস দত্তের বৈঠকখানায়ই তাদের আড্ডা বসত। সর্বানন্দ চৌধুরী তো অথর্ব হয়ে গিয়েছিলেন, তাঁর সেই ছেলেটা খুন হবার পর আর তাঁর মাথার ঠিক ছিল না। বাড়িতে এক গুরুদেব এসে আস্তানা গেড়েছিলেন। গেরুয়া পরতে শুরু করলেন সর্বানন্দ। বাড়িতে শুধু ওঁকার-এর ঢেউ।—হিঃ হিঃ করে হেসে উঠল সেই ছেলেটা।

কৈলাস দত্ত কিন্তু আমাকে মোটেই দেখতে পারতেন না। তার মেয়েটা এসব দুরন্ত ছেলেদের সঙ্গে মেলামেশা করে তাও পছন্দ করতেন না। শহরেও তার গদী ছিল। তিনি সর্বানন্দ চৌধুরীর হিতৈষীও হয়ে উঠলেন। গুরুদেবকে নিয়ে মেতেছেন সর্বানন্দ। মাসে পাঁচবার করে বাড়িতে যজ্ঞ হচ্ছে। সেই যজ্ঞের ইন্ধন জোগাতেন কৈলাস দত্ত।

কৈলাস!—বলতে না বলতেই হাতজোড় করে কৈলাস দত্ত সর্বানন্দের সামনে গিয়ে হাজির হতেন।

এদিকে সর্বানন্দের জমিদারীর মৌজাগুলো এক এক করে খসতে লাগল। কৈলাস দত্ত জমিদার হয়ে উঠতে লাগলেন। সর্বানন্দের বাড়ির দোল, দুর্গোৎসব বন্ধ হতে লাগল।

গুরুদেব বললেন,—এসব মেকী বাবা! ওসব কিছুই নয়। যাক্। কৈলাস দত্ত স্বদেশীদের বিরোধী হয়ে উঠলেন। তিনিই পুলিশে খবর দিয়ে গাঁয়ের দুরন্ত ছেলেদের ঠাণ্ডা করবার ব্যবস্থা করলেন।

কৈলাস দত্তের অনেক পরিবর্তন হয়ে গেল। আর সে কৈলাস দত্ত

নেই। বাজারের কৈলাস মহাজনকে আর কেউ খুঁজেও পাবে না। তবু কৈলাস দত্ত বেঁচে রয়েছেন। আর সেই মেয়েটিও কোথায় হারিয়ে গেছে, তাকেও আর খুঁজে পাবে না। আমার চোখের দিকে তাকিয়ে সেই মেয়েটি আর দুষ্টুমির হাসি হাসবে না। জেলের গেট্ পেরিয়ে বেরিয়ে এলে সেই মেয়েটিই আমার গলায় মালা পরিয়ে দিয়েছিল! বুকটা নেচে উঠেছিল। কত স্বপ্ন দেখেছিলাম। চোখে চোখে কত কথা বলেছিল সেই মেয়েটি।

রায় বাহাদুর! হাঃ—হাঃ—হাঃ!—চিৎকার করছে আউলিয়া; তার সামনে থেকে ছেলেটা উধাও হয়ে গেছে।

পীরের দরগা। নিশুতি রাত। নির্জন পথ ঘাট। গাছের পাতা-গুলো জ্যোৎস্নায় ঝিক্‌মিক্ করছে। ওদিকে জ্বলছে অগুনতি বাতি। দরগার বেদীগুলোও তার স্তিমিত আলোকে কেমন এক ভীতির উদ্রেক করছে।

তালগাছের মাথায় ঝটাপট শকুনির পাখার আওয়াজ। আউলিয়া বসে আছে এক কোণে নিঝুম হয়ে। ঘুমুতে চায়। কিন্তু ঘুম আসে না। আশ্চর্য! শহরের লোক তার দয়া মাগে। তার দয়ায় নাকি অসাধ্য সাধন হয়। এই তো সন্ধ্যে বেলা তার পায়ের তলা থেকে ধুলো কুড়িয়ে নিয়ে গেল কুমুদ গোসাঁই। তার ছেলে না কি বাঁচবে না। সেইজন্য আউলিয়ার দয়া চাই। আউলিয়ার পায়ের ধুলির এত গুণ! বারণ করলে,—গালাগাল দিলেও শুনে না। কি করবে আউলিয়া? লোকগুলো বোঝেও না।

পায়ের তলায় হাত বোলায় আউলিয়া। কি আছে এই পায়ের তলায়?—হাসে, আবার আকাশের দিকে তাকায়। রাত গভীর হয়েছে। আজ আর টিলাগড়ে যাওয়া হল না। ঐ যে তারার রাজ্য। কি আছে ঐ তারার রাজ্যে? কোটি কোটি তারা, কোটি কোটি সূর্য। কত বড় তারা?—পৃথিবীর সূর্য! তার চাইতেও বড় বড় সূর্য রয়েছে।

অনন্ত আকাশ—অনন্ত সূর্য! অনন্ত তারা! মহাশূন্য জুড়ে বিরাট, বিরাট খেলা! কে আছে এর আড়ালে? ভাবছে আউলিয়া। মাটি, মাটির মানুষ। মাটিতেই মিশে যাবে। এই যে এত তারকা—আকাশেই থেকে যাবে। আর এই যে বট গাছ, এমন করেই দাঁড়িয়ে থাকবে কত কাল কে জানে?

তালগাছের ওপর প্যাঁচার ডাক,—কান্নাব মতই শোনায় উঁয়া-উঁয়া উঁয়া। আউলিয়া চমকে ওঠে। কান্না?—কান্নাই মানুষকে সজাগ করে দেয়। সবই থাকবে। তাবা, পৃথিবী, চন্দ্র ও সূর্য সবই থেকে যাবে। আউলিয়া থাকবে না। এই মানুষগুলোও থাকবে না। নতুন মানুষ আসবে। কুমুদ গোসাঁইর ছেলেটা হয়ত মরেই যাবে। না, না, বেঁচে উঠুক ছেলেটা। তবু মরতে হবে একদিন। কেউ কাউকে বেঁধে বাখতে পারবে না। তবু বেঁধে বাখতে চায়।—জানে, জানে রাখা যাবে না। তবু ডাক্তার বদ্যি ডাকে।

আচ্ছা ওই কান্নাটার গলা টিপে মেরে ফেলা যায় না? এলোমেলো চিন্তা জাগে। আউলিয়া উঠে পড়ে, না এখানে আব নয়। টিলাগড়ে যেতে হবে।

বাঁধন, বাঁধন—সবই মায়ার পাশ। ওই সাদা বাড়িটা এমন ক'রে তার মাথা গুলিয়ে দেয় কেন? কি আছে ওই বাড়িটায়? মায়া? আউলিয়া ছন্নছাড়া। তার আবার মায়ার বাঁধন কি? তবু এই বাড়িটা চোখে পড়লেই কি যেন হয়ে যায়,—ছবির পর ছবি চোখের উপর ভেসে ওঠে;—সেই একটি ছেলে আর একটি মেয়ে! অনেক কথা—অনেক কাহিনী বই পড়ার মত মনের ফলকে জ্বল জ্বল করে ওঠে।

আর এ বাড়ির মানুষগুলোর সঙ্গে যেন সেই কাহিনীর কোনো যোগাযোগ রয়েছে! আর ওই মহিলা! কোথায় যেন কোন্ যুগে তাকে দেখেছে! কিন্তু এমনটি দেখে নি,—নিশ্চয় দেখে নি। না, এ বাড়ির মানুষগুলোকে সে চেনে না। তবু কোন্ কোন্ আকর্ষণে

এখানে আসে সে? এদের সঙ্গে তার কি সম্পর্ক? মানুষ?—আউলিয়া তো মানুষের জগতের বাইরে! সে যে সিদ্ধপুরুষ। ঘর বাড়ি আত্মীয় স্বজন সবই তার কাছে ঝুটা। সবই ভুলে গেছে আউলিয়া। এইজন্যই তো সে বিবাগী, বৈরাগী। তার তো কেউ নেই। নিজেকে হারিয়ে ফেলেছে সে।

নবপল্লী,—না সুরুচি কলোনী! বেশ সুন্দর নাম। কৈলাস দত্ত! নামটা বড় কটকটে। সুরুচি কলোনীর পত্তন করেছেন কৈলাস দত্ত,—রায় বাহাতুর কৈলাস দত্ত। নামটা মনে পড়লে তার সঙ্গে তার পেছনকার বিশ্রী কত ছবি যেন ভেসে ওঠে। আউলিয়া কি অন্তর্যামী? কৈলাস দত্ত কি ছিলেন আর কি হয়েছেন?—কি আশ্চর্য!—এত পরিবর্তন!

এ যেন রূপকথার এক গল্প!

কেউ এ গল্প জানে না। এক যে ছিল রাজকন্যা। না, না এক যে ছিল তুষ্টু মেয়ে। আর ছিল এক তুষ্টু ছেলে! তারা রাতদিন তুষ্টুমি করত। তারা বড় হয়ে উঠছে। ছেলেটা কিন্তু মনে মনে মেয়েটাকে ভালবাসে। আর মেয়েটা?—মেয়েটার কথা তো সে জানে না। তুজনে একসঙ্গে সাঁতার কাটে; ছুটোছুটি লুটোপুটি করে। ছেলেটা গরীবের ছেলে; আর মেয়েটার বাবা বড়লোক। মেয়েটার বাবা কি যেন আঁচ করলে। তার পর মেয়েটাকে দূরে পাঠিয়ে দিলে—।

হঠাৎ চমকে ওঠে আউলিয়া—একি? কাকে কে গল্প বলছে। কেউ নেই। লোকই বা কোথা? আউলিয়া—নিঃসঙ্গ একক,—একক হয়ে প'ড়েছে। ছন্নছাড়া তার জীবন। আলেয়া সব আলেয়া!

জাতিস্মর!—স্মৃতির বোঝা বইছে আউলিয়া। তার নিষ্কৃতি নেই। ওরা তবু সুখে আছে। সুখ তুঃখ নিয়ে ঘর করছে। হাসছে। কাঁদছে। রোগে ভুগছে আবার কাজও করছে। মনে তাদের তুর্দান্ত আশা। আশাই তাদের বাঁচিয়ে রেখেছে। তাদের মুঠোতে এক এক বার সুখের ফসলও ওঠে। কিন্তু আউলিয়ার মুঠো শূন্য!

সেই শূন্য মুঠো নিয়েই দয়া বিলোতে হয়। ওরা মনে করে আউলিয়ার মুঠো আশা-ভরসায় ভরা। তার এক কণা পেলে তারা ধন্য হয়ে যাবে। এসেছিল অন্ধ এক বুড়ী। কত কাহিনী তার। ইনিয়ে বিনিয়ে শুনিয়ে গেছে। ঘর ছেড়ে বেরিয়ে এসেছিল ঘরের বউ—

সুবালা,—আশা-আনন্দে দেহ-মন ভরা। কৈশোর থেকে যৌবনে পা ফেলছে। বাসর রাতের সুখের স্বপ্ন, রাজকন্যা সেজেছে সুবালা। আর এক জনকে জীবনে বরণ ক'রে নিল। একদিন ছিল ছোট মেয়ে। আজ তার আর এক মূর্তি। দেহমনে জোয়ার এসেছে এতদিনের পরিচিত বড় আপনার জন' বাপ মা ভাই বোনকে ছেড়ে অজানা অতিথিকে আপন ভেবে বরণ করেছে। তার সঙ্গে গাঁটছড়া বেঁধেছে। তারও ঘর হবে, গৃহিণী হবে সে। ঘরকন্না, সংসার! ছেলেমেয়ে হবে। দুষ্টু ছেলে দস্যুবৃত্তি করবে। কত স্বপ্ন! কিন্তু সবই মিথ্যা হয়ে গেল। যাকে সাতপাকে বেঁধেছে বলে মনে করেছিল, তাকে যে বাঁধা যায় নি, তা ধরা পড়ল। কোথায় যেন কি ফাঁক থেকে গেছে। তার সে রূপ-কথার রাজপুত্র কোথা উধাও হয়ে গেছে। এ যে নির্বিকার এক মানুষ। কিন্তু সুবালার দেহ মনে তখন উত্তাল তরঙ্গ। সেই তরঙ্গে সুবালা নিজে নিজেই ভেসে গেল। তার জীবনে এল আর একজন। যেন তাকে ধাঁধাঁয় ফেললে। তারই পেছনে ছুটল সুবালা। যৌবনরাত্রির অভিসার। সুবালা ঘর ছাড়ল। পালিয়ে গেল নতুন অতিথির সঙ্গে। কিন্তু কোথা গেল সে মনের মানুষ? বড় দেরী হয়ে গেল যে! সুবালার নতুন বঁধুয়া যে ফাঁকি,—শুধু আলেয়া—তা বুঝল যখন তখন সে বন্দিনী হয়েছে এক কুখ্যাত পল্লীতে। বঁধুয়া পালিয়ে গেছে। উপায় নেই। দেহের পসারিনী সাজল সুবালা। সে যে কি ক্লান্তি, কি যে অভিশাপ,—রূপের আগুনে পরকে পোড়াতে গিয়ে রাতের পর রাত নিজেই পুড়ে মরেছে। আজ সে অন্ধ বুড়ী। তার সে বাসর রাত্রির বন্ধুর জন্য চোখের জল ফেলে। তার কি প্রায়শ্চিত্ত আছে?

আউলিয়ার পায়ে পড়ে কেঁদেছিল বুড়ী।

এদের কাহিনী আউলিয়াকে শুনতে হয়। মনটা মাঝে মাঝে উতলা হয়ে ওঠে। আগে আগে সে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠত। এখন সয়ে গেছে। মনটা অনেকখানি শক্ত হয়ে গেছে। আগে এরকম কাহিনী শুনলে হাতের পেশী শক্ত হয়ে উঠত। চোখে জল আসত। এখন চুপ ক'রে শোনে।

নতুন কাজে মেতেছে আউলিয়া।

দুঃখীর দুঃখ ঘুচাতে হবে! কার ছেলে মরে যাচ্ছে তাকে বাঁচাতে হবে,—সময় নেই, অসময় নেই,—বাবা! বাঁচাও। বাবা বাঁচাও। শুধু কি তাই? কন্‌ট্রাক্‌টার ফটিক ডাটাকে জেল থেকে বাঁচাতে হবে। সকলের মুখেই—আরো চাই, আরো চাই! আউলিয়া ফকির, গাছতলায় যার বাস, তার কাছে সকলেই ছুটে আসে!

হাসে আউলিয়া! সে কিসের হাসি? নিজের কথা ভাবে আউলিয়া। সত্যি কি তার এত গুণ আছে, এত ক্ষমতা আছে? আউলিয়া মন্ত্র জানে? আউলিয়া যাদু জানে!

হাঃ—হাঃ—হাঃ।

চোরও সাধু হয়ে যায়! আহা-হা! কি সুন্দর ছেলে। নাম বলেছিল নিরঞ্জন। ছেলেটি চুরি করতে শিখে গেছে। কেন?—কেন সে চোর হয়েছে?

ছেলেটির কথা শুনে আউলিয়া হেসেছিল। আবার আঁত্‌কেও উঠেছিল। এমনই হয়। নিজের যা কিছু আছে সবই অপরে কেড়ে নেবে আর তুমি হবে চোর!

এমনি ঘটনা ঘটেওছিল। কাকা আর কাকীমা! ছেলেটি তার কাকা আর কাকীমার ফাঁদে পড়েই চোর হ'ল। তার আর কোনো উপায়ই ছিল না। উপায় না থাকলে আর কি করতে পারে? তুমি একজনকে খেতে না দিয়ে কাজ করিয়ে নিচ্ছ, আর তুমি ক্ষীর, ননী, ছানা, মাখন খেয়ে কেমন নাদুস্‌-নুদুস্‌ গোপালবাবু সেজে বসে

আছো। তার চোখের সামনে সব খাবার থরে থরে সাজানো রয়েছে। তুমি তোমার কুকুরকে খাওয়াচ্ছ, বেড়ালকে আদর করে তার মুখের সামনে দুধের বাটি তুলে ধরেছো। মাছের মুড়োটা বেড়ালের মুখের কাছে এগিয়ে দিচ্ছ। তুমি মানুষ! আর তোমার পাশেই দাঁড়িয়ে রয়েছে, তোমারই মতো আর একটি মানুষ! তার পেটে খিদে। অথচ তোমারই এই অন্ন ব্যঞ্জন সে তৈরী করে দিচ্ছে। তার বেলা শুধু দুটি পোড়া ভাত আর ছিটেফোঁটা ডালচচ্চড়ি! সে চুরি করবে না?

হ্যাঁ, ছেলেটির কথা শুনে হেসেছিল আউলিয়া। এমনি বকর বকর করে হাত নেড়ে কথা বলছিল ছেলেটি! বেশ সুন্দর নাম নিরঞ্জন। নিরঞ্জন শুধু হাসায় নি, আউলিয়ার চোখে জলও এনে দিয়েছিল।

আমি ভদ্রঘরের ছেলে। আমাকে ভাল ক'রে দাও বাবা! আমি মরব, তবু আর চুরি করব না।

কিন্তু কি করবে? চুরি করা ছাড়া তো আর কোনো উপায়ই নেই। ভদ্রলোকের ছেলে কেউ বাড়িতে তাকে চাকরও রাখবে না। আর দয়া করে রাখলেও ফাই-ফরমাস খাটিয়ে পেটের ভাত দেবে। কিন্তু এই দয়া?—এই দয়া তো নিরঞ্জনের কাছে এক বিভীষিকা! চাকরের কাজ এর চাইতে ভাল ছিল। এই খোকা! এক বালতি জল তুলে দাও।—নাস্তিকে স্কুলে দিয়ে আসতে হবে! এই মরেছে, জলটা ছুঁয়ে দিলে?—এতো ঘুম? সন্ধ্যে হতে না হতেই ঘুম! - চান্ করোনা, গায়ে কি গন্ধরে বাবা!

কত কথা শুনতে হয়! খোকার—নিরঞ্জনের জীবন অতিষ্ঠ!

চা-বাগানে চাকরি করতেন নিরঞ্জনের বাবা! অনেক দিনের চাকরি। ছোটভাইকে এনে ও সাহেবদের বলে কয়ে বাগানের কাজে ঢুকিয়েছিলেন। হাজরি-বাবুর কাজ পেয়েছিলেন নিরঞ্জনের কাকা। সেই ভাইকে বিয়েও করিয়েছিলেন নিরঞ্জনের বাবা। হঠাৎ নিরঞ্জনের বাবা মারা গেলেন। নিরঞ্জন ছোট ছেলে। বাগানের স্কুলে ষষ্ঠ মানে

পড়ে। কাকার উপর সংসারের ভার পড়ল। কাকা বেণীবাবু বেসামাল হয়ে উঠলেন। একদিকে নিজে, তাঁর স্ত্রী সৌদামিনী তাদের সঙ্গে আবার চারটি ছেলেমেয়ে। অপরদিকে বিধবা বৌদি, তার ছেলে নিরঞ্জন আর মেয়ে কুশলা। বৌদির হাতেই সংসারের ভার তুলে দিলেন বেণীবাবু। সৌদামিনী বললেন,—দিদি, তোমারই সব, আমি বেতো রোগী। হার্টের ব্যারাম। আমি এ ঝক্কি পোয়াতে পারব না।

সংসারের ভার অর্থাৎ উদয়াস্ত খাটুনি। এক সঙ্গে রাঁধুনি আর ঝিয়ের কাজ। সাধ ক'রেই ঘাড়ে তুলে নিলেন নিরঞ্জনের মা! সত্যি তো, ছোট বউ এত কি পারে? কিন্তু দু'চারদিন যেতে না যেতেই সবই বুঝতে পারলেন নিরঞ্জনের মা।

নিরঞ্জনের মা বুঝতে পারলেন এ সংসার তার নয়। আর তার ছেলে নিরঞ্জন আর মেয়ে কুশলাকে পেট ভরে খেতে দেবার ক্ষমতাও তার নেই। ভাঁড়ারের চাবি ছোট বউ সৌদামিনীর হাতে। মাসের পর মাস যায়। জ্বালা আরো বাড়ে। চোখের জল ফেলা ছাড়া উপায় নেই। কুশলা পেটের জ্বালায় কাঁদে। নিরঞ্জনের স্কুল যাওয়া বন্ধ হ'ল। দিনরাত কাকা আর কাকীমার ফরমাস খাটে।

কাকীমা বলেন,—এখানে এই কুলী কামিনদের সঙ্গে থাকলে ছেলেদের লেখাপড়া কোনো কিছুই হবে না। নিরুকে আমার দাদার ওখানে শিলিগুড়ি পাঠিয়ে দেবো।—কিন্তু শিলিগুড়ি আর পাঠানো হয় না।

এ কি দিদি?—এক বোতল সর্ষের তেল দু'দিনে শেষ করে দিলে? তোমার দেওর গোবেচারী মানুষ এতো পারবে কেন? আমারই হয়েছে যতো জ্বালা! চালের মণ কতো জানো?

শুধু কথাই শুনতে হয়। কুশলা আর নিরঞ্জন পেট ভরে খেতে পায় না।—নিরঞ্জন ভাবে, মা কি বোকা? বাবার তো জমানো কত টাকা ছিল? কাকার ছেলেটার জ্বর না সর্দি কি যেন হ'ল কাকীমা

তো কেঁদে কেটে বাড়িটা মাথায় তুললে। ডাক্তার চাই, বদ্যি চাই, এ কুলী কামিনের ডাক্তারে হবে না। শিলিগুড়ি থেকে ডাক্তার আনতে হবে।—টাকা কোথা? মা-ই টাকা বের করে দিলেন। এরকম ক'রে ক'রে মায়ের ভাঁড়ার যে শূন্য হয়ে গেল!

পেট ভরে খেতে পাবো না? আর ওরা দিব্যি খেতে পাবে? না, তা হয় না।—চুরি ক'রে খেতে লাগল নিরঞ্জন।—ওকি? রুটি এত কম কেন? ঢাকা তো ঠিকই রয়েছে!—লজ্জায় নিরঞ্জনের মায়ের মাথা কাটা যেতে লাগল। আজ মাছ ভাজা কম,—কাল ভাত কম, কি যে হয় কেউ বলতে পারে না। ধরা পড়ল নিরঞ্জন।

মার খেল, মা কত বোঝালেন। কাকীমা তর্জন গর্জন করলেন—বাড়ি থেকে বের করে দেবো। গোষ্ঠীসুদ্ধ আর পুষতে পারব না। কিন্তু কিছুতেই কিছু হ'ল না।

নিরঞ্জনের গল্প শুনতে শুনতে হাসতে থাকে আউলিয়া,—চুরি, চুরি! মুখে ভাত পুরে দে ছুট্! মাছের কাঁটা গলায় আটকে গেল!—ওয়াক্ ওয়াক্! ধরা পড়ে গেল যে! তবু চুরি বাবা! ভয় থাকলেও লোভ বেড়ে যায়। কেমন মজা।

তারপর কাকার পকেট মারো!—কাকার পকেট থেকে পয়সা চুরি যেতে লাগল। বোকা কাকা অতশত বুঝবে না। বেশী নেবে না। দু'চার পয়সা থেকে সিকি আধুলি তার পরে টাকায় উঠল। আবার ধরা পড়ল। এবার কিন্তু বেদম মার। ঠেঙ্গানি, রক্তারক্তি হয়ে গেল। মাথাটা দেয়ালে ঠুকে দিলেন নিরঞ্জনের মা।—"ওঃ মা! কি হবে? যত সব ডাকাতের কাণ্ড। খুনজখমের দায়ে পড়ব না কি!" হাউমাউ করে উঠলেন বেতোরোগী কাকীমা।

তবু নিরঞ্জনের স্বভাব বদলায় না। কুশলার মুখখানা দিন দিন শুকিয়ে যাচ্ছে। জ্বর ধরল মেয়েটাকে। ওষুধ নেই, পথ্য নেই। কাকা বলেন, কুইনাইন দাও। এতবড় ছেলে বোনের জন্ম হাসপাতালে গিয়ে ওষুধ আনতে পারে না!

ওষুধ এনেছিল নিরঞ্জন। হাসপাতালের ডাক্তার এসেও দেখে-ছিলেন। কিন্তু দেখেশুনে ডাক্তার যা বললেন, তাতে নিরঞ্জনের মায়ের চোখ কপালে উঠল। ডাক্তার বললেন, বুকটা দেখাতে হবে। এক্স্-রে করা দরকার। কমলালেবুর রস খেতে দিন। দুধ অন্ততঃ আধসের করে খেতে দিন। এখানে তো এ রোগের চিকিৎসা চলবে না।

নিরঞ্জন সকল কথাই শুনেছিল। তার মাও নিরুপায়। কাকা বললেন, "ডাক্তাররা ওরকম বলেই থাকে। স্রেফ্ ম্যালেরিয়া, কুইনাইন খাক্। সেরে যাবে।" কিন্তু কুশলার রোগ সারল না। একদিন মেয়েটা চোখ বুজল, আর খুলল না।—বলতে বলতে চোখ মুছেছিল নিরঞ্জন। কুশলা মারা যাবার পর সে একেবারে মরিয়া হয়ে উঠল। একদিন কাকীমার গলার হার নিয়ে পালাল। তারপর কোথায় কোন্ কান্তি পোদ্দারের দোকানে বিক্রি করতে গিয়ে ধরা পড়ল। কাকা-কাকীমার এবার রুদ্রমূর্তি। তারা পুলিশে ডাইরী করলেন। নিরঞ্জনের তিন মাসের জেল হয়ে গেল।

জেল থেকে ফিরে এসে মায়ের খোঁজ করল নিরঞ্জন। কাকীমা তাকে দেখতে পেয়ে দরজা বন্ধ করে দিলেন—"চোর-ছেঁচড়ের জায়গা এখানে নেই।" পাশের বাড়ির বুড়ো শান্তিরামবাবু বললেন,—তোমার মা পাঁচু ময়রার বাড়ি আছেন। এখান থেকে তোমার কাকীমা তাড়িয়ে দিয়েছে।

পাঁচু ময়রা নিরঞ্জনের মা-কে ঠাঁই দিয়েছে। এক বাড়িতে রাঁধুনীর কাজ করেন নিরঞ্জনের মা। কি করবে নিরঞ্জন? মা তাকে দেখতে পেয়ে কেঁদে উঠলেন। মুখে তার অভিসম্পাত—তুই এ কি করলি হতভাগা! কুলে কালি দিলি। এর চাইতে যে ভিক্ষে করা ভাল ছিল।

নিরঞ্জন মাথা হেঁট করে রইল—সত্যি সে আজ চোর! কেউ তাকে বিশ্বাস করবে না। কে তাকে কাজ দেবে? সকলেই সন্দেহের চোখে দেখছে তাকে। পাঁচু ময়রা বললে, নিজের পায়ে দাঁড়াও

দাদাভাই। আমার দোকানপাট না হয় দেখ। মনে মনে পাঁচু ময়রাকে প্রণাম জানায় নিরঞ্জন। কিন্তু বেশীদিন নয়। তার মনে হল পাঁচু ময়রাও তাকে সন্দেহ করে। তার মাও দিন রাত খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে তাকে উপদেশ দেন। নিরঞ্জন চোর!—হ্যাঁ, সে চোরই হবে। ওরা কেউ তো তাকে বিশ্বাস করে না। নাঃ, সে এর প্রতিশোধ নেবে। প্রতিশোধ নিল নিরঞ্জন,—নিরঞ্জনের কাকার বাড়িতে একদিন বড় রকমের চুরি হয়ে গেল। থালা বাসন, গয়নাপত্র সবই চোরেরা নিয়ে গেছে।

পুলিশের রিপোর্টে জানা গেল, নিরঞ্জন একদল দাগী চোরের সঙ্গে মিশে এই চুরি করেছে। তাদের একজন ধরা পড়েছে। কিন্তু নিরঞ্জনের আর পাত্তা নেই।

সেই নিরঞ্জন এসেছিল, মা-কে ভুলতে পারে নি। কেমন লুকিয়ে-লুকিয়ে পালিয়ে বেড়ায়। কোথায় কোন্ মুল্লুকে কোন এক চা-বাগানে আছে তার মা। আর নিরঞ্জন আছে কোথায়? সেই নিরঞ্জন আর নেই, এ নিরঞ্জন নয় রঞ্জন সিং হিন্দুস্থানী ড্রাইভার। ট্রাকের ড্রাইভার হুকুমৎ সিং-এর সহকারী থেকে এখন রঞ্জন সিং নিজে ড্রাইভার হয়েছে।

মাকে খোঁজে?—কিন্তু কাছে যেতে পারে না। আউলিয়া মন্ত্র প'ড়ে সব ওলটপালট ক'রে দিতে পারে না? পুলিশের নথিপত্র আর কাকা-কাকীমার মন থেকে সব মুছে দিতে পারে না? দশ বারো বছর হয়ে গেছে। না, তারো বেশী। রঞ্জন সিং বছরের হিসাব মেলাতে পারে না।

আউলিয়াও মনে মনে হিসাব কষে—এক, দুই, তিন—।

আকাশের তারাগুলো হাসে: তার গণনা ভুল ক'রে দেয়।

রাজুদা ! শুনছো ?—

কে ডাকে ?—ঘুমিয়েছিল আউলিয়া। টিলাগড়ের সেই জঙ্গুলে জায়গায় বটগাছের তলায় ঘুমিয়েছিল। বটের ঝুরিগুলো দোল খাচ্ছে। এখানে কে ডাকে ? কে রাজুদা ?

দু'হাতে চোখটা রগড়ায়। উঠে বসে।—নাঃ। সামনে সেই নদী। তরতর করে বইছে। সূর্য পশ্চিম দিকে হেলে পড়েছে।

রাজুদা !—চমকে উঠল আউলিয়া। বড় পরিচিত নাম। আর বড় পরিচিত গলার আওয়াজটা।

কিন্তু কেউ কোথাও নেই। স্বপ্ন দেখছিল আউলিয়া। এমন সুন্দর স্বপ্ন,—ফ্রকপরা একটি মেয়ে খিলখিল ক'রে হাসছে। একটি ছেলে গাছের গুড়িতে বসে কি যেন চিবুচ্ছে। আবার দেখছে,—সেই মেয়েটি বড় হয়ে ফ্রক ছেড়ে শাড়ি ধরেছে। মুখে তার মুচকি হাসি।—আমাকে চিনতে পাবো রাজুদা ! ঐ ছেলেটাই রাজু।

রাজুর চুলটা পেছন থেকে এসে জোরে টান মেরে ছুটে পালাল মেয়েটি। আর রাজু ঢিল ছুঁড়ল,—এ কি, মেয়েটার কপাল কেটে গিয়ে দর দর করে রক্ত পড়ছে।

ছুটে এসেছেন রাজুর পিসীমা বুড়ী—কি করলি রে হতভাগা ছেলে। ওর বাবা তোকে আস্ত রাখবে না। আহা-হা মা-মরা মেয়ে। হোক্ না বাবা বড়লোক, ঘরে মা নেই। কে ওর দুঃখ বুঝবে ?

মনে মনে গজরায় রাজু,—বা রে ! আমার বুঝি দশটা মা আছে !

এ কি শুনছে আউলিয়া ? কাদের কথা ? কারা তার চোখের সামনে ধাঁধাঁর মত মিলিয়ে গেল ?—টিলাগড়ে এসেও বিরাম নেই, শান্তি নেই। এখানে লোকজন বিরক্ত করতে আসে না। কিন্তু এখানেও এসে জুটেছে। সে কি পাগল হতে বসল ! এ কি কাণ্ড ? —স্বপ্ন, স্মৃতি,—না জাতিস্মর সে ?

—ঐ যে তরতর করছে নদীটা। সূর্য কেমন হাসিমুখে নেমে

যাচ্ছে। দূর্ ছাই! আজ আর ঘুমোতে দিলে না। সাদা বাড়ি, আর সেই মেয়েটা!—এদের কথা ভুলতে পারে না আউলিয়া।

রজব না রাজীব!—লোকগুলো তো তাকেই রজব আউলিয়া বলে ডাকে? না, সে বজব নয়.—কিছুতেই নয়। সে নিজেই নিজের নাম জানে না। বজব আউলিয়া!—যত সব কুত্তির বাচ্চা। সব ঝুট্—সব ঝুট্ বাত্।

শুধু এ শহরটা কেন? অনেক শহরই দেখেছে আউলিয়া। কাশী দেখেছে,—হরিশ্চন্দ্রের ঘাট! দশাশ্বমেধ ঘাট!—বাবা বিশ্বনাথ! —ঘাট সেই ঘাটই রয়ে গেল। কিন্তু এ ঘাট যারা তৈরী করেছিল, তারা আজ কোথায়? রাজা হরিশ্চন্দ্র? কাশীটা রয়ে গেছে। কিন্তু সেই রাজারাজড়া আজ নেই। কোথা বা সেই বিশ্বামিত্র? সব পালটে গেছে, আরো পালটাবে।

ভাবতে বেশ মজা লাগছে!—প্রয়াগের মেলা। হাজার হাজার সাধু—হর হর বম্-বম্! ব্যাটারা সাধু! গঙ্গায় চান করবে! পুণ্যি হবে! কই? আমি তো কত ডুব দিয়েছি, কই পুণ্য তো কিছু পেলাম না। পুণ্যি আবার কি রে বাবা!

টাকা! টাকা! টাকা!—বাড়ি গাড়ি—এ সবই তো পুণ্যি! কালী দত্ত আব নিরঞ্জনের কাকা! তোফা আছে কালী দত্ত। লোকগুলো আড়ালে বলে কালীব পাঁঠা। তার বিধবা বৌদিটা এসে কত কেঁদে গেল। দেশ উদ্ধার করছে কালী দত্ত! শীতের সময় কম্বল বিলিয়েছে,- হাজার কম্বল। স্বয়ং জেলার কর্তা না কোন এক মন্ত্রী এসে কালী দত্তের কত সুখ্যাতি করেছেন। বিলোবে তো বিলিয়েই দে না! না, তার জন্য কত ঘটা! সামিয়ানা খাটিয়েছে। উঁচু মাচান বেঁধেছে। তার উপর দাঁড়িয়ে মন্ত্রিমশাই বক্তৃতা করলেন। তারপর কম্বল বিলি হ'ল। আর ওদিকে বিধবা বৌদি কেঁদে মরে। দাদা মরতে না মরতেই বৌদিকে ফাঁকি দিয়ে বসেছে। হায় রে কপাল। ভাইঝির বিয়ে হয় না। বৌদি আর ভাইঝি পরের

দোরে ভিক্ষা মাগে। আর নিজের মেয়েকে মেমসাহেবদের স্কুলে পাঠিয়েছে কালী দত্ত।

দত্ত-কোম্পানির মস্ত বড় কারখানা আর অফিস। শহরের কে না জানে কালী দত্তকে। চাল, চিনি, কাপড়, কেরোসিন—সবই কালী দত্তর খপ্পরে! লাইসেন্স, আর কনট্রাক্ট, যত সব বড় বড় কথা। দত্ত কোম্পানির বেয়ারাও কত সুখী। মোটা মাইনে দেয় কালী দত্ত। কিন্তু জাতিকলে একবার পড়লে আর বেরিয়ে আস্‌তে পাবে না। মজা,—বড় মজা এই দত্ত কোম্পানির আড়তখানায়!

হ্যাঁ, শুনেছিল আউলিয়া। এখনো মনে আছে সেই প্রশান্তকে। বড় আদর্শবাদী ছেলে, মাথা উঁচু করে চলত। এর জন্যই ছেলেটা বেঘোরে মারা গেল। কাউকে গ্রাহ্যই করত না। কলেজে পড়ত। পড়াশুনায় ভালই ছিল। কিন্তু অন্যায় দেখলেই রুখে দাঁড়াত।

চালের মণ পঞ্চাশ টাকা?—কেন? কেন এমন হবে? রুখে দাঁড়াল প্রশান্ত। পরীক্ষা দেওয়া হ'ল না। দোকানদাররা তার ভয়ে অস্থির। দলে দলে ছেলে এসে রুখে দাঁড়াল। সবাই প্রশান্তর সাকৃরেদ।

সেই প্রশান্ত! আলুর দোকান করল, তরিতরকারী বিক্রী করতে লাগল। এদিকে ঘরে অন্ধ মা, খঞ্জ একটি ভাই আর একটি অনূঢ়া বোন। সংসারের ঘানি টানতে হবে। মরিয়া হ'য়ে উঠল প্রশান্ত। বাবা পাঠশালে মাষ্টারী করতেন। কিছুই রেখে যান নি। বি. এ. পরীক্ষা দেবে প্রশান্ত। ঠিক পরীক্ষার আগেই বাবা মারা গেলেন। তখন বাজারে সকল জিনিসের দর তরতর ক'রে বেড়ে চলেছে। কলেজে যাবার পথেই এই কাণ্ড। পঞ্চাশ টাকায় চালের দর উঠেছে।

দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে গেল প্রশান্ত—বুঝিয়ে বললে, কেন এমন করছেন? সত্যি করে বলুন, আপনারা কি এর কমে দিতে পারেন না?

অনেক তর্ক বিতর্ক। তারপর সেই চাল তিরিশ টাকায় নামল।

প্রশান্তর তখন সংসার অচল। মায়ের হাতের দুগাছি রুলী বিক্রীর কয়েকটা টাকা বেঁচে গেল, তাই সম্বল করে আলু পটলের দোকান করল প্রশান্ত। চললও কয়েক দিন। কিন্তু লাভের যে অঙ্ক তাতে চারটি লোকের পেট ভরে না।

আবার সেই কালী দত্ত!

মাষ্টারমশাইয়ের ছেলে! আহা-হা, পরীক্ষা দিতে পারলে না! শেষকালে কি না ভদ্দর লোকের ছেলে আলু পটল বিক্রী করবে? সোনার মানুষ ছিলেন মাষ্টারমশাই!—দোকান করবে? কাজ-কারবার করবে? ভয় কি ভাই! আমি আছি।

কালী দত্তের ফাঁদ!—এমন বেয়াড়া ছেলে! কোনো কিছুই করবার উপায় নেই। যত সব ছোকরা ওর কথায় ওঠে আর বসে, ওকে হাত করতে হবে। সাহস আছে ছোকরার। দাঁড়িপাল্লা ধরে আলু বেচবে। ভাঙ্‌বে তবু মচকাবে না! এদের দিয়েই কাজ পাওয়া যায়!

কালী দত্তের কাজ কারবার দেখতে হবে। সুপারভাইজার হ'ল প্রশান্ত। কোথায় কি চালান হচ্ছে না হচ্ছে, ঠিকমত যাচ্ছে কি না সবই দেখতে হবে। দত্ত কোম্পানির সুপারভাইজার!

কিন্তু এ কি কাজের ভার নিয়েছে প্রশান্ত? বস্তা বস্তা সাদা পাথর ফ্লাওয়ার মিলের গুদামে ঢোকানো হচ্ছে কেন? নারকেল তেলের কলঘরে হোয়াইট্‌ অয়েলের টিন কেন?—কে উত্তর দেবে?—তাই তো তোমাকে রাখা ভাই! আমি কত দেখবো বলো। যত সব কর্মচারী বসে বসে আমারই বুকে পুকুর কাটছে। ছিঃ, ছিঃ!—দত্ত কোম্পানির কোকোনাট অয়েল! ভেজাল! এ কথা শুনলে যে আমার হৃদ্‌কম্প হয়। আমার সুনাম একদিনে নস্তাৎ হয়ে যাবে। ছিঃ, ছিঃ! বুঝলে প্রশান্ত! আমার হার্টটা বড্ড দুর্বল ভাই! সত্যি তুমি নিজের চোখে দেখেছো না কি? হোয়াইট অয়েল? আর

ফ্লাওয়ার মিলে সাদা পাথরের বস্তা!—বুকে হাত চেপে কাঁপতে থাকেন কালী দত্ত।

চুপ! চুপ! চুপ!—একথা বাইরে যেন কেউ ঘুণাক্ষরেও জানতে না পায়। দত্ত কোম্পানির সুনাম নষ্ট হবে;—আমার কি ভাই! আমি আজ আছি, কাল নেই। এতোগুলো লোকের অন্ন নষ্ট হবে। এদের কাচ্চা বাচ্চা আছে।—আচ্ছা প্রশান্ত! তোমার বাড়িতে কে কে আছে?—ধরো তোমার মা, ভাই আর বোন!—তিনজন। আমার সমস্ত কোম্পানিতে কাজ করে কত লোক? এই ফ্লাওয়ার মিলে গোটা দেড়শো, কোকোনাট অয়েল মিলে সব বিভাগ নিয়ে গোটা তিনশো, রাইস কনসার্নে সাড়ে সাতশো, চিনির কনসার্নে সাড়ে তিনশো,—আর আর অপিস স্টাফ আরো দেড়শো ধরো,—তাহলে প্রায় ত্ব'হাজার হ'ল। তাদের প্রত্যেকের পোষ্য গোটা তিনেক করে ধরলেও ছ' হাজার! না, না, আমি ভাবতেও পারি নে! ছ'হাজার লোক আমার জন্যই না খেতে পেয়ে মরবে! এ কি কথা? প্রশান্ত! এই জন্যই তোমাকে রাখা।

কি বলবে প্রশান্ত? ফাঁদেই পড়েছিল। হোয়াইট অয়েল আর সাদা পাথরের বাইরেও অনেক রহস্য দেখতে পেল প্রশান্ত। কালী দত্তের সামনে পড়লেই কেমন যেন সব গুলিয়ে যেতে লাগল। না, না, দত্ত সাহেবের তো দোষ নেই। তিনি এর কোনো খবরই রাখেন না! এত সব কর্মচারী, এত সব লোকজন,—এরাই ফাঁকি দিচ্ছে! গোবর্ধন সরকার বললেন,—ওদিকে নজর দেবেন না প্রশান্তবাবু! কর্তাসাহেব কি করবেন? এ যে পাকচক্র!—হেঃ—হেঃ—হেঃ!—গোবর্ধনের হাসিতে কেমন যেন ব্যঙ্গ ঝরে।

কালী দত্ত বলেন,—"তোমার উপর সব ছেড়ে দিলুম ভাই! আমি আর পারি নে। কত দিকে দেখবো,—কোনটা সামাল দেবো?" 'প্রশান্ত কি করতে পারে? ম্যানেজার সোনালী কর্মকার বললেন, কাজ কি ভাই, ওসব ঘাটাঘাটি করে? এতে

কোম্পানির বদনামই হবে। একবার বাইরে একথা বেরিয়ে পড়লে মুখার্জি ব্রাদার্স হৈ হৈ করে বাজারে তা ছড়িয়ে দেবে। তারা তো এই চায়! দিল্লীর সেই নতুন কনট্রাক্টটা তা হলে বাতিল হয়ে যাবে। বরং ভেতরে ভেতরে সব ঠিক করে নিলেই হবে। আর এক কথা, তুমি এসব বুঝবে না! এত কম দরে টেণ্ডার দিতে গেলে ওরকম না করলে পোষাবেই বা কেন? কর্তাসাহেব অত শত বোঝেন না। তিনি তো হুকুম দিয়েই খালাস—“সব চাইতে কম দর দাও। এ কনট্রাক্ট পেতেই হবে।” বাজার দরের উনি জানেনই বা কি? হন্দর ত্ব'হাজার টাকা যাচ্ছে। আমাদের দর দিলেন দেড় হাজার!—বাকা হাসি ম্যানেজারের মুখে,—“বুঝলে ভায়া, তাই তো, সাদা পাথর আর হোয়াইট অয়েল আমদানী করতে হয়।”

প্রশান্ত সোনালী কর্মকারের সকল কথাই বুঝতে পারে। কিন্তু উপায় নেই। তার আদর্শ আজ দত্ত কোম্পানিব চাকায় ঘুরপাক খাচ্ছে। পুরোনো ভাঙা বাড়ি। ছাদ মাঝে মাঝে ফাঁক হয়ে গেছে। একটু বৃষ্টি হলেই উপায় নেই।—এখন তা ঘুচেছে। দত্ত কোম্পানির কোয়ার্টারে ঠাঁই পেয়েছে তারা। অন্ধ মায়ের ত্বঃখ ঘুচেছে। খঞ্জ ভাইটা আর দাওয়ায় পা ঝুলিয়ে বসে থাকে না। তার জন্য ঈজি-চেয়ারের ব্যবস্থা হয়েছে। আর ছোট বোনটারও চেহারা ফিরে গেছে। কেমন ফুরফুর ক'রে ঘুরে বেড়ায়। সাত আট বছর বয়েস হবে। স্কুলে পড়ে শিবানী।

সোনালী কর্মকার বলে, বুঝলে প্রশান্তবাবু! এই দত্ত কোম্পানির সঙ্গে আমাদের অদৃষ্টের চাকা বাঁধা পড়ে গেছে; এ ছাড়াবার উপায় নেই। লোকে বলে কালী দত্তের ঘরে থরে থরে সোনার ইট সাজানো আছে! তা মিথ্যে বলে না। সোনার ইট না হোক, অঢেল সোনা আছে। ব্যাঙ্কে তো সব টাকা রাখা চলে না! ইনকাম ট্যাক্সে ধরবে যে! আমাদের ওই একচোখ-কানা অ্যাকাউণ্টেণ্ট হরবিলাসবাবু ধুরন্ধর লোক! সে কর্তা সাহেবেরও

এককাঠি উপরে যায়। এত বড় কোম্পানির অ্যাকাউন্টেন্ট! কিন্তু বলুন দেখি তাকে দেখলে কি মনে হয়?—নেহাৎ পাঠশালার পণ্ডিত গোছের ভাল মানুষটি! চশমার ডাঁটিটা ভেঙে গেছে। সুতো জড়িয়ে বেঁধে রেখেছে।—প্রশান্ত সবই জেনেছে, সবই বুঝেছে। কিন্তু উপায় নেই।—দীনু ড্রাইভার বোর্ডারে মাল পাচার করতে গিয়ে ধরা পড়ল! কি সাহস ব্যাটার? দত্ত কোম্পানির গোপন কথা ফাঁস করে দিয়েছে? জাঁদরেল অফিসার শঙ্কর রায় দত্ত কোম্পানিকে বাগে পেয়েছে!—লাখ টাকা হাঁকেন কালী দত্ত!—দীনু ড্রাইভারকে মুক্ত করতে হবে!

আউলিয়া হাসে,—সবই তো বলে গেছে প্রশান্ত! সেই দীনু ড্রাইভারের কেসটা। কালী দত্ত বলেন, কোম্পানির ইজ্জত গেল। এখন দীনু ড্রাইভারের জেল হলে বাকী কিছুই থাকবে না। ইজ্জত বড় প্রশান্ত! ইজ্জতটাই বড়!—উকিল, ব্যারিষ্টারে টাকা খরচ হল। গোপন পথে কত জনের যে পকেটে টাকা চলে গেল,—সোনালী কর্মকারই তা জানে।—ঘুষ—ঘুষ!—ঘুষে কি না হয়। দীনু ড্রাইভার খালাস পেল।

কিন্তু,—বলতে বলতে প্রশান্ত শিউরে উঠেছিল। দত্ত কোম্পানির মস্ত বড় গুদাম। তার পেছনে একটা অন্ধকার ঘর। চীৎকার করলেও কাক চিল পর্যন্ত শুনতে পাবে না। কি জানি কি একটা কাজে প্রশান্ত সেদিকে গিয়েছিল,—কান্না! কান্না যেন বুক ফেটে বের হচ্ছে! ঠিক কান্না নয়, গোঙানোর আওয়াজ। দরজায় তালা দেওয়া। প্রশান্ত অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকল। কাউকে দেখতে পেলে না। তারপর উপরের দিকে একটা ছোট খুপরির মত জানলা দেখতে পেল। সেই জানলা দিয়ে উঁকি মেরে দেখে তার তো চক্ষু স্থির। উপুড় হয়ে পড়ে রয়েছে দীনু ড্রাইভার!—তারপর হুলস্থুল কাণ্ড! কালী দত্ত বললেন,—আহা-হা, দীনুটা পাগল হয়ে গেছে। ওকে সামলানো দায়। তাই, বন্ধ ক'রে রাখা হয়েছে।—প্রশান্ত শুনল

না। তার মনে তখন তোলপাড় চলছে।—কালী দত্তের ফাঁদ! সেই ফাঁদ থেকে যেদিন প্রশান্ত বেরিয়ে এল,—সত্যি প্রশান্ত পাগল হয়ে গেছে। বড় বড় ডাক্তার দেখিয়েছেন কালী দত্ত! তার মা-ভাইকে একটা পেন্‌সনও দিয়েছেন। কিন্তু প্রশান্ত কেন পাগল হ'ল, তা কেউ জানল না। আহা-হা দরদী কালী দত্ত,—দত্ত কোম্পানির হর্তা-কর্তা! পাগল প্রশান্ত কোথা গেল, কেউ জানে না। আব আউলিয়াকে বিবক্ত কবতে আসে না। দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে আউলিয়া!

বাতাসেব বুকে ওবকম হাজাব মানুষেব কান্না ঘুবে বেড়াচ্ছে।

তার নিজেব কথা কাউকে বলতে পাবে না। সকলের কথাই তাকে শুনতে হয়' কি জ্বালা!—মা, ভাই,—বোন' সংসাব? তার যে কোনো বালাই নেই। মনের কথা বলবাব মতো তাব কেউ নেই। ওদেব কথা তাকে কিন্তু শুনতে হয়। ঝুড়ি ঝুড়ি কথা। ঝুড়ি ঝুড়ি দুঃখের কাহিনী। সকলেই আউলিয়াব কাছে তাদের বোঝা ঝেড়ে ফেলতে চায়। কি করবে আউলিয়া? সে যে ফকির,—দরবেশ,—আউলিয়া! - তার দয়ায় না কি ওদেব সব জ্বালা জুড়িয়ে যাবে!

—হায়বে ভগবান!—খোদা—ঈশ্বব!—সত্যি কি তুমি আছো? না সবই বুজরুকি? সবই মায়া? না, না, তুমি নেই!

অবিচার, অন্যায়! হাসি আর কান্না! সবই চলছে। ওরা বিচার চায়। তুমি বিচার করবে। ওদের আর্জি কি তোমার কাছে পৌঁছয় না? আমি তো দেখছি—নীচে পৃথিবী, উপরে অপার সমুদ্র—নীলের সাগর, তার ওপারে কি আছে কে জানে? আমাকেই আমি ভুলে গেছি,—আমি তোমাকে কি করে জানব?

আউলিয়া হঠাৎ চমকে ওঠে।

ও কি ? তার পায়ের উপর উপুড় হয়ে পড়েছে একটি লোক ! হাড়গোড় বেরিয়ে গেছে ; ময়লা কাপড়, গায়ের ছেঁড়া জামাটার ফাঁকে ফাঁকে হাড়-পাঁজর দেখা যাচ্ছে।

—কে ?

হাউমাউ করে উঠল সেই লোকটি—বাঁচাও বাবা !

ভেংচি কাটে আউলিয়া—বাঁচাও বাবা ! কেন এখানে মরতে এসেছিস্ ? পা-টা টেনে ছাড়িয়ে নেয় আউলিয়া।

—হ্যাঁ, মরতেই এসেছি। মরব, তোমার পায়ে মাথা খুঁড়ে মরব। রোগে ধরেছে বাবা ! কাল রোগে ধরেছে।

—ডাক্তার বদ্যি নেই ? আমার কাছে এসেছিস্ ? আমি তোর রোগ ভাল করব ?

—সবই আছে বাবা ! সবই আছে। আমারও সবই ছিল, আর সবই আছে। তবু আমার কেউ নেই। তুমি সাধু আউলিয়া। তোমার দয়ায় লোকের ব্যারাম সারে, গরীব ধনী হয়। না, না, যত সব পাজী জোচ্চোর বড় লোক হয়। কালী দত্ত, ফটিকলাল বাড়ি গাড়ি হাঁকায়। আব আমার মত লোকের রোগ সারাতে পারবে না ?

—কি বললি ?

—হ্যাঁ সত্যি বলছি। ভগবানও দীন দুঃখীকে দেখেন না। যারা বড়লোক তাদের জন্যই ভগবান।

হাঁপিয়ে উঠে লোকটি—আমি আর বাঁচব না বাবা ! আজ মরিয়া হয়ে এই ভুতুড়ে জঙ্গলে তোমার খোঁজে এসেছি। তুমি সবই পারো বাবা ! আমি বাঁচতে চাইনে। শুধু একবার আমার টুলটুলকে শেষবারের মতো দেখতে চাই।

টুলটুল !

—হ্যাঁ। বাবা ! আমার মেয়ে। তাদের দোষ নেই। আমারই দোষ।

—কোথায় তোর মেয়ে ?

কপালে ঠাস ঠাস করে চাপড় মারতে মারতে লোকটি বলতে থাকে—তা জানলে তোমার কাছে আসব কেন বাবা? তিন বছর হয়ে গেছে, সেই যে একদিন রাত্রে ফিরে গিয়ে ঘর শূন্য দেখলাম, টুলটুলও নেই আর তার মা-ও নেই।—ঝর ঝর করে লোকটার চোখের জল পড়তে লাগল।

—খোঁজ-খবর কর।

—কোথা খুঁজে পাবো? খোঁজার কি আর বাকী রেখেছি। কালী দত্ত আর সোনালী কর্মকারের খপ্পর থেকে খুঁজে বের করার সাধ্যি এখানে কার আছে বাবা!

কি বললি?

—তুমি তো সবই জানতে পারো বাবা! একবার চোখ বুঁজলেই সব দেখতে পাও। একটিবার—একটিবার দয়া করো বাবা। তা না হলে তোমার পায়ে মাথা খুঁড়ে মরব।

—মাথা খুঁড়ে মরবি! আমার পায়ে মাথা খুঁড়ে মরবি?

—একটিবার আমার টুলটুলকে দেখাও বাবা।

হাঁপাতে লাগল লোকটা। আউলিয়া কিছুক্ষণ চুপ করে থাকে।

তারপর বলে,—ভুল ব্যাটা, সবই ভুল! এখানে মরতে এসেছিস্। আমি কোথা তোর টুলটুলকে পাবো?

—তুমি একথা বললে বাবা? তবে আর কার কাছে যাবো? বড় কষ্ট পেয়েছে তারা। পেট ভরে খেতে দিতে পারি নি। সোনালী কত লোভ দেখিয়েছে,—চাকুরি দেবে, তবু রাজি হইনি। কিসে যে কি হয়ে গেল! এই পুলিশ, এই থানা—এত জজ ম্যাজিষ্ট্রেট! আইন কানুন—সবই ভুয়া! বাবা! সবই ভুয়া!

—না, না, না!—হঠাৎ চীৎকার করে ওঠে আউলিয়া।—সবই ভুয়া।

লোকটি কাঁপতে থাকে। আউলিয়া যেন ক্ষেপে উঠেছে। দমাদম মাটিতে লাথি মারছে আউলিয়া। তারপর ছুটতে থাকে

জঙ্গলের পথে।

শুধু শোনা যায়,

—সব ঝুটা! সব ঝুটা!

আবার সেই বাড়িটা।

বাড়িটার কি যেন এক মোহিনী শক্তি রয়েছে! সেই বুড়ো রায়বাহাদুর কৈলাস দত্ত বসে আছে। কত লোক আসছে। কত ব্যস্তসমস্ত তারা। মাপজোখ করা হাসি মুখ। মোটা ধবধবে ধুতি, গায়ে মোটা জামা। খদ্দরের চাদর। গায়ের চামড়াও কেমন ফ্যাকাসে মেরে গেছে। কি চায় এরা?

এরা সবই চায়। ঐ সাদা শুদ্ধ পোশাকের আড়ালে লোভের শয়তান লুকিয়ে রয়েছে ওদের মাঝে।

জিন্দাবাজারের যামিনী মহাজন বলেছে,—কলকাঠি ঘোরায় এই রায়বাহাত্বরের মেয়ে। রাজরাণীর মত ভারিক্কি চাল। তাকে দেখলে লোকগুলো যেন কৃতার্থ হয়ে যায়।

নামটা ভুলে যায় আউলিয়া। ওরা রসিকতা ক'রে নবপল্লীর নাম দিয়েছে সুরুচি-কলোনী! রায়বাহাত্বরেরও ইতিহাস আছে! আর তার মেয়ে?—চিরটা কাল কি এরকমই ছিল? তাকে দেখলেই কেমন যেন সব গুলিয়ে যায়। এক, ত্বই, তিন,—চার,—সে কত বছর হয়ে গেল। স্বপ্ন রাজ্যে চলে যায় আউলিয়া—

কে যে ডাকছে—রাজুদা!—বাতাসে স্বরটা ভেসে আসছে। খিলখিল করে কে হাসছে? হাসি, কেবল হাসি,—ওই হাসি রাজু বড় ভালবাসত। আনমনা হয়ে ওঠে আউলিয়া।

একটি মেয়ে যেন বলছে, রাজুদা! জানো পৃথিবীটা মানুষের মতই কাঁদে আবার হাসেও।—রাজু তার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে। তার মুখে কথা নেই। শুধু আকাশ দেখে।

মেয়েটি বলে,—আকাশে কি আছে জানো? লক্ষ লক্ষ প্রহরী। আমাদের দেখছে।—কে ঐ রাজু আর কে ঐ মেয়েটা? দুজনে বসেছে একটা পুকুরের ঘাটে পাশাপাশি। কাজলপুকুর! ছেলেটি বলে,—দূর বোকা! ওদের কি চোখ আছে? ওরা আমাদের এই পৃথিবীর মতই মাটি আর পাথরে গড়া। ছাই জানো তুমি?—গুম্ ক'রে মেয়েটি ছেলেটির পিঠে কিল বসিয়ে দেয়!—ওই যে দুজনে ছুটছে। ধরতে পারলে না,—ধরতে পারলে না। ঐ আম-বাগানের ভেতর দিয়ে কোথায় পালিয়ে গেল মেয়েটি।—আবার, আবার এসেছে,—"আমি চললাম রাজুদা! শহরের স্কুলে বাবা পাঠিয়ে দিচ্ছে।"

কেন? এখানে কি স্কুল নেই?

—না, না,—এখানে যে তুমি রয়েছো?—খিলখিল করে হেসেছিল মেয়েটি।

—আমি?

—হ্যাঁগো মশাই! তুমিই যত নষ্টের গোড়া।

—তাহলে যাওয়াটা ঠিকই করে ফেলোছো?

—হ্যাঁ, শহরের স্কুলে পড়ব।

—ভালই হ'ল। কিন্তু ফিরে এসে আমাদের চিনতে পারবে কি? মেমসাহেব বনে যাবে!—হাসল ছেলেটি।

—তাই যদি হয়, তাতে দোষ কি? চিরটা কাল কি এই পাড়াগাঁয়ে পড়ে থাকব আর ঘরের বউ হয়ে নাকানি-চুবানি খাবো?—হিঃ হিঃ করে হাসে মেয়েটি।

—তা যা-ই হও না কেন, একদিন তো ঘরের বউই হতে হবে!—ছেলেটি উত্তর দেয়।

—না, মশাই! আমি বিয়েই করব না।

মেয়েটি আবার ছুটে পালাল। বার বার ফিরে তাকাচ্ছে। মুখে তার দুষ্টুমির হাসি।

এ কি সেই পুকুর। কে ডুবে যাচ্ছে? তলিয়ে যাচ্ছে কে। জলের উপর হাতটা আকুলি-বিকুলি করছে—ছুটে গিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল সেই ছেলেটি।

জলের উপরে বুদ্‌বুদ! জলটা তোলপাড় পাক খাচ্ছে। গেল, গেল,—দুজনেই বুঝি গেল। না, না—ঐ যে মাথা তুলেছে। মেয়েটির মাথাও দেখা যাচ্ছে।

—যাঃ, বেঁচে গেল।

ঐ যে আঁটসাট দেহের বাঁধন। কে এই পুরুষটি? মুখের দিকে তাকালে ভয় হয়। বড় কড়া মেজাজের লোক। মেয়েটির বাবা! ছেলেটা তো তাকে দেখে পালাতে পারলে বাঁচে।

আবার, সেই মেয়েটি। রেলগাড়িতে চেপে শহরে যাচ্ছে। দূরে দাঁড়িয়ে দেখছে ছেলেটি। কাছে যেতে সাহস নেই। সঙ্গে সেই বাবা। ছলছল চোখেও হাসির ঝিলিক। যেন কত কথা—ভুলে যেয়ো না,—ভুলে যেয়ো না।

যাবার আগে অবশ্য মেয়েটি এসেছিল। বলেছিল,—"আমাকে ভুলে যেয়ো না রাজুদা! পড়াশুনায় মন দিও।"—ছ্যাঃ, পড়াশুনায় মন দেবে কি? আর পড়াশুনা করতে ভালই লাগত না। ছেলেটি বেপরোয়া হ'য়ে উঠল। তারপর সব লণ্ডভণ্ড হয়ে গেল। চারদিকে হৈ-চৈ! দেশের লোক যেন ক্ষেপে উঠল,—কি ভয়ানক সে শব্দ। একটি মাত্র কথা—

বন্দে মাতরম্!

শহরের পথে ছেলেটি,—আরো অনেক ছেলে! কি দাপট! তাদের চোখে মুখে যেন উল্লাস ফুটে উঠেছে। যাদুমন্ত্রে যাদুর কাঠির পরশ পেয়ে গেছে সমস্ত দেশ।

আবার সেই মেয়েটি!—

আউলিয়ার সম্বিৎ ফিরে আসে হঠাৎ। ভোঁস্ ভোঁস্ ক'রে মোটর হাঁকিয়ে কে চলে গেল! দূরে হট্টগোল!—ভোট ফর্, ভোট ফর্—সাধন দত্ত।

কি বুক-ফাটা উল্লাস! ভোট-যুদ্ধ!—ইলেক্‌শন্! সাধন দত্ত আর সোনালী কর্মকারের লড়াই। কত ফিরিস্তি! দেয়ালে, দেয়ালে কাগজ মেরেছে। মোটা মোটা হবফে লেখা—সাধন দত্ত:কে ভোট দিন্। দরদী মানুষ,—জনসেবক সাধন দত্ত! আর সোনালী কর্মকার দীনমজুরের বন্ধু, জনমনেব আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রদীপ! হাসে আউলিয়া! ছেলেগুলো বেশ মজা পেয়ে গেছে। রাতদিন হল্লা! মাঠে মাঠে গলাবাজি চলছে,—বক্তৃতা।

আরেকটি মেয়ে!—তাব কথা মনে পড়ে যায়! ভোটরঙ্গ তলিয়ে যায় অতলে। মেয়েটি কেঁদেছিল,—

জানো বাবা! আমাব যে আর কোনো উপায় নেই। চিরটা কাল কি আমি এমনই ছিলাম? না, ভদ্রঘবেব মেয়ে। বাবার বোজগার মন্দ ছিল না। কিন্তু মা হঠাৎ চোখ বুঁজলেন। দাদার লেখাপড়া বেশীদূর এগোয় নি। কোন এক মারোয়াড়ীর সঙ্গে না কি ব্যবসায় নেমেছে। বাড়িতে বড় একটা থাকত না। বাবাকে রোগে ধবল। ভদ্র ঘরের বয়স্থা মেয়ে। বাধ্য হয়ে রাস্তায় বেব হতে হ'ত। ডাক্তার ডাকা, ওষুধ-পত্র আনা, এমন কি দোকান বাজারও করতে হ'ত।

এই কষ্টের মধ্যেও স্বপ্ন ছিল, কৈশোর-যৌবনের মিলনের স্বপ্ন। তুমি নিশ্চয়ই বুঝতে পারবে বাবা! পাড়ার ভদ্রসন্তানদের ইয়ার্কি আর অভদ্র ইঙ্গিতে উত্ত্যক্ত হ'লেও মনে মনে সেই স্বপ্নের মানুষকেই খুঁজতাম। ভুল করলাম কি ঠিকই করলাম,—তা ভেবেও দেখিনি। ওষুধ নিয়ে আসছি, সন্ধ্যে হয়ে গেছে। গলির পথ। হঠাৎ ধাক্কা খেয়ে পড়ে গেলাম। সাইকেলের ধাক্কা। সাইকেলটাও পড়ে গেল। সাইকেলের আরোহী পড়ে গিয়েও সামলে গেল। আমাকে

তুলে ধরল,—"বড্ড অন্যায় হয়ে গেছে।" তার কথা শুনে রাগে গা-টা রিঃ রিঃ ক'রে উঠেছিল! কি অভদ্র!—কিন্তু মুখের দিকে তাকিয়ে কেমন যেন বোবা হয়ে গেলাম। কেমন যেন লজ্জা আর সংকোচ দেখা দিল। কি সুন্দর মুখ!—নিশ্চয়ই সে ইচ্ছা ক'রে ধাক্কা মারে নি;

আউলিয়া চুপ ক'রে তার কথা শুনছিল,—

তারপর সে আমাকে বাড়ি নিয়ে এল। বাবা তাকে আগে থেকেই চিনতেন, বাবার বন্ধু অমলবাবুর ছেলে কমলেশ।—তুই চিনবি কি করে মা? ওরা তো এখানে থাকে না। মামার বাড়িতে এসেছে বুঝি! তাই না বাবা?—কমলেশ মাথা নাড়ে। জানা গেল,—কমলেশ এবার বি. এ. পরীক্ষা দিয়েছে। আর শ্যামলী,—হ্যাঁ মেয়েটির নাম শ্যামলীই বলেছিল। শ্যামলী আর কমলেশের মধ্যে যেন কত কালের নিগূঢ় সম্পর্ক ছিল,—তারা যেন শাপভ্রষ্ট হয়ে এতদিন নিজেদের ভুলে ছিল। আজ দৈবাৎ এমন মিলন ঘটল। কমলেশ রোজই আনাগোনা করত। কিন্তু একদিন যখন তারা অনেক দূর এগিয়ে গেছে, বাবার মুখেও হাসি ফুটে উঠেছে, তখন শ্যামলী জানতে পারল কমলেশ ব্রাহ্মণ আর তারা তো কায়স্থ।

তাতেও বাধা নেই।—কমলেশ বললে,—আমি বাবা-মায়ের মত ক'রে শীগগির ফিরে আসব। আমার বাবা-মা ওসব মানেন না।—তারপর কমলেশ চলে গেল। এদিকে শ্যামলীর দাদা ঘন ঘন বাড়ি আসতে লাগল। বাপ আর ছেলেতে গোপন পরামর্শ চলল। এই ছেলেকে নাকি বাবা ত্যাজ্যপুত্র করতে চেয়েছিলেন। সেই ছেলের সঙ্গে এত কি পরামর্শ! জানা গেল—শ্যামলীকে দেখতে আসছে। ভাল পাত্র জুটেছে। হ্যাঁ, জুটল বটে। কাঠের ব্যবসা আছে। কিন্তু শ্যামলীর সেই স্বপ্ন! এ যে মাথায় টাক, ভারিক্কি চেহারা। দ্বিতীয় পক্ষ করতে যাচ্ছেন। অগাধ টাকা,—বিরাট বাড়ি। গাড়িও আছে। বাবা কৃতার্থ হয়ে গেলেন। গোপনে চিঠি লিখল কমলেশকে।

অবশ্য কমলেশ এল। কিন্তু দেরী হয়ে গেল ; বড্ড দেরী। বিয়ের পরদিন,—বর কনে মোটরে উঠে বসেছে।

শ্যামলী হাঁপিয়ে ওঠে। সবই আছে, অথচ কিছুই নেই। কাঠের ব্যবসায়ীর বাড়িগাড়ি আব কাঠের গুদামের মধ্যে শ্যামলী তার যৌবন-নিকুঞ্জের পাখির গান শুনতে পায় না। তাব মাঝে তখন উত্তাল তরঙ্গ! এমন সময় একদিন গোপনে কমলেশ এসে বললে,—চল শ্যামলী! পালিয়ে চল।

শ্যামলী কমলেশেব সঙ্গে পালাল, কিন্তু কোথায়? দুদিনের স্বপ্ন কেটে গেল। কমলেশ তার বাবা-মায়ের কাছে শ্যামলীকে নিয়ে যায় নি। একটা পুরনো বাড়িব দুখানা ঘব ভাড়া নিয়েছে। একদিন কমলেশ বললে,—বড্ড ভুল হয়ে গেছে শ্যামলী! আগে অতশত বুঝি নি। তোমাব সেই কাঠেব ব্যবসাদাব পুলিসে খবব দিয়েছে। তুমি যে তার বিয়ে-কবা বউ! তোমাব কোনো ভয় নেই, শ্যামলী! আমরা দূরে কোথাও পালিয়ে যাবো।

হ্যাঁ, হাওড়া স্টেশনে এক জায়গায় তাকে দাঁড় করিয়ে রেখে কমলেশ কোথায় উধাও হয়ে গেল। শ্যামলী আজো তার হদিস পায় নি। লোকে লোকারণ্য—কত বড় ইস্টিশন, আর কত রকমের লোক!. ভয়ে শ্যামলী কাঠ হয়ে গিয়েছিল। ঘণ্টার পর ঘণ্টা কেটে গেল। তারপর সন্ধ্যা হল। এক বিধবা থানকাপড়-পরা, কপালে তুলসীচন্দনের তিলক। হাতে মালার থলে। জপ করতে করতে শ্যামলীর পাশে এসে দাঁড়ালেন। সব শুনে বললেন—ভয় কি বাছা আমার সঙ্গে চল। আহা রে। মুখখানা কালি হয়ে গেছে। আমি তীর্থে যাচ্ছি। তোমার কোনো ভয় নেই।

সেই বিধবাটিকে বিশ্বাস ক'রে শ্যামলী আশ্রয় পেল বটে, কিন্তু এ যে ভীষণ ফাঁদ! তারই মত অনেকে এ ফাঁদে পড়েছে। শ্যামলী দেহ-পসারিনীদেরই একজন হল। এখনো তার গা শিউরে ওঠে। দেহের পসরা! সন্ধ্যা হ'লেই শরীরে কাঁটা দিয়ে উঠত। জ্বালা ধরত শরীরে।

মনটা বিষিয়ে উঠত। সে কি জ্বালা! সেই বিধবা—মাসীমা। তারই মত অনেক মেয়েরই মাসীমা। প্রথম প্রথম মায়ার জাল বুনত। তারপর বোঝাত, ভয় দেখাত। আর তো কোনো পথ নেই বাছা! বেটা ছেলের খপ্পরে পড়েছিলে। ওদের বিশ্বাস করতে আছে? কি আর করবে বল? এখন তো বাঁচতে হবে।

সত্যি আর কোনো উপায় নেই। কমলেশ তার স্বপ্ন ভেঙে দিয়েছে। তবু কমলেশকে ভুলতে পারে নি শ্যামলী। নিশ্চয়ই কমলেশের কোনো বিপদ হয়েছে! কিন্তু পসরা সাজাতে হ'ল। পালিয়ে যাবার উপায় নেই। যমদূতের মতো মাসীর দারোয়ান ভুনীচাঁদ, ভাটার মত গোল গোল চোখ,—নেশায় রাঙা। খাড়া খাড়া চুল। কি কুৎসিত দেখতে লোকটা।

শ্যামলীর পসরা লুটে নিতে নিত্য নতুন খদ্দের আসে। মাসীর ভাষায় তারা সকলেই বাবু। কেউ লাজুক, কেউ বা অতিমাত্রায় চট্পটে। কারো মুখে বিশ্রী বুলি। কেউ মাতাল,—কেউ বা গেঁজেল। জাতের বিচার নেই। কারো কারো কথাবার্তাও শ্যামলী বুঝতে পারে না—কারো দেশ মাড়বার, কারো বা মাদ্রাজ। কেউ কেউ হিন্দুস্থানী। বাবু,—তারা সকলেই বাবু!

শ্যামলীর ভয় লজ্জা ও সংকোচ ধীরে ধীরে যেন নিজেরাই ভয় পেয়ে চলে গেল। মাসীর কাছে শ্যামলীর কত খাতির। কিন্তু একদিন সবই নস্যাৎ হয়ে গেল।

কাল বসন্ত রোগে ধরল শ্যামলীকে। দু'একদিন মাসী দেখল। তার পর তার ঘরে বড় কেউ উঁকিও মারত না। জলের বাটি আর সাবুর বাটি কাছে ঠেলে দিয়ে মাসী পালিয়ে যেতো। রোগের যন্ত্রণায় শ্যামলী চীৎকার করে ওঠে—মাসী! মাসী! মাসী! কিন্তু কেউ সাড়া দেয় না।

একদিন চোখ চেয়ে দেখে ভুনীচাঁদ তার মাথার কাছে বসে আছে। আবার চোখ বুঁজলে শ্যামলী—আঃ, সেই বীভৎস কুৎসিত

লোকটা! হায় কমলেশ!

কিন্তু সেই ত্নীচাঁদই তাকে বাঁচিয়ে তুললে। সে কি সেবা! শ্যামলীর গায়ের ছাল-চামড়া উঠে গিয়েছিল। পুনর্জন্ম হয়েছে তার। ত্নীচাঁদ ওষুধ দিয়েছে, পথ্য দিয়েছে। ছোট মেয়ের মত শ্যামলীকে ধমক দিয়েছে। চুপ্ কর বেটি! ভাল হয়ে যাবি।

ঐ কুৎসিত মানুষটার অন্তরের মাঝে এক মমতাময় সুন্দর মূর্তি দেখেছে শ্যামলী। তার বাবার কথা মনে পড়ে যায়। শ্যামলী ডাকে বাবা।

রূপ হারাল শ্যামলী। চোখেও ভাল দেখতে পেতো না। এমন সময় ত্নীচাঁদকেও ঐ রোগে ধরল। বাড়ির সকলেই আগে পালিয়েছে। সামনের পানওয়ালাটা এসে মাঝে মাঝে দেখে যেতো। আব দরকারী জিনিসপত্র এনে দিত। ত্নীচাঁদও পনেরো দিনের দিন চিরদিনের মত চোখ বুঁজল।

তারপর শ্যামলী পথে এসে দাঁড়াল। এবার রূপের পসরা নিয়ে নয়। ভিক্ষা করতে বের হল শ্যামলী। ত্ব'একপয়সা কেউ কেউ দয়া ক'রে দেয়। কিন্তু শ্যামলী খোঁজে কমলেশকে। এত লোক যাচ্ছে, এত সুন্দর সুন্দর জোয়ান ছেলে। এর মাঝে তো কমলেশ নেই। ভুল ক'রেও কি কমলেশ কোনোদিন এ পথে আসবে না! নিশ্চয়ই তার কোনো বিপদ্ হয়েছে!

হায় রে! কমলেশকে শুধু একটিবার দেখতে চায় শ্যামলী। কেঁদেছে,—কত কেঁদেছে। কমলেশের মোহ তার কাটে নি। কমলেশ তার ত্নঃখ ঘোচাবে! ভালবাসা!—কি আশ্চর্য! দেহ আব মন ত্নই নিয়ে খেলা।

ভগবানকে ডাকে শ্যামলী। ভগবানকে ডাকতেই বলে দিয়েছে আউলিয়া। কিন্তু কোথা ভগবান? কোথা সেই ঈশ্বর? সত্যি কি কেউ আছে? এই যে এত বড় পৃথিবী—আকাশে সূর্য তারা রয়েছে! শূন্য মণ্ডল নীলে নীল,—মহানীল। গাছপালা,—জীবজন্তু,—মানুষ!

জন্ম আর মৃত্যু,—সবই তো রহস্যময় আমি আছি। তুমি আছ—আবার নেই! হাঃ—হাঃ—হাঃ।

পাগলের হাসি!—দূরে দুটি ছেলেমেয়ে খেলা করছিল, তারা সে হাসি শুনে ছুটে পালাল। আউলিয়ার চোখ সে দিকে যায়—ওঃ পালাচ্ছে, পালাচ্ছে! কমলেশ আর শ্যামলী,—হাঃ—হাঃ— হাঃ!

ভালবাসে? আচ্ছা ঐ সাদা বাড়ির ঐ মহিলাটি রায়বাহাদুরের মেয়ে! সে কি কোনোদিন কাউকে ভালবেসেছিল? নিশ্চয়ই কোনো কাঠের ব্যাপারীর সঙ্গে তার বিয়ে হয় নি? তার কি কোনো কমলেশ জোটে নি? কোনো কমলেশ কি তার কমল কলির কোরক ফুটিয়ে তোলে নি?

ভোলা কি যায়!—ফুলের কুঁড়ি ফুট্‌ছে। এক একটি ক'রে পাপড়ি মেলছে, কি সুন্দর! ঘুমিয়েছিল, ঘুমন্ত রাজকন্যা চোখ চেয়ে আছে অবাক চোখে! কমলেশের পরশকাঠি যে রাজকন্যার ঘুম ভাঙিয়ে দিয়েছে। অহল্যার স্বপ্ন ভেঙে গেছে।

রায়বাহাদুরের মেয়ে! তারও আবার মেয়ে রয়েছে। সেই তাজা গোলাপের মত মেয়েটি। চোখ জুড়িয়ে যায়। বড়লোকের মেয়ে কলেজে পড়ে। জোয়ান ছেলেদের সঙ্গে আবার লুটোপুটি হুটোহুটি করে। বড়লোকের মেয়ে, বড়লোকের নাত্‌নি! তরুণ আর তরুণী! না, ঐ ছেলেটাব সঙ্গেই মেয়েটার বেশী ভাব। বেশ সুন্দর ছেলেটা! পুরুষের মতই বটে। কিন্তু ঐ যে আর একটি, টিকল নাক, চোখদুটো যেন মেয়েটাকে গিলে খাচ্ছে। হিংসেয় মরে যাচ্ছে ছেলেটা। ভালবাসার লড়াই!—কে জিতবে?

এবার শান্ত হাসি—হিঃ—হিঃ—হিঃ!

বাবা!—ঠোঙ্গা ভরতি সন্দেশ নিয়ে এসেছে গিরিজা সরকার। আউলিয়ার সামনে ধরেছে।

বাবা !—কে রে ব্যাটা? আমি তোর কোন্ জন্মের বাবারে ব্যাটা। দূর হ’।—এবার ফিরে তাকাল আউলিয়া।

—বাবা, ভোগের জন্য কিছু খাবার এনেছি।

—ভোগ?—ভোগের জন্য খাবার এনেছিস্? ভেংচি কেটে উঠল আউলিয়া। তারপর একমুঠো সন্দেশ মুখে পুরে বাকীটুকু মুঠো মুঠো ক’রে ছড়াতে লাগল।

আয়, আয়, আয়! গাছের ডাল থেকে নেমে এল দু’তিনটি কাক। কাকের লুটোপুটি লেগে গেল। আর গিরিজা সরকার হাতজোড় করে দূরে দাঁড়িয়ে দেখতে লাগল।

আগুন! আগুন!—আগুন!

কুমারপাড়ায় আগুন লেগেছে। আকাশে ধোঁয়ার কুণ্ডলী উঠছে; লালে লাল হয়ে গেছে ঐ দিকটা। আগুন লেগেছে। হৈ-হল্লা, চীৎকার শোনা যাচ্ছে। পীরের দরগায় বসেছিল আউলিয়া।

বেরিয়ে এসেছে। তার চোখ দুটি জ্বলজ্বল করছে। চোখের ভেতর যেন আগুন জ্বলছে। ছুটছে আউলিয়া, হাতের লাঠিটা শূন্যে ঘোরাতে ঘোরাতে একবার এদিকে ছুটছে আবার ওদিকে ফিরে আসছে। পুড়ে গেল, সব ছাই হয়ে গেল।—কে আগুন দিল? দেখে লেয়েঙ্গা। কোন্ হারামীর বাচ্চা আগুন দিয়েছে? আমার বিবি পুড়ে মরে গেল। নিভাও আগুন,—আগুন নিভাও। ছেলেটা পুড়ে ছাই হয়ে গেল।

বুকটা যেন চিরে গেল আউলিয়ার। এমনি বুকফাটা চীৎকার। কিন্তু কোথায় আগুন? আর কোথায় কুমারপাড়া?—সে যে অনেক দূর।

কোথাও আগুন লেগেছে শুনলে এমনি ক্ষেপে ওঠে আউলিয়া। ছুটাছুটি করে. লাঠি ঘোরায়। তারপর নিঝুম মেরে বসে থাকে। আজও তেমনি চুপ করে বসেছিল আউলিয়া। কিন্তু তার দৃষ্টি আকাশের দিকে।

—পীরসাব্। আগুন নিভে গেছে। দরগার মাতোয়ালি ইমাম মিয়া বলছে।

আউলিয়া চমকে উঠে,—আগুন নিভে গেছে?

—হ্যাঁ, সাব্। কুমারপাড়ার দুটো ঘর বিলকুল সাফ হয়ে গেছে।

—বিলকুল সাফ্!

—হ্যাঁ, সাব্।

—সাকিনার কি হ'ল? আনোয়ার?

—সাকিনা?

—হ্যাঁরে, ব্যাটা। আমার আনোয়ার আর সাকিনা।

—ওতো হিন্দু বস্তী পীরসাব্।

—হিন্দু বস্তী?

—হ্যাঁ সাব্! হিন্দুবস্তীতে আগুন লেগেছিল। কেউ তো পুড়ে মরে নি।

—আলবত্ মরেছে!—ধমকে উঠে আউলিয়া।

—না, না, বাবা!

—চুপ রও। আমি দেখেছি। ঝুঁট্ বাত্ মত্ বোলো। এক আওরত আর এক লেড়কা।

মাতোয়ালি চুপ করে থাকে,—পাগলের পাগলামি!

আউলিয়া আকাশের দিকে তাকিয়ে বলে,—দেখতে পাচ্ছ না? খড়ের ঘর, আগুনে পুড়ে যাচ্ছে। দুশমন আগুন দিয়েছে। কত লোক ছুটে আসছে। আহা-হা হা! ঘরে লোক রয়েছে গো। কাঁদছে এক বুড়ী। ভেঙে ফেলো, পাঁচিলটা ভেঙে ফেলো। জল ঢালো, জল ঢালো। ইঃ! জলও নেই। কেবল আগুন, আর আগুন। কে ওই ছুটে আসছে? হাতের ছড়িটা ছুড়ে ফেললে। কে ঐ জোয়ান মরদ? ধরো ধরো আগুনে ঝাঁপ দেয় বুঝি। চীৎকার করছে, ছেড়ে দাও, ছেড়ে দাও। আমার আনোয়ার, আমার বাপজান। আনোয়ার, আনোয়ার। ওগো, সাকিনা কোথায়? সাকিনা—সাকিনা।

হতভম্ব ইমামমিয়া কিছুক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে থেকে আউলিয়ার সামনে থেকে নিঃশব্দে চলে যায়।

আউলিয়া চীৎকার করছে,—আনোয়ার! আনোয়ার!

সন্ধ্যার আকাশে-বাতাসে আউলিয়ার আর্তনাদ ঘুরপাক খেতে লাগল। হাউমাউ করে কাঁদছে আউলিয়া। কোথাও আগুন লেগেছে দেখলে এমন ক'রেই কাঁদে আউলিয়া। কোথায় কোন্ আনোয়ার পুড়ে মরেছে,—কেউ বুঝতে পারে না।

গিরিজা সরকার সেই পথে যাচ্ছিল। তার সঙ্গে বিজয় চক্রবর্তীও ছিল। গিবিজা সবকার থমকে দাঁড়িয়ে বার বার সেলাম ঠুকতে ঠুকতে বলতে লাগল,—বাবা অন্তর্যামী। নিশ্চয়ই কোথাও কেউ পুড়ে মবেছে।

—কে ও নাসিম?—হাঁক দেয় আউলিয়া।

—না বাবা। আমি।

—আমি কে রে ব্যাটা? মজা দেখতে এসেছিস?

—বাবা, আমি গিরিজা।

—চুপ রও। ঝুট্ বাত। শিব লেয়েঙ্গা। ভাগ্ হিঁয়াসে।

গিরিজা সরকার আর বিজয় চক্রবর্তী ভয়ে তাড়াতাড়ি পালিয়ে যায়।

বিজয় বলে—দূর ছাই। ব্যাটা আস্ত পাগল।

গিরিজা বলে—উনি কখন্ কোন্ মেজাজে থাকেন, তা কি বোঝা যায় চকোত্তিমশাই? আউলিয়া যে অন্তর্যামী।

—অন্তর্যামী না ঢেঁকি!

—না, না,। ওকথা মুখে আনবেন না চকোত্তি মশাই। সিদ্ধপুরুষ আউলিয়া। ওদের ক্ষমতাই আলাদা। বিপিন চৌধুরীকে জানেন তো!

—সে আবার কে?

—সেই আমাদের হরবিলাসদার ছেলে বিপিন।

—বিপনে? তাই বলো। বকাটে ছোক্‌রা! শুনছি নাকি কলকাতায় না কোথায় রয়েছে এখন। সেবার তো তার মায়ের

সোনার হার নিয়ে পালিয়ে গেলো। আর এমুখো হয় নি।

—সবই বাবা আউলিয়ার লীলা চক্কোত্তি মশাই! সবই বাবার লীলা।

—কি বলছ হে? তোমার আউলিয়া আবার করলে কি? ছোকরা তো শুনছি যাত্রার দলে নেমেছে।

—যাত্রার দলে নয়। বিপিন চৌধুরী এখন নামজাদা অ্যাক্টর—সে এখন সিনেমা স্টার! কাগজে কাগজে ছবি বেরোয়।

—ছবি বেরোয়?—বিদ্রূপ করে ভেংচি কাটেন বিজয় চক্রবর্তী।

—দেখেন নি বুঝি? আর দেখলেই বা বুঝবেন কি করে? তার নামই পালটে গেছে—সৈকত কুমার!

—সৈকত কুমার?

—হ্যাঁ, আজকাল এই রেওয়াজ হয়ে গেছে। সিনেমাতে যারা নামে, তারা নতুন নাম নেয়।

—ছ্যা, ছ্যা! নামটাও পালটে দেয়! গোল্লায় গেছে ছেলেটা।

—গোল্লায় যায় নি চক্কোত্তি মশাই। সিনেমার পর্দায় তার ছবি ওঠে। কত টাকা কামায় জানেন?

—কত টাকা?

—এক এক ছবিতে বিশ, পঞ্চাশ আশি হাজার। এবার শুনছি, এক লাখের কম আর কনট্রাক্টই করবে না।

—তা তোমার আউলিয়ার কেরামতি না কি?

—তাও জানেন না বুঝি? বিপিন তো উচ্ছন্নেই যাচ্ছিল। মায়ের হার নিয়ে যখন পালিয়ে গেল, তখন হরবিলাসদা এসে আউলিয়ার পায়ে কেঁদে পড়লেন বাবা, কি হবে? আউলিয়া হিঃ হিঃ করে হেসে উঠে বললেন, যা ব্যাটা, তোর ছেলে হাজার হাজার টাকা রোজগার করবে। হারের বদলে কত টাকা পাবি! তোর এই ছেলে গন্ধর্বরে, গন্ধর্ব!

—গন্ধর্ব?

—হ্যাঁ। আমরা তো গোড়ায় কিছুই বুঝিনি। এখন বুঝেছি, বিপিন গন্ধর্ব হবে, আউলিয়া সেই আশীর্বাদই করেছিল। তা না হলে ওর মত ছেলে এত টাকা রোজগার করবে, তা কি কেউ ভাবতে পেরেছিল। ডাকাত হ'ত ছেলেটা।

কথা বলতে বলতে এরা দুজনে এগিয়ে যায়। ওদিকে আউলিয়া চীৎকার করতে থাকে আগুন, আগুন, সব পুড়ে ছাই হয়ে গেল। খুন করব, খুন! নাসিম, নাসিমকে খুন করব!—কিন্তু কোথায় কে?

আকাশের তারা শুধু সাক্ষী থাকে। ভারি হয়ে ওঠে অন্ধকার। আউলিয়ার চীৎকার দিগ্ দিগন্তে খুঁজে বেড়ায় কাকে? প্রশ্ন থেকে যায়।

আকাশের তারাগুলোও খুঁজছে অন্ধকারের বুক চিরে অনন্তকাল। এ খোঁজার কি শেষ আছে?

আগুন, আগুন!

অন্ধকারের বুক চিরে চিরে ধ্বনি আর প্রতিধ্বনি উঠছে। থমকে দাঁড়িয়ে পড়ছে পথচারী মানুষ। এদিক ওদিকে তাকাচ্ছে। আকাশের বুকে কালো ভালুকের ছায়া দেখছে। মোটর হাঁকিয়ে যাচ্ছে যারা, তারাও ব্রেক টেনে থেমে যাচ্ছে।

চীৎকার করছে আর ছুটছে আউলিয়া। হাতের লাঠিটা পাগলের মত ঘোরাচ্ছে। তার সে ভয়াল মূর্তি দেখে রাস্তায় যে দু'একজন চলা-ফেরা করছিল, তারা পালিয়ে যাচ্ছে। কেউ বা পালাতে গিয়ে হুমড়ি খেয়ে পড়ে যাচ্ছে।

রাস্তার পাশের দোকানীরা ভয়ে ঠক্ ঠক্ করে কাঁপছে। বাড়িঘরের দরজা জানালা বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। যামিনী মহাজন দুর্গানাম স্মরণ করছে। আর ইমাম মিয়া বলছে, হায়, খোদাতাল্লা!

সকলের মুখেই এক, কথা আউলিয়া ক্ষেপেছে। কি জানি কি সর্বনাশ হবে।—ভাবী অমঙ্গলের ইঙ্গিত দিচ্ছে আউলিয়া!

গোরুর গাড়ি জোরে হাঁকিয়ে পথ ছেড়ে দিতে গিয়ে পাশের নর্দমায় পড়ে যায়। মোটরের হর্ণ বাজাতে গিয়ে ড্রাইভারের হাত কেঁপে উঠে। রাস্তার গ্যাসের বাতিগুলোও যেন থমকে থমকে চোখ বুঁজছে।

কন্‌কনে শীতের হাওয়া। রাতের প্রহর বাড়ছে। ধোঁয়াটে কালো অন্ধকার। ভালুকের কালো কালো লোমগুলো যেন গায়ে বিঁধছে। আকাশের তারাগুলোও যেন ভয়ে চোখ চাইতে পারছে না।

আবোল তাবোল কত কি বলছে আউলিয়া। মাঝে মাঝে বুকফাটা চীৎকার আগুন, আগুন!

পূর্বদিকে এগিয়ে যাচ্ছে সে ভয়াল আর্তনাদ।

আউলিয়া শহর ছেড়ে টিলাগড়ের পথ ধরেছে। রাস্তার ধারের বাড়িগুলো নিঝুম মেরে গেছে। কোথাও বা টিমটিম আলোর বিন্দু দেখা যাচ্ছে। আউলিয়া ছুটছে আর তার চীৎকার শুনে নিশাচর পাখী পাখার ঝাপটা মেরে এগাছ থেকে ওগাছে পালিয়ে যাচ্ছে।

জোনাকীর ওড়না-পরা অগুনতি কালো মেয়েতে যেন ছেয়ে গেছে পথঘাট। আউলিয়ার হাঁক শুনে তারাও পালিয়ে পালিয়ে ছুটে বেড়াচ্ছে।

আউলিয়ার হাঁক শুনে চমকে উঠে এক বুড়ী, দুনিয়ার মা বুড়ী।

—একি জ্বালা! পাগলকে ক্ষ্যাপালে কে? যত সব আবাগীর ব্যাটা। দিন নেই, রাত নেই, পাগলকে জ্বালিয়ে মারছে।—বিড়বিড় করে বকছে বুড়ী।

খাটিয়ার ওপর কাঁথার বোঝা চেপে শুয়েছিল বুড়ী। ওপাশে কেরোসিনের ল্যাম্পটা জ্বলছে। বুড়ী উঠে বসল। হায় ভগমান্!

বুড়ীর সাড়া পেয়ে হাঁস মুরগীগুলো খ্যাঁ-খ্যাঁ, কিচকিচ করে করে উঠল। পাশেই চালাঘরে হাঁস মুরগীর আস্তানা।

কুরুর্ কুরুর্-কু!

থাম হারামীর বাচ্ছারা।—শুনতে দে রে। শুনতে দে।

—খ্যাঁ-খ্যাঁ-খ্যাঁ-কুরুর্-কুরুর্-কু।

হুনিয়ার মা খাটিয়া থেমে পড়ল। কান পেতে শুনছে বুড়ী।

—অ্যাঃ—অ্যাঃ—অ্যাঃ।

আউলিয়া কাঁদছে।

বুড়ী বকতে থাকে,—আমারই যত জ্বালা। মরতে এসেছে এখানে। যা না, ব্যাটা! আউলিয়া না ঢেঁকি। আমার গরজ ঠেকেছে। তা বাপু, তুই তো সব আবাগীর ব্যাটার সবই করছিস্। রোগ বালাই দূর করছিস্, দিনকে রাত করছিস্, তোকে দেখে কে?

হুনিয়ার মা হ'লেও হুনিয়ায় তার কেউ নেই। পথের ধারে কুঁড়ে ঘরে থাকে হুনিয়ার মা। পাশেই একটা ঝিল। ঝিলেব ধারে বড় একটা ছাতিম গাছ। ঘরের ওপাশে একটা কুলগাছ।

বুড়ীর মুখে দিনরাত গালাগাল লেগেই আছে। কেউ তার কাছে ঘেঁষে না। হাঁস মুরগী ছাগল নিয়েই তার সংসার।—কিন্তু এই পাগল আউলিয়াকে দেখলে বুড়ী যেন কেমন হয়ে যায়। হিসেবী বুড়ী বেহিসেবী হয়ে পড়ে।

—অ্যা—অ্যাঁ—অ্যা!

বুড়ীর বুকে তীরের মত বেঁধে এ কান্নার সুর। ছটফট করে বুড়ী। এ হুপুর রাতে কি করবে ভেবে পায় না।

—পাগল—পাগল! হ্যা ভগমান্। হায়রে খোদা!—বুড়ী দরজা খোলে। বাইরে ঘুরঘুট্টি অন্ধকার। ছাতিমগাছের তলায় ঘুরপাক খাচ্ছে—ঘুরপাক খাচ্ছে আউলিয়া।

বুড়ী ডাকে—ওরে পাগলা!—পাগলা!

কেউ সাড়া দেয় না। পাগলের মত গাছটাকে ঘিরে ঘিরে ঘুরপাক খাচ্ছে আর কাঁদছে আউলিয়া—অ্যাঁ—অ্যাঁ—অ্যা!

বুড়ীর মনেও তোলপাড় উঠেছে।

আজ যদি আমার হুনিয়া বেঁচে থাকত!—চোখের জল মোছে বুড়ী।

জটা জটা চুল। লম্বা লম্বা দাড়ি। গায়ে তেল জল নেই। কাঁড়ি কাঁড়ি ময়লা। তবু বাছার মুখখানা দেখলে মায়া লাগে। আউলিয়া হয়েছে,—তালি দেওয়া আলখাল্লা পরেছে। যত সব হতচ্ছাড়া! ওই আবাগীর ব্যাটারাই ওকে পাগল করেছে।

আউলিয়া মাঝে মাঝে থমকে দাঁড়ায় আর আকাশের দিকে তাকিয়ে ভেংচি কাটে—ঝুটা, সব ঝুটা!—আবার হাউমাউ করে কেঁদে ওঠে।

বুড়ী কি করবে ভেবে পায় না। আউলিয়াকে তার ভয় নেই। ছাতিমতলায় পদ্মের পাতা মেলে আউলিয়াকে বুড়ী রোজই খেতে দেয়। যে দিন আসে না হা-হুতাশ করে। আপন মনে গালাগাল দেয়।

—কোন্ আবাগীর নাড়ী ছিঁড়ে বেরিয়ে এসেছে এই হতচ্ছাড়া? পাগল, পাগল! তিনকুলে কেউ নেই, আমাকে জ্বালাতে এসেছে।

গালাগাল পাড়তে পাড়তে ছাতিমগাছের দিকে বুড়ী এগিয়ে যায়। পাগলের এদিকে ভ্রূক্ষেপই নেই। পাগলও বিড়্‌বিড় করে বকছে।

ওরে পাগলা! কি হল রে!—দরদমাখা আকুল স্বর বুড়ীর।

না, না, না,—তুই সরে যা। সরে যা—বুড়ী।

হ্যাঁ যাব বৈ কি? দুপুর রাতে ঘুমোতে দেবে না। কি হয়েছে বল্?

না, না, না—আগুন, আগুন!

আগুনের নিকুচি করেছে। তুই একটা আস্ত পাগল। আগুন কোথারে পাগলা?

দেখতে পাচ্ছিস না?—ওই যে, ওই যে! তারা পুড়ে মরে গেল। ছাই হয়ে গেল।

মাথা ঠাণ্ডা কর্ পাগলা, কিছুই হয় নি। কেউ পুড়ে মরে নি। এই নিশুতি রাত। কেন হাউমাউ ক'রে চীৎকার করছিস! সারা দিন তোর জন্যে ভাত আগলে বসে আছি। এদিকে আসার তো নামই নেই।

—হাঃ—হাঃ—হাঃ—পাগলের হাসি।

—খাবো বুড়ীমা, সবই খাবো। কিন্তু খিদে যে নেই।

—খাবি বৈ কি? সব ভাত হাঁস-মুরগীকে ঢেলে দিয়েছি। তুই আমার হাড়মাস কত আর জ্বালাবি বল?

আউলিয়া কোনো উত্তর দেয় না।

দুনিয়ার মা অন্ধকারের বুকে এক বিচিত্র পট দেখতে পায়,—স্মৃতির পাতা উলটে উলটে অন্ধকারের পাতায় পাতায় জোনাকীরা বুদ্‌বুদের মত জ্বলে আব নেভে,—মছলন্দপুরের চা-বাগান। চায়ের কচি শ্যামল পাতায় টিয়াপাখির খেলা। ঝুড়ি ভবে উঠেছে পাতায় পাতায়। খিলখিল হাসিতে ভেঙে পড়ছে একজন আর এক জনের উপর। বড় সাহেবের নতুন বেয়ারা এসেছে। কচি কচি মুখ, হাসি লেগে আছে চোখে মুখে। উঠতি বয়সের জোয়ান মরদ। চোখে চোখে কথা। জংলু সর্দারের মেয়ে। বাকু, মোহন আর বদনা সাধাসাধি করে। ওদের দেখলেই চোখ রাঙায় সেই মেয়ে।

কিন্তু সেই বড় সাহেবের বেয়াবা। নাম বলেছে—মদন। হ্যাঁ, মদনই বটে। মাঝে মাঝে পথ আগলে দাঁড়ায়। জংলু সর্দারের মেয়ের চোখ মুখ লাল হয়ে উঠত। ঝোপে ঝাড়ে লুকিয়ে থাকে মদন।

কেটে ফেলবে জংলু সর্দার! টুক্‌রো টুক্‌রো করে ফেলবে। ভয় দেখাতো জংলু সর্দারের মেয়ে। ওদিকে বাকু, মোহন আর বদনা জ্বলে জ্বলে মরে। ভিন্‌জাত মদন,—তাদেরই একটি মেয়েকে নিয়ে খেলা করবে? তিনজনে নানা ফন্দি আটে।

জংলু সর্দারের কানে যায়। পচাই মদ খেয়ে গর্জে ওঠে জংলু সর্দার।—চোখদুটো ভাটার মতন জ্বলে ওঠে—হ্যারে মণ্ডলী! খবরদার বলছি। গরদান লেবো।

চুলের মুঠি ধ'রে চড়চাপড় মেরেছিল জংলু সর্দার। ধাক্কা মেরে মাটিতে ফেলেও দিয়েছিল। মোহন ছুটে এসে তাকে না ধরলে

মেরেই ফেলত ,একদিন দু'দিন নয় সে অনেক দিন।

তারপর মঙ্‌লী পালাল। মদনের হাত ধ'রে মঙ্‌লী কোন্ এক অন্ধকার রাত্রে মছলন্দপুরের পাহাড় ভেঙে চলল। রাত আর ফুরোয় না। পথেরও আর শেষ নেই। রাত যখন পোহাল, ভোরের আলো ফুটে উঠতে দেখে তারা শহরের বড় রাস্তাটায় এসে পৌছে গেছে।

তারপর কত ঝামেলা, কিন্তু মদন জোয়ান মরদ। ভয় ওর ছিল না। শহরের করাত-কলে কাজ নিল সে, বরাতও ফিরল। জংলু সর্দার খবর নেয় নি। খবর করলে কি আর রক্ষে ছিল। কোনো উপায়ই তো আর ছিল না। সর্দারের ঘরে আর তার ঠাঁই হ'ত না।

সুখেই ছিল তারা। ঘরও বেঁধেছিল। মদন আজ বেঁচে থাকলে কি না হ'ত? কিন্তু থাকবে কি করে? কতই বা বয়স ছিল তার? ক্ষেতভূঁই করেছিল মদন। মঙ্‌লীর কোলে ছেলেও এসেছিল। কুলগাছটার তলায় শুইয়ে রাখত ছেলেকে—দুনিয়াকে। বড় হ'ল দুনিয়া। তোলপাড় করত, কত ছুটাছুটি, কত খেলা। দশ বছরের ছেলে। কি রাগ ছিল ছেলের?

খাবো না।—কথার নড়চড় নেই। কত সাধাসাধি করত মঙ্‌লী। মঙলীর ছেলে দুনিয়া। ওপাড়ার হরুর মা বলত,—বাপ্‌কা বেটা। দুনিয়া তোর দুঃখু ঘুচাবে মঙ্‌লী। গাড়ি কিনে দে,—গোরুর গাড়ি। আমার গোরুর গাড়িতে এখনই গাড়োয়ান হয়ে বসে।

হ্যাঁ, ছেলে ছিল বটে। কিন্তু তার চোখ দুটো দেখলে জংলু সর্দারের কথা মনে পড়ে যেতো মঙ্‌লীর। জংলু সর্দারের নাতি বটে! আর মুখে ছিল মদনের আদল।

হরুর গাড়িই হ'ল কাল। নতুন বলদ জুড়েছে গাড়িতে। দুনিয়া গাড়োয়ান হ'য়ে উঠে বসল। হেই, হেই, হেই! গাড়ি ছুটছে তো ছুটছে। পাগলা বলদ দুটো।

ছিটকে পড়ে গেল এগারো বছরের ছেলে দুনিয়া। নাক মুখ থেঁতলে গেছে। চেনা যায় না। রক্তে রক্তারক্তি। হুঁশ নেই।

হাসপাতালে নিয়ে গেল ছেলেকে।

দুপুর রাতে ফিরে এল মদন। গোরুর গাড়ি করে হরু আর হরুর মাও এল। দুনিয়াকে নিয়ে এসেছে। চোখ বুজেছে দুনিয়া। সে চোখ আর খুলবে না।

আছাড় খেয়ে পড়েছিল মঙলী। ঐ—ঐখানে। ছাতিম গাছটা তখন কতটুকু ছিল! কেঁদেছিল মঙলী। মাথাটা ঠুকে ঠুকে রক্তারক্তি করেছিল।

জোর করে ধ'রে রেখেছিল হরুর মা। তারপর তারা দুনিয়াকে নিয়ে গেল। হরুর মা বললে,—আবার ফিরে আসবে তোর ছেলে। দুনিয়া মূর্চ্ছা গেছে। হাসপাতালে আবার নিয়ে গেছে।

মিছে কথা বলেছিল হরুর মা। মিছে মঙলীকে সান্ত্বনা দিয়েছিল। ভোর রাত্রে মদন ফিরেছিল। তার চোখের দিকে তাকিয়ে শিউরে উঠেছিল মঙলী।—লাল টক্‌টকে চোখ। কথা বলতে পারছে না মদন। মদনকে ধ'রে শুইয়ে দিয়েছিল মঙলী। তিনদিন তিনরাত সে কি যন্ত্রণা! বিকারের ঘোরে শুধু দুনিয়াকে ডেকেছে মদন।

হ্যাঁরে ব্যাটা! আয়, আয়, আয় রে!—দুনি, দুনি,—দুনিয়া!—মঙলীরও চোখে নিদ্ ছিল না। মদনের মুখের দিকে তাকিয়ে গুমরে গুমরে উঠছিল তার বুক। জানত তার দুনিয়া আর ফিরবে না। তবু একটু শব্দ হ'লেই ফিরে তাকাত,—দুনিয়া এলি রে। কিন্তু দুনিয়া ফিরে এল না কোনদিন।

মদন দুনিয়ার খোঁজেই চোখ বুঁজল। আর চোখ চাইল না। মঙলী দু'চোখে অন্ধকার দেখল। সেই অন্ধকারের মধ্যে কি যে ক'দিনে হ'য়ে গেল জানতে পারলে না, বুঝতেও পারলে না। যখন সে চোখ চাইলে তখন দেখলে হরুর মা তার শিয়রে বসে আছে।

তারপর এমনি ক'রেই রাস্তার দিকে তাকিয়ে দিন কাটিয়েছে মঙলী। মদন আসবে তার সঙ্গে দুনিয়াও আসবে। কত স্বপ্ন দেখেছে।

কিন্তু কেউ এল না। ছাতিমগাছটা বড় হতে লাগল। ছোট্ট কুলগাছটা এখন বুড়ো হয়ে গেছে। মঙ্‌লীও আর সে মঙ্‌লী নেই। মঙ্‌লীকে কেউ চেনে না। হরুর মা নেই! হরুও নেই! সুদীন গাড়োয়ান আর ভাটিয়ালীর সুর ভাঁজতে ভাঁজতে গাড়ি হাঁকিয়ে যায় না। তারা কেউ নেই।

মঙলীও নেই!—মনে মনে আওড়ায় দুনিয়ার মা বড়ী। আর নিজের দেহের দিকে বার বার তাকিয়ে দেখে। অন্ধকারে কিছুই দেখতে পায় না। ছায়ামূর্তি দেখে শিউরে ওঠে। নিজের গায়ে হাত বোলায় বুড়ী। মঙ্‌লী নেই!

সে মঙ্‌লী কোন কালে কোথায় মরে গেছে! দুনিয়ার মা! দুনিয়ার মা বেঁচে আছে! এই তো তার পরিচয়!—দুনিয়া ফিরে আসে নি। কিন্তু মঙ্‌লীকে ছাড়ে নি দুনিয়া!

মঙ্‌লী নেই,—মদন নেই, বেঁচে রয়েছে দুনিয়ার মা! বুকের ভেতরটা কেমন গুমরে গুমরে ওঠে। দম যেন বন্ধ হয়ে আসে। অতি কষ্টে শ্বাস ফেলে বুড়ী।

বুড়ীর সামনে দাঁড়িয়ে আউলিয়া—প্রেতের মূর্তি! প্রেতও কাঁদছে। এই ছন্নছাড়া পাগলা আউলিয়ার মাঝে বুড়ী কি যে দেখেছে, সে নিজেই জানে না। তার মাঝে যে এত মমতা লুকিয়ে রয়েছে তাও বোঝেনি বুড়ী। বুড়ী যে দুনিয়াকে আর মদনকে হারিয়ে তিলে তিলে দিনে দিনে পাষাণ হয়ে গেছে। কেউ তার কাছে ঘেষে না। সকলেই তাকে ভয় করে।

দুনিয়ার মায়ের চোখ লাগলে কারো ছেলে বাঁচে না। এমনি নজর বুড়ীর!—কত কথা কানে আসে। শুনে শুনে বুড়ী সত্যি আজ ডাইনী হয়ে গেছে। কাউকে ভালবাসে না। পাড়ার ছেলেগুলোকে দেখলে জ্বলে ওঠে। বুড়ীর কুলগাছের তলায় পাকাকুলের ছড়াছড়ি। দিনরাত বুড়ীর মুখে গালাগাল,—মর্, মর্, আবাগীর ব্যাটারা মর্।

হঠাৎ একদিন এল আউলিয়া,—ঐ ছাতিমগাছটার তলায় এসে বসেছিল। এমনি প্রেতের মত মূর্তি। আবোল-তাবোল বকছিল আউলিয়া। কি জানি কি মনে হ'ল। ওর মুখের দিকে তাকিয়ে দুনিয়ার মায়ের বুকটা ছ্যাঁৎ করে উঠল.—দুনিয়ার মুখখানা ভেসে উঠল চোখের উপর। অনেক কাল যে দুনিয়ার মুখখানি দেখে নি। ভুলে গিয়েছিল দুনিয়াকে। মনেই পড়ত না। দুনিয়ার মুখের আদল ওই পাগলার মুখে।

—অ্যাঁ,—অ্যাঁ,—অ্যাঁ!—আউলিয়া কাঁদছে।

দুনিয়ার মা'র স্বপ্নে ছেদ পড়ে—বল্, বল্, তোর কি হয়েছে পাগলা!

পাগলার মুখে উত্তর নেই। দুনিয়ার মা বলে,—তুই কাঁদছিস্? কেন,—কি হ'ল রে? তুই বাছা এত লোকের ভাল করিস্ তোর দুঃখ ঘোচাতে পারিস্ না? তুই না সাধু,—সিদ্ধাই?

চুপ করে থাকে আউলিয়া।

বল্, বল্,—দুপুর রাতে আর এ বুড়ীকে কত কষ্ট দিবি?—ঠক্‌ঠক্ করে কাঁপছে বুড়ী।

আউলিয়া কিছুক্ষণ বুড়ীর দিকে তাকিয়ে থেকে বললে,—তুই যা, বুড়ীমা! তুই চলে যা। আগুন নিভে গেছে, সব পুড়ে ছাই হয়ে গেছে।

—হোক্‌গে ছাই! তুই চুপ ক'রে বস দেখি। হ্যাঁ রে, আজ তো দানাপানি কিছুই পেটে পড়ে নি। বস্, পান্তা ভাত ভিজানো আছে, নিয়ে আসি।

—না, না, না। ভুখ্ চলে গেছে বুড়ীমা! ভুখ্ চলে গেছে।

দুনিয়ার মা ঘরে ফিরে গিয়ে এক থালা পান্তা ভাত নিয়ে আসে। এক হাতে ভাতের থালা আর এক হাতে কেরোসিনের কুপি।

—নে বসে পড়্। আমি দাঁড়িয়ে আছি।

মন্ত্রমুগ্ধের মতো আউলিয়া বসে পড়ে। দুনিয়ার মার চোখে তার

অতীতের স্বপ্ন-ভরা জগৎ,—মছলন্দপুরের চা-বাগান, বাকু, মদন আর মোহন,—জংলু সর্দার!

ছুনিয়া তার সামনে ব'সে ভাত খাচ্ছে আর খাটিয়ার উপর পা ঝুলিয়ে ব'সে আছে মদন।—শীতের কন্‌কনে হাওয়া আর রাতের নিশুতির মাঝেও কেমন আলোতে ঘরখানি ভরে গেছে।

আর আউলিয়ার সামনে দাঁড়িয়েছে আর এক বুড়ী,—হ্যারে রাজু! মেয়েটাকে এমন ক'রে মারছিস্? কোন্ দিন ওর বাবা তোকে জেলে দেবে। আহা রে, বাছা আমার! ঘরে মা নেই, তাইতো এতো আব্‌দার।—নে, নে, ভাত ক'টি পড়ে রইল যে! আমাকে কত জ্বালাবি বল্?

চটুই পণ্ডিত বল্‌ছিল,—তুই নাকি পড়াশোনা মোটেই করিস্ না। অতবড় পণ্ডিতের বংশ! তুই কি শেষে বাউণ্ডুলে হয়ে ঘুরে বেড়াবি? দাদুকে ভুলে গেলি বাছা?

—আরে হতভাগা! স্বদেশী করবি! জাতকুল খোয়াবি। আর কি বাকী রাখলি রে হতভাগা? হায় রে ভগবান্! হায় মা কালী।

বুড়ী ছুনিয়ার মা, আর ঐ আর এক বুড়ী, পিসীমা! রাজুর পিসীমা।

রাগে গর্‌গর্ করছে বুড়ী পিসীমা—জাত গেল, জাত্ গেল। কালসাপ, কালসাপ পুষছি আমি।

ঠাস ঠাস করে কপাল চাপড়ায় বুড়ী, না, আর ঘরে ঢুকতে দেবো না। এ ত্রিসীমানায় আসতে দেবো না হতভাগাকে।

ঐ যে দরজা বন্ধ করলে বুড়ী পিসীমা।

জেল খেটেছে। স্বদেশী করে জেল খেটেছে। কি আহাম্মক সব! এমনি করে জেল খাটলে ইংরেজ চলে যাবে! চরকায় সূতো কাটো! হিঃ হিঃ ক'রে কে যেন হাসছে।

ছিঃ ছিঃ, লজ্জাঘেন্নার মাথা খেয়েছে সব। মেয়েকে যেমন খিরিস্তানী ইস্কুলে পড়তে দেওয়া! দত্তমশাই-এর মাথা খারাপ হয়েছে।

প্যাটা ছেলেদের সঙ্গে এত মাখামাখি! শীতেব কনকনে হাওয়ায় কানে বিঁধছে যেন কথাগুলো।

আর সেই বুড়ী পিসীমা হাত পা নেড়ে শাপমুন্যি দিচ্ছে, হিন্দুব ছেলে হয়ে মুসলমানের হাতে খেয়েছে! হায় ভগবান্!

হ্যাঁ ঐ যে মাথায় টিকি, বগলে ছাতা ববদা পণ্ডিত বলতে বলতে যাচ্ছেন, দূব করে দাও হতভাগাকে। জাত আগে, ধর্ম আগে। কিই বা সম্পর্ক? ভাইয়ের ছেলে বৈতো নয়। বক্তের সম্পর্কের চাইতে জাতটা যে বড় দিদি। ধর্মের কাছে প্রাণটা তুচ্ছ। ধর্মের জন্য লোকে নিজের ছেলেকেও গঙ্গাসাগরে ছুঁড়ে ফেলে দিত। আর এতো জাত ধর্মের কথা।

বিধবা পিসীর মুখেব দিকে তাকাল না। নিজের পরকালও গেল। স্বদেশী, স্বদেশী! যত সব ঢঙ্।—ফোঁড়ন কাটেন আবো একজন।

আবার সেই মেয়েটি! হাসিহাসি মুখ। কেমন আছো বাজুদা! পিসীমা ছুটে যাচ্ছেন মেয়েটির দিকে,—যাও, যাও, তোমরা বড়লোক, তোমাদের সবই মানায়। আব এদিকে এসো না মা!

—লজ্জার মাথা খেয়েছো। সোমত্ত মেয়ে তিড়িং তিড়িং করে ঘুবে বেড়ায়। আবার চরকা নিয়ে মাতামাতি করছে। আর বাকী রইল কি? দত্তমশাই এবার স্বয়ংবর সভা বসাবেন। টিপ্পনী কাটছেন আর এক বিধবা। কপালে তার তুলসীচন্দনের তিলক। গলায় তুলসীমালা।

ছেলেগুলো জেল থেকে বেরিয়ে এল। আর এই মেয়েটি এগিয়ে গিয়ে ওদের গলায় মালা পরিয়ে দিলে। বোর্ডিং থেকে পালিয়ে গিয়েছিল মেয়েটি। স্কুলের হেডমিস্ট্রেস্ চিঠি লিখেছে।—জটলা পাকাচ্ছে কয়েকটি লোক।

আউলিয়ার সামনে স্বপ্নরাজ্য।

ছুনিয়ার মাও স্বপ্ন দেখছে,—ছুনিয়া তার কোলে ঝাঁপিয়ে

পড়েছে। তাই দেখে তুনিয়ার মা হঠাৎ হেসে উঠল। আর হেসে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে আবার চমকে উঠল বুড়ী, কোথায় তুনিয়া? তাব সামনে বসে রয়েছে পাগলা আউলিয়া। ভাতের থালা তেমনি পড়ে আছে। আর আউলিয়ার চোখে জল ঝরছে।

এ কি রে পাগলা? সবই যে পড়ে রইল?

না বুড়ীমা, আমার ভুখ্ নেই। তুই চলে যা।

যাবো রে যাবো! এই শীতে কি আমি তোর জন্য মরতে বসবো! কি আক্কেল তোর?

ছন্নছাড়া এই পাগলের জন্য তুনিয়ার মা কি করবে ভেবে পায় না। মনে মনে ভাবে, পাগলা পরের ভাল করে, কিন্তু ওর ভাল করার কোনো লোক নেই। মা নেই ওর, কে দেখবে এই পাগলাকে?

ইচ্ছে হয়, পাগলার মাথাটা বুকে চেপে ধরে তার চোখের জল মুছে সান্ত্বনা দেয়। এই হতভাগা আউলিয়ার যে কেউ নেই। মমতায় ঝরঝর করে কেঁদে ফেলে তুনিয়ার মা।

আউলিয়া হঠাৎ উঠে ছুটতে থাকে,—সব ঝুটা হ্যায়, সব ঝুটা হ্যায়।

ওরে পাগলা, থাম, থাম, শুনে যা আমার কথা।

সব ভুলে গেলি?

রজব নয় রাজীব। তার ইতিহাস জানিস্?

খিলখিল ক'রে হাসছে এক কিশোর। না, না, কিশোর নয়, বড় হয়ে উঠেছে। গোঁফের রেখা দেখা দিয়েছে। সুঠাম দেহ।

আউলিয়া তার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে।

চিনি,—চিনি। নিশ্চয় একে কোথাও দেখেছি। হ্যাঁ, আরো কয়েকবার এসেছিল। তার গল্প শুনিয়ে গেছে। সব যে আজগুবি গল্প! তাকে ধরা-ছোঁওয়া যায় না।

জানিস সেই ছেলে জেল থেকে বের হল। জেল হ'লে কি হবে? কি উৎসাহ আর আনন্দ। তাদের ঘিরে জয়জয়কার পড়ে গেছে।

শুধু কি সে? তার সঙ্গে অনেকেই গিয়েছিল। শহরের সেরা সেরা লোকেরা জড় হয়েছে। কত বক্তৃতা, তোমরাই দেশের গৌরব। দেশ তোমাদের কথা ভুলবে না। এখন দেশের সেবায় উঠে পড়ে লেগে যাও।

হিন্দু আর মুসলমান এক সঙ্গে উল্লাসে চীৎকার করে উঠেছিল,—বন্দে মাতরম্। আল্লা-হো-আকবর।

তারপর কি হ'ল জানিস্? সে বড় মজার কথা। হিন্দুর ছেলে বাজীব। তার উপর বামুনের ঘরের ছেলে। তার দাত্থ না কি ছিলেন গোড়া বামুন। অবশ্য রাজীবের বাবা ছিলেন ঠিক তার উল্টো। রাজীব বাপেরই ধাত পেয়েছিল।

স্বদেশীর হৈ-চৈ আর জেলের সে দুরন্ত দিনগুলো তাকে বদলেও দিয়েছিল। শহরে সভার পর সভা, তারপর হিন্দু আর মুসলমানে এক সঙ্গে ভোজ। পাড়াগাঁয়ের ছেলে রাজীব কিছুটা আশ্চর্যই হয়েছিল। জাত! জাতের বিচার! অম্বিকা চক্রবর্ত্তী আর স্থলতান আমেদ তো এক টেবিলে বসে খানা খায়। এক জনের পাতের জিনিস আর এক জনে কেড়ে নিয়ে খায়। দু'জনেই শহরের সেরা উকিল।

তাদের গাঁয়েব মানুষ এল তাদের নিয়ে যেতে। বাজারের মাঠে স্বদেশী সভা। জেল থেকে ফিরেছে যারা তাদের মঞ্চের উপরে বসিয়ে দেওয়া হয়েছে। তাদের গলায় ফুলের মালা পরিয়ে ছিলেন শহরের বড় নেতা অম্বিকা চক্রবর্তী।

এরাই দেশের ভবিষ্যৎ—এরাই দেশের হবে নেতা, শাসক!

কত হাততালি পড়ল।

তারপর কেরামত আলি চৌধুরী তাদের গাঁয়ের পক্ষ থেকে বক্তৃতা দিলেন। গর্বে ফুলে উঠল রাজীবের বুক। সে সভায় তাদের স্কুলের মাষ্টার মশাইদেরও দেখল রাজীব।

কিন্তু তারপর ?

রাজুর পিসীমা ? রাজুর পিসীমার সে কি মূর্তি। জাত গেল, ধর্ম গেল। পাড়ায় পাড়ায় সে কি জটলা! একদিকে স্বদেশী উল্লাস, আর একদিকে পিসীমার গালাগাল।

ঘরে ঢুকতে দেয় নি পিসীমা।

পণ্ডিত মশাই একদিন উৎসাহ দিয়ে বলেছিলেন, দেশের মুখ উজ্জ্বল করবি। আনন্দমঠের সন্তান তোরা। আনন্দমঠ পড়িয়ে পাগল করে তুলেছিলেন পণ্ডিত মশাই। সেই পণ্ডিত মশাই বললেন,—এ তো ভাল কথা নয়, জাতধর্ম সবার বড়। চান্দ্রায়ণ প্রায়শ্চিত্ত করলেও একে ঘরে তোলা যাবে না।

বুঝলি পাগলা! পাড়াগাঁয়ের লোক তারা। তাদের কোনো দোষ নেই। এদিকে হুজুগও নিভে যেতে লাগল। হৈ হল্লা আর নেই। মাঝে মাঝে শোনা যায় চরকার কথা,—সুতো কাটো আর দেশী চালাও।

রাজীবের মত জোয়ান ছেলে করবে কি ? গাঁয়ে তার ঠাঁই হ'ল না। কেরামত আলি চৌধুরী বললেন,—বহুত্ আচ্ছা! তোর কোনো ভয় নেই বাচ্চা। হিঁদুয়ানি ঢের দেখেছি। আমার ওখানে থাকবি। আমার বাইর-বাংলোয়, না হয় গাছতলায় দুমুঠো চাল ফুটিয়ে নিবি।

লজ্জা,—লজ্জা! হিন্দুর ধর্ম গেল। বুড়ো সর্বানন্দ চৌধুরী তখনো বেঁচে আছেন। গাঁয়ের মুরুব্বি এখন কৈলাস দত্ত। কেরামত আলি চৌধুরীর এ বাহাদুরি তাদের সহ্য হয় না।

চৌধুরী সাহেব এ কি ভাল কাজ হ'ল ? এ ছেলের যে তিনকুলে কেউ নেই। ঠাকুরপণ্ডিতের বংশ, শেষ কালে কি না জাতধর্ম খোয়াবে। আর আপনি নিমিত্তের ভাগী হবেন! দূর করে দিন, এ হতভাগাকে।

ওর বাবা ছিল স্বদেশী ডাকাত। ছেলেও হয়েছে তেমনি। পুলিশের নজর আছে ওর উপর। শেষকালে কি হাঙ্গামায় পড়বেন ? কেরামত আলিকে বুদ্ধি দেন কৈলাস দত্ত।

আর কৈলাস দত্তের মেয়ে শহরের স্কুল ছেড়ে এখন গাঁয়ে এসেছে। কড়া নজর রেখেছে তার বাপ। তবু আদুরে মেয়ের আবদার তার রাখতে হয়। কিন্তু এই রাজীবই হল সর্বনাশের গোড়া। রাজীবকে দূর করে দিতে হবে। পথের কাঁটা তুলতে হবে।

ঘটলও তাই। কাঁটা তুলতে হল না। সুখেন ডাক্তারের কথা জানিস? মনে আছে তোর?—না, তা থাকবে কি করে? সেই যে স্টীমার ঘাটে এসে নতুন ডিস্‌পেন্‌সারি খুলে বসেছিল সুখেন ডাক্তার।

সুখেন ডাক্তাব!—নাম শুনেই চমকে ওঠে আউলিয়া।

স্টীমার ঘাটে পালেদের একখানা ঘরে ডিস্‌পেন্‌সারি খুলে বসেছিল সুখেন ডাক্তাব।—দূর অতীতেব দেখা ছবি—আবছা ও অস্পষ্ট। ছিপ্‌ছিপে গড়ন। মুখে হাসি লেগেই রয়েছে।

গলায় স্টেথিস্কোপ ঝুলছে। হাতে ব্যাগ। গাঁয়ে গাঁয়ে ঘুরছে সুখেন ডাক্তার। মালীপাড়ার বুড়োবুড়ীবা বলে এ ডাক্তাব যাদু জানে। গলার ওই যন্তরটা বুকে লাগালেই বোগ সেরে যায়।

জ্বলেপুড়ে মরে কেষ্ট কবরেজ।

—কলিকাল!—জাতধর্ম আর থাকবে না। বিলিতি জল যাবে হিন্দুর পেটে।

কানাঘুষা চলে এখানে ওখানে। কৈলাস দত্ত বলেন,—ও ডাক্তার সুবিধার নয়। কোনো বদ্ মতলব আছে ওর। তা না হলে শহর ছেড়ে এ অজ পাড়াগাঁয়ে আসে।

কেরামত চৌধুরী বলেন, খাসা ডাক্তার! কেষ্ট কবরেজের বড়ি আর পাচন খেয়ে খেয়ে হদ্দ হয়ে গেছি। কোনো ফলই হয় না। হাত পা ভাঙল তো ছোটো কোথা সেই কাটিগড়ার হাসপাতালে। দাঁত তোলাতে হলে যেতে হবে দশ মাইল ছুটে। এদিকে যন্ত্রণায় প্রাণ যাবার দাখিল।

কেষ্ট কবরেজ বলেন—সবই কালের ধর্ম। আগে কি আর

লোকের অসুখ সারত না? ওই সুখেন ডাক্তার জানেই বা কি? নাড়ীজ্ঞান নেই।

—মতলব আছে হে, মতলব আছে। কই তিন বছর এসেছে পরিবারের তো মুখই দেখলাম না। আছে তো শুধু ওই ভোলা চাকর।—টিপ্পনি কাটেন কৈলাস দত্ত।

দারোগাবাবু বলেছিলেন এসব লোককে সাবধান। ডাক্তারি করতে আসেনি। এসেছে দেশের ছেলেগুলোকে বিগড়ে দিতে। —মন্তব্য করেন আরো একজন।

হঠাৎ আবার চাকা ঘুরে গেল।

ওলাওঠা লেগেছে। দুধপুর আর গনির গাঁয়ে ঘরে ঘরে লোক মরছে। কালীগঞ্জের বাজার তো ফাঁক। কাঁকড়া গাঙে জল নেই। চৈত্র-বৈশাখ মাসের কাঠফাটা রৌদ্র। খট্ খট্ করছে মাঠ আর মাটি। পুকুরগুলো শুকিয়ে গেছে। জলের সে কি কষ্ট!

জল,—জল,—জল।

আধ মাইল মাঠ ভেঙে বিশাই বিলের জল নিয়ে আসে গাঁয়ের বউ ঝিরা। গাঁয়ে যে দুটো পুকুর ছিল তা শুকিয়ে গেছে। কেরামত চৌধুরীর বৈঠকখানায় পরামর্শ চলে।

সুখেন ডাক্তার বললে—চৌধুরী সাহেব, ভয় নেই। একটু সাবধানে থাকতে হবে। আপনার অন্দরের পুকুরের জল যাতে সবাই পায়, তা করতে হবে।

কেরামত চৌধুরী বললে,—বহুত্ আচ্ছা ডাক্তার। পেছন দিকের পাঁচিলটা ভেঙে আজই দরজা ফুটিয়ে দেবো। কিন্তু বউঝি ছাড়া কেউ জল নিতে পারবে না। বোঝো তো। আমরা সেকেলে লোক আব্রু পরদা মানি।

তাই হ'ল। কেরামত চৌধুরীর অন্দরের পুকুরের জল পেল গনির গাঁয়ের লোক কিন্তু সে কতটুকু! পুকুরটায় তলানি পড়ে গেছে। ঘোলাটে হয়ে উঠল জল!

তার পর এক মজার কাণ্ড! সুখেন ডাক্তার ছেলেদের নতুন কাজে লাগিয়ে দিলেন। জল শোধন করে নিতে হবে।

ফিলটার করা জল—কলসীর উপর বালুভরা কলসী বসল। গাঁয়ের জোয়ান ছেলেরা বিলের জল এনে ফুটিয়ে নিয়ে সেই কলসীতে ঢেলে দেয়।

সুখেন ডাক্তারের তাজ্জব কাণ্ড! এ জল খেলে ওলাউঠা নাকি পালাবে। কেষ্ট কবরেজ বলেন,—হিঁন্দুর গাঁয়ে এ চলবে না।

দুধপুরের মনিপুরীরা পরম বৈষ্ণব। তারা সুখেন ডাক্তারের ওষুধ খেতে রাজী। কিন্তু এ জল তারা স্পর্শও করবে না।

জলের জন্য হাহাকার লেগে গেল। সেই বিলের জল! সুখেন ডাক্তার বললে,—তাই না হয় হল। কিন্তু ফুটিয়ে নাও।

সুখেন ডাক্তারের সঙ্গে গাঁয়ের জোয়ান ছেলে দু'চারজন যোগ দিল। একা কত করবে সুখেন ডাক্তার। ঘরে ঘরে রোগের বিভীষিকা। রাজীব হ'ল ডাক্তারের ডান হাত।

জাত গেছে রাজীবের। কেরামত চৌধুরীর ওখানেই থাকে। মন-মরা হয়ে ছিল রাজীব। জাতের মায়া আর নাড়ীর টান—সহজে কি যায়? কেরামত চৌধুরীর বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে তার ফুলছড়ি গাঁয়ের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে চোখে জল ঝরত।

সত্যি কি তার জাত গেল?—সেই বুড়ো পিসীমা সত্যি কি তাকে আর ঘরে তুলবে না? মনে তার অজস্র প্রশ্ন।

ওলাউঠা আনল নতুন হুজুগ।

শহর থেকে আরো দু'জন ডাক্তার এল। সর্বানন্দ চৌধুরী তখন অথর্ব। কৈলাস দত্তের বৈঠকখানায়ই তাদের আস্তানা হল। সরকার থেকে তাদের পাঠিয়েছে।

গাঁয়ে গাঁয়ে ঘুরতে লাগলেন তারা। গনির গাঁয়ে অনেক লোক মারা গেল। দুধপুরের মনিপুরী বস্তী প্রায় উজাড় হয়ে এল।

দিনের বেলাই বিভীষিকা দেখে গাঁয়ের লোক। হাটে-বাজারে

বড় কেউ যায় না। শিয়ালটেকের এমন যে মঙ্গলবারের হাট তাতেও জমজমাটি নেই। বাইরের মহাজনেরা আর নৌকা বোঝা সওদা নিয়ে বাজারের ঘাটে ভয়ে এল না।

তুধপুর আর গনির গাঁয়ের পথে আর কেউ যায় না। আর শুধু কি এ তুটি গাঁ? ফুলছড়ির ঠাকুরপাড়ায়ও একদিনে তিন জন মারা গেল। কেষ্ট কবরেজের একমাত্র ছেলে ষষ্ঠীচরণকেও ওলাওঠায় ধরলে

কেঁদে পড়লেন কেষ্ট কবরেজ।

স্থখেন ডাক্তার বললে,—ভয় নেই কবরেজ মশাই! এমন সব ওষুধ বেরিয়েছে ঠিক সময়ে পড়লে আর সাবধানে থাকলে এ রোগ কিছুই করতে পারবে না।

ষষ্ঠীচরণ সেরে উঠল।

স্থখেন ডাক্তারের সঙ্গে সঙ্গে ঘুরে বেড়ায় রাজীব। শহরের তুজন ডাক্তারের সঙ্গেও তার ভাব হয়ে গেল।

তারা তো সব ঘটনা শুনে অবাক্—কি? জাত গেছে?

তু'জনের মধ্যে যে অল্পবয়সী সে তো হো-হো করে হেসে হেসে বললে,—জাত? সে আবার কি? আমরা তো সাহেবদের সঙ্গেও এক টেবিলে খাই। হিন্দু আর মুসলমানে তফাৎটা কোথায়? তাহ'লে বল, আমরা হিন্দু ডাক্তার হয়ে মুসলমান রোগী দেখি কেন?

—না, না। জাত অতো ঠুনকো জিনিস নয়।

রাজীবের মুখে শঙ্কা ও সংকোচ ফুটে ওঠে।

স্থখেন ডাক্তার বলেন, বেশ। তোমরা ভাই রাজুকে তোমাদের সঙ্গে নিয়ে যাও। বেচারী এখানে থাকবেই বা কোথা?

ওদের তুজনের একজনের নাম মহেন্দ্র আর একজনের নাম বারীন। বারীন বললো, তাই হবে। আমার সঙ্গে তোমাকে নিয়ে যাবো।

রাজীব এদের সরলতা আর হাসিখুশিতে মুগ্ধ হয়ে যায়। মনে মনে ভাবে ওরা পাশকরা ডাক্তার আর আমার বিদ্যে কতটুকু! ওদের কি কাজে লাগবো আমি?

বারীন বলে, ভাবছো কি? তোমাকেও ডাক্তার করে তুলবো। তোমার সাহস আছে। সাহস থাকলেই এসব কাজ করতে পারবে।

এমনি কত কথা হ'ত তাদের মাঝে।

বিকালে গাঁয়ে গাঁয়ে একাও বের হ'ত রাজীব। ঘরে ঘরে পথ্য দেওয়া আর রোগীরা কে কেমন আছে তার তদারকির ভার ছিল তার উপর। সঙ্গে থাকত গনির গাঁয়ের নাসিম শেখ, আর দুধপুরের ভুজঙ্গ সিং।

একাই সেদিন বেরিয়েছিল সে।

গাঁয়ের একপাশে থাকে হাতিম মিয়ার বুড়ীমা। সাকিনার দিদিমা। কত কথা মনে পড়ে।

কেরামত চৌধুরীর জমিজমার তদারক করে বেড়াত রাজীব। মাঠে মাঠে ঘুরতে হয়। কোন্ মাঠে ক'জন কিষান গেল, আজ কতটা জমিতে লাঙল পড়ল, কোথায় কি বীজ ফেলতে হবে, এত সব কাজ।

দূরের মাঠ থেকে ফিরছে রাজীব। দুপুরের রোদ। যেন আগুন ছড়াচ্ছে। গাঁয়ে ঢুকতে পথে পড়ে একটা বড় জারুল গাছ। তারই তলায় বসে হাঁপাচ্ছে এক বুড়ী।

সেই বুড়ীই সাকিনার দিদিমা। চোখে ভাল দেখতে পায় না। কোথায় যেন কি করতে বেরিয়ে ছিল। ঘরে নাতনি দিদিমার জন্য বসে আছে। আর মাঝে মাঝে রাস্তার দিকে উঁকিঝুঁকি মারছে।

বুড়ীকে সেদিন হাত ধরে বাড়ি পৌঁছে দিয়েছিল রাজীব। সাকিনাকে সেদিন দেখেছিল। শান্ত মেয়েটি। তার চোখে যেন কি এক মায়ার কাজল। মুগ্ধ হয়েছিল রাজীব।

সুরুচি আর সাকিনা! মনে মনে তুলনাও করেছিল।

আর আজ সেই সাকিনাকেও দুরন্ত রোগে ধরেছে।

বারান্দায় সাকিনা ছট্‌ফট্ করছে! বুড়ী দিদিমা একটু সেরে উঠেছে। সাকিনার নড়বারও শক্তি নেই।

ওলাওঠার মড়ক।

গোঙরাচ্ছে সাকিনা,—জল, জল, জল।

রাজীব পাশে রাখা কলসী থেকে জল ঢেলে দেয়। সাকিনা তার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে।

নাঃ, আমি বাঁচব না।—আপসোসের সুর সাকিনার।

রাজীব বলে,—এই তো সেরে উঠেছো।

বড় খিদে, একটু মুড়ি দাও।

রাজীব বলে, আরো দুদিন সবুর করো। ডাক্তারবাবুর কথা মনে নেই?

না, না, আমাকে মুড়ি দাও। আবদার ধরে সাকিনা।

বুড়ী দিদিমা বলে,—হ্যাঁগো, বামুনের ছেলে! তোমরা না এলে তো আমরা বাঁচতুম না। আল্লা তোমাদের পাঠিয়েছে।

সাকিনা ছটফট করে। শুকিয়ে গেছে মেয়েটি। বিবর্ণ হয়ে গেছে তার গায়ের রঙ্। চোখ দুটিও গর্তে বসে গেছে। তবু তার এই বিবর্ণ চোখে-মুখে কৈশোর লাবনির উচ্ছলতা ফুটে উঠেছে।

কাঁদতে থাকে মেয়েটি।

রাজীব বলে, কেঁদোনা। যন্ত্রণা বাড়বে।

সন্ধ্যা নামছে। সাকিনাকে বিছানায় পরিপাটি করে শুইয়ে দেয় রাজীব। বুড়ী দিদিমাকেও ঘরের ভেতরে এনে বসায়।

সেবা,—সেবাই যে তার ধর্ম।—সুখেনদা এই মন্ত্র তাকে শিখিয়েছে।

সুরুচিও বসে নেই। মিশনারী স্কুল থেকে ফিরে এসেছে সে।

সে তো মহেন্দ্র ডাক্তারকে ধ'রে বসলে, আমরা কি এসময় কোনো কাজ করতে পারি নে ডাক্তারবাবু?

মহেন্দ্র বললে,—কেন পারবে না? কিন্তু তোমাকে দিয়ে আমরা কি কাজ করাবো?

সুখেন ডাক্তার বললে,—তা হলেই সর্বনাশ। তোমার বাবা

রাজি হবেন তো? তিনি রাজি হ'লে আমি কাজ দিতে পারি।

বারীন বললে,—হ্যাঁ, কাজ আছে বৈ কি?

মহেন্দ্র বললে,—না, না, ও বড় সাংঘাতিক রোগ। তোমাকে তো আমরা ওসব গাঁয়ে নিয়ে যেতে পারবো না।

সুখেন ডাক্তার বললে,—ওসব গাঁয়ে নিয়ে যেতে হবে কেন?

বারীন বললে,—আপনি কি বলতে চান সুখেনদা?

সুখেন ডাক্তার বললে,—তুমি এ গাঁয়ের ভার নিতে পারো। গাঁয়ের মেয়েদের কলেরাব কথা বুঝিয়ে দিতে হবে। পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকা, জল ফুটিয়ে নেওয়া, পচাবাসি না খাওয়া, এসকল কথা তাদের বলতে হবে।

সুরুচি বলে—তা আমি পারব। স্কুলে স্বাস্থ্যবিজ্ঞানে নানা রোগের কথা আমরা পড়েছি। তার উপর কলেরা, ম্যালেরিয়া আর বসন্ত রোগ সম্বন্ধে ফাদার ডেভিড ম্যাজিক লণ্ঠনে ছবি দেখিয়ে বক্তৃতাও দিতেন!

সুখেন ডাক্তার হেসে উঠলেন,—বেশ, তা হলে আর কোনো ভাবনাই নেই। এবাব তোমাকেই আমাদের হয়ে গাঁয়ে গাঁয়ে বক্তৃতা দিতে হবে।

হো-হো করে হেসে উঠল বারীন।

বারীন নতুন পাশ করে এসেছে। বয়সেও নবীন, বড় জোর একুশ কি বাইশ বছরে পড়েছে।

বারীনের হাসিতে সুরুচির মুখ রাঙা হয়ে ওঠে। লজ্জা পায় মেয়েটি।

মহেন্দ্র ডাক্তার বললেন,—ওতে হাসির কি হ'ল বারীন! ওরাই তো দেশের কাজ করবে। আমাদের মা-বোনেরা এগিয়ে না এলে এদেশের কোনো উন্নতিই হবে না।

সুখেন ডাক্তার বললে,—হ্যাঁ, যত কিছু সংস্কার, তা কু-ই বল আর সু-ই বল মেয়েদের মধ্যেই তা শিকড় গেড়ে রয়েছে। মেয়েরাই তা উপড়ে ফেলতে পারে। কিন্তু দত্তমশাই রাজি হবেন কি?

সুরুচি উত্তর দেয়,—সে আমি দেখবো।

তারপর সুরুচি কাজে লেগে যায়। পাড়ার দু'একটি মেয়েকে নিয়ে সে বাড়ি বাড়ি ঘোরে। প্রতিষেধক ঔষধও বিলি করে! চৌধুরী বাড়ির রেণু আর পালেদের মেয়ে বাসন্তী তাকে সাহায্য করে।

মিশনারী স্কুলের মেয়ে সুরুচি। বয়েস তখন বড় জোর পনেরো। কিন্তু তার চোখেমুখে এমন একটা ভাব রয়েছে, তা লোককে মুগ্ধ করে।

গনাই চক্রবর্তীর বিধবা বোন আন্নাকালী বলে,— ও মেয়ের ডাক্তার বর হবে।—তারপর মুখ টিপে হাসে।

কেষ্ট কবরেজ বললেন—কালে কালে কত দেখবো! দত্তমশাই এদিকে নজরই দেন না। আদুরে মেয়ে কি না!

এদিকে আর এক কাণ্ড! ফুলছড়ি গাঁয়েও দু'জনের ওলাওঠা দেখা দিল।

কেষ্ট কবরেজ আর গনাই চক্রবর্তী ঘোষণা করলেন,—ওই ডাক্তার গুলোর অনাচারেই এসব হয়েছে। জাত বেজাতের বিচার নেই! হিন্দু-মুসলমান এক করে দিলে। মা রক্ষাকালী ক্ষেপে গেছেন। রক্ষাকালীর পূজা দিতে হবে।

সমস্ত গাঁয়ে সাড়া পড়ে গেল—রক্ষাকালীর পূজো দিতে হবে।

গনাই চক্রবর্তীর বিধবা বোন আন্নাকালী তো বলে বেড়াতে লাগল, আমার স্বচক্ষে দেখা, মা-কালী এলোচুলে খাঁড়া হাতে নিয়ে ভর সন্ধ্যেবেলা চৌধুরীদের ওই শিমুল গাছের মাথা থেকে ঝাঁপিয়ে পড়লেন।

মা-কালীর বর্ণনা দিতে দিতে আন্নাকালী এমন ভঙ্গী করে, তা দেখে উপস্থিত সকলে শিউরে ওঠে। সত্যিই তো কত দিন হয়ে গেল কালীতলায় তেল সিঁদুর পড়ে না।

পালেদের গিন্নী বলেন,—হ্যাঁ, আমার কর্তাও বলছিলেন এদিকে কেউ নজরও দিচ্ছে না !

পাড়ায় পাড়ায় কীর্তনের দল বেরিয়ে গেল। রক্ষাকালীর পূজা হবে,—যার যা সামর্থ্য চাল, পয়সা, ফলমূল দিতে হবে। আসছে অমাবস্যায় পূজা।

বারীন সুখেন ডাক্তারকে জিজ্ঞেস করে, ব্যাপার কি দাদা ?

সুখেন ডাক্তার জবাব দেয়,—রক্ষাকালীর পূজো। ওদের ধারণা কালী-পূজা করলেই ওলাওঠার ভূত পালাবে।

বারীন বলে,—বেশ তো, পালাক না।

সুখেন ডাক্তার বলে,—পালাবে বৈ কি ? সারারাত জেগে ছেলে বুড়োতে কালীতলায় হল্লা করবে। খিচুড়ির ভোগ খাবে শেষ রাতে। ওলাদেবী আরো জাঁকিয়ে বসবে।

বারীন বলে,—ওদের বুঝিয়ে বলো, এখন পূজো করা ঠিক হবে না। কেউ কেউ নাকি রক্ষাকালীকে নিজের চোখে দেখেছে, এসব মিছে কথা।

রাজীব বলে,—তা সত্যি তো হতে পারে। ঠাকুরদেবতা কি সব মিথ্যা ? চোখেও তো দেখা যেতে পারে।

বারীন হো হো করে হেসে ওঠে। ঠিক, ঠিক বলেছো ভাই ! তারা তো তোমার আমার মতই মানুষ। লোভও আছে—খিঁচুড়ি খাওয়ার লোভ। তার উপর পাঁঠার তাজা রক্ত।

—না, না, তারা মানুষ হতে যাবে কেন ? ঠাকুর দেবতার লোভ নেই।—উত্তর দেয় রাজীব।

সুখেন ডাক্তার বলে—মরুক্ গে ছাই ! আমি তো দত্তমশাইকে বলে দিয়েছি সাফ্ কথা।

বারীন বললে,—তিনি কি বললেন ?

সুখেন ডাক্তার বললে,—কি আর বলবেন। তিনি বললেন, দেখ ডাক্তার, এসব ধর্ম কর্মের ব্যাপারে মাথা গলাতে এসো না। তোমরা

যা করছো করো। মহেন্দ্র বাবু তো দত্তমশাইয়ের কথা শুনে বললে,—তা মশাই। আমাদের কিন্তু শেষে টানাটানি করবেন না। আমরা তিনদিন পরেই চলে যাচ্ছি।

বারীন বললে,—ওদের যা-ইচ্ছা করুক। ওতে আমরা বাধা দেবো না। আমি রাজুর কথাই ভাবছি।

—রাজুর কথা তোমাদের ভাবতে হবে না সুখেনদা! এখন নিজেদের কথাই ভাবতে হবে। ভুজঙ্গ সিংএর গলা শুনে ওরা ফিরে তাকাল।

—দরজায় দাঁড়িয়ে মনিপুরী যুবক ভুজঙ্গ সিং।

—কি ভুজঙ্গ! খবর কি? সুখেন ডাক্তার জিজ্ঞাসা করলে।

ডাক্তারী ছেড়ে দিতে হবে সুখেনদা! হয়ত এদেশ ছেড়েও তোমাদের সবাইকে চলে যেতে হবে!—ভুজঙ্গ সিং-এর ভঙ্গীতে উত্তেজনা ফুটে ওঠে।

বারীন বললে,—বলো না, কি হয়েছে? মহেন্দ্রবাবু কোথা?

তিনি কেরামত চৌধুরীর বৈঠকখানায় বসে রয়েছেন। গাঁয়ের ভেতর গেলে বিপদ হতে পারে।

—বিপদ্ হতে পারে? এ তুমি বলছ কি? সুখেন ডাক্তার জিজ্ঞাসা করে।

—ঠিকই বলছি। মুসলমান পাড়ায় হৈ-চৈ পড়ে গেছে। তাদের অন্দর মহলে এরকম যাওয়া চলবে না। তারা পর্দা মানে। শহুরে ডাক্তারগুলো এসে তাদের সর্বনাশ করলে।

হো হো ক'রে হেসে উঠল বারীন।

হাসবার কথা নয় বারীনবাবু! গাঁয়ের ভেতর ঢোকবার উপায় নেই। গাঁয়ের সব মাতব্বর এসে কেরামত চৌধুরীর বৈঠকখানায় জুটেছে। তাদের বুঝিয়ে বললেও তারা রাজি হচ্ছে না।

সুখেন ডাক্তার বললে,—তাহলে কি উপায় হবে?

—উপায় কিছুই নেই। নিজেরাই মরবে। ওদের হেকিম রহমৎ

আলী আব আমাদেব কেষ্ট কববেজ উসকে দিয়েছে ?

— হ্যাঁ। পাজি নাসিম শেখটাই যত নষ্টেব গোড়া।

সুখেন ডাক্তাবেব মুখটা হঠাৎ যেন লাল হয়ে উঠল। তিনি গম্ভীব হ'য়ে বললেন, কি বলছে নাসিম ?

নাসিম শেখই বটিয়েছে, ডাক্তাব আসবে আসুক, সেবাশুশ্রূষাব নাম ক'বে যে-সে চ্যাংড়া ছেলে অন্দবে ঢুকবে আব মেয়েছেলেব সঙ্গে ইয়ার্কি কববে এ কেমন কথা! এ বকম বেলেল্লাপনা চলবে না।

উত্তেজিত হযে সুখেন ডাক্তাব বললেন, বেলেল্লাপনা ?

ভুজঙ্গ সিং থতমত খেযে উত্তব দেয, ও একটা জানোয়াব সুখেনদা! ওবা এখন বলছে, বেশ ওষুধ দাও নিয়ে যাবো। যাব দবকাব হবে, এখান থেকে নিয়ে যাবে। ডাক্তাব ডাকতে হয়, ডেকে নিয়ে যাবে।

বাবীন ডাক্তাব মুচকি হেসে বাজীবকে বললে, নাসিম না তোমাব বন্ধু!

ছাযা-মূর্তিব মুখে ফুটল হাসি,—তাবপব দেখা গেল তাব চোখ দুটো জ্বলছে।

নাসিম শেখ! চীৎকাব কবে ওঠে আউলিযা। তাব চোখেব সামনে থেকে যেন ছায়াছবিব পর্দা ছিঁড়ে পড়ে গেল। শুধু অন্ধকার, ঘুরঘুট্টি অন্ধকাব। আলোব ঝলক আব নেই। কোথায় কে কথা বলছে ? তাব সামনে কেউ তো দাঁড়িয়ে নেই।

স্বপ্ন, সবই স্বপ্ন। দু হাতে চোখ বগড়ায় আউলিয়া।

আবার এসে দাঁড়িয়েছে সেই মূর্তি!

হাসছে, হাসছে সে। উস্কখুস্ক মাথাব চুলগুলো। তবু হাসছে। আঙুল দিয়ে আউলিয়াকে কি দেখাচ্ছে ?

পুরোনা একটা বাড়ি। শহরতলীর আমবাগানের মাঝখানে একটা জীর্ণশীর্ণ বাড়ি দেখা যাচ্ছে। বড় বড় তালগাছের মাথায় শকুন বসে আছে।

পথ নেই। মাঠের আল ভেঙে যেতে হবে। পাশেই জলা।

আয়, আয়, আয়—শীগগির চলে আয়। আমার পিছু পিছু। পা ঠিক করে ফেলবি। পিছলে গেলে সর্বনাশ।

ঘুরঘুট্টি অন্ধকার। মিট্ মিট্ ক'রে জ্বলছে জোনাকী। ঝিঁ ঝিঁ শব্দ। ধপ করে জলে কি একটা প'ড়ে গেল। বোঁটকা পচা গন্ধ আসছে।

আর কত দূর ?

না। এসে গেছি।

মাথা বন্ বন্ করে ঘুরছে। ছ'দিন ছ'রাত্রি হয়ে গেছে। চোখে ঘুম নেই। পেটে কিছুই পড়েনি। কেবল পথ চলা আর পথ চলা।

তারপর কচু বন আর বনতুলসীর ঝাড় ঠেলে ঠেলে এসে পৌঁছালো সেই বাড়ির দরজায়। দরজা ঠেলতেই ক্যাঁচ্ করে শব্দ হ'ল। কত কাল যে কেউ এ দরজা খোলে নি !

টর্চের আলো ঝিলমিল করে উঠল।

সুখেনদা ! ব'লে উঠল সেই আধ-পাগলা যুবকটি।

চিনতে পার্‌লি নে ? সুখেন ডাক্তার রে, সুখেন ডাক্তার। গাঁয়ে সেই ঘোঁট পাকানোর ভয়েই শহরের ডাক্তার মহেন্দ্রবাবু আর বারীন চলে গেল। তারা চলে যাবার দিন রাজীব লুকিয়েই ছিল। তার নামে কত কথা উঠেছে। নাসিম শেখ ভয় দেখাচ্ছে।

সেই ছাত্তিম মিয়ার বুড়ী মা-র কথা রে ! ভুলে গেলি ? ভুলে গেলি সেই সাকিনার কথা। এত ভোলা মন তোর !

এই সাকিনাকে নিয়েই তো যত উৎপাত। রাজীব না কি ওদের অসুখের সময় মেয়েটাকে ভুলিয়েছে ! বুড়ী তো নাসিম শেখের সঙ্গেই তার সাদি দিতে রাজি ছিল, কিন্তু মেয়েটা বিগড়ে গেছে। নাসিম শেখকে ছ্চোখে দেখতে পারে না।

নাসিম বলেছে, বুঝেছি সব। ওই রাজুই তোর মাথা খেয়েছে।

ওর কি জাতধর্ম আছে? না হিন্দু, না মুসলমান। বেফয়দা যত বেইমান।

কি করবে রাজীব? একে তো তার কোথাও ঠাঁই নেই! তার উপর নাসিম শেখ তার নামে কেচ্ছা রটাচ্ছে। সাকিনার বুড়ী দিদিমা শাপ শাপান্ত করছে। মোল্লা-মৌলানাদেরও ক্ষেপিয়ে তুলেছে নাসিম শেখ।

তখন কি হ'ল জানিস্? এ গাঁয়ের হিন্দুরাও ক্ষেপে উঠল। ছিঃ ছিঃ! অমন ছেলেকে গা-ছাড়া, দেশছাড়া করতে হবে। বাপঠাকুরদার নাম ডোবালে। জাতধর্ম খোয়ালে। এখন-কিনা যবনের বেটিকে সাদি করবে।

কেরামত চৌধুরী এগিয়ে এলেন। তা না হলে সেবার রাজীবকে ওরা আস্ত রাখত না। পর্দার ইজ্জৎ-আব্রু রইল না! নাসিম শেখ তড়পাচ্ছে। রাজীবকে সামনে পেলে খুন করে আর কি। এদিকে সাকিনা না কি কেঁদে ভাসাচ্ছে! তেরো বছরের মেয়ে কত আর বোঝে বল দেখি। সাকিনা বলছে, আল্লাই ওদের পাঠিয়েছে, তা না হলে আমরা আজ কোথা থাকতাম? দারুণ মড়কে তো ধরেই ছিল। কুকুর শেয়ালে নিয়ে টানানানি করত। ওদের নামে বদনাম! আল্লা সইবে না। ক্ষেপে গেছে দিদিমা বুড়ী। সেও শাপশাপান্ত করছে। কেরামত চৌধুরী বললেন, বহুত্ আচ্ছা রাজু আমার ধর্ম ছেলে। মৌলানা সাহেবকে ডেকে পাঠাও, রাজীব হবে রজব চৌধুরী।

তারিণীপুরের মসজিদে সেদিন কত লোক জড় হ'ল! রাজীব রজব হ'বে। কলমা পড়বে রাজীব। বড়ী পিসীমা কাল-ভৈরবের থানে গিয়ে গিয়ে মাথা খুঁড়তে লাগল—মরুক্ মরুক্ হতভাগা! হে ঠাকুর, তুমি মুখ তুলে চাও।

টনক নড়ল আর একজনের। কিন্তু কেউ জানল না। তার মুখে হাসি নেই, কথাও বলতে চায় না। বিছানায় পড়ে রইল দু'দিন। অসুখ করেছে। কৈলাস দত্ত মেয়ের মন বুঝতে পারেন নি। আর কেষ্ট কবরেজ বললেন, এরা জাতের শত্রু, কালসাপ। ওই রাজুর দেখা-

দেখি পাড়ার ছেলেগুলো বিগড়ে যাবে!

সুরুচির চোখে ঘুম নেই। চোখের জলও শুকিয়ে গেছে।

শুয়ে শুয়ে কানাকানি শুনতে পায় সুরুচি কাঁটা সরাতে হবে! ওই সুখেন ডাক্তার বিপ্লবীদলের লোক। যে ডাক্তার দু'জন এসেছিল. তারাও ওই দলের। কৈলাস দত্তের সঙ্গে কানাঘষা চলে এক নতুন লোকের।

তবু বারীন ছেলেটা মন্দ নয়! আমি তো ভাবছিলাম—। কৈলাস দত্তের কথায় বাধা দিয়ে সেই নতুন লোকটি বলে, তা হবে দত্ত-মশাই. বড় ঘরের ছেলে। আমরা তো ওদের নাড়িনক্ষত্র সবই জানি। কুসঙ্গে প'ড়ে গেছে, তা না হ'লে লোভনীয়ই ছিল। দেখি, আমি কি করতে পারি। কুটিল হাসি আগন্তুকের মুখে।

"সুখেন ডাক্তারকে সরাতে হবে। আর তার সঙ্গে ওই রাজীবকেও" দত্তমশাই ফিস্‌ফিস ক'রে বলতে থাকেন।

হ্যা, তাই হবে। বিপ্লবী একটা দল এদিকে ছড়িয়ে পড়েছে। আমরা এ খবর পেয়েছি। নতুন মানুষটি উত্তর দেয়।

কৈলাস দত্ত বলেন, ওই সুখেন ডাক্তারের ডাক্তারি একটা ভান। এদিকের ছেলেদের নিয়ে জট পাকাচ্ছে।

আমরাও পুলিসের লোক। আমাদের চোখে ধুলো দিতে পারবে না। দেখুন না, কোথায় কলকাতার মানিকতলায় একটা বোমা ফেটেছিল। তারই সূত্র ধ'রে এত দূর এগিয়ে এসেছি। নতুন লোকটির কথা শুনে সুরুচি শিউরে ওঠে।

আর এদিকে রাজীব হ'য়ে পড়ল রজব চৌধুরী। নাসিম শেখই যেন সকলের চেয়ে খুশী হল। আর সাকিনা দূর থেকে দেখতে লাগল রাজীবকে। তার মাঝে এক নতুন মানুষ দেখতে পেল সাকিনা। সাকিনার দিদিমা বলে, ভালই হ'ল।

আর বুড়ী পিসীমা মাটির কলসী ছু'ড়ে ফেলে দিয়ে মড়াকান্না জুড়ে দিলেন, ওরে বাবা গো! আজ তোমরা কোথা গেলে গো! দেখে যাও। তোমাদের এ মুখপোড়া কি করে বংশের মুখ পোড়ালে গো!

পাড়ার মাসীপিসীগোছের মেয়েরা এসে জড় হলেন। হা-হুতোশ করতে লাগলেন তারা, উমাশঙ্কর পণ্ডিতের সত্যি আজ পিণ্ডি লোপ হ'ল! প্রায়শ্চিত্ত করলেন বুড়ী পিসীমা।

হায়, হায়, হায়রে! উমাশঙ্কর পণ্ডিতের বংশলোপ হল। আর জলপিণ্ডি দেবার কেউ রইল না! ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলেন বুড়ী পিসীমা।

এদিকে ভুজঙ্গ সিংও ক্ষেপে গেছে।

এ কি করল রাজীব? আমাদের মুখে চুণ কালি মাখিয়ে দিলে!

সুখেন ডাক্তার বোঝান ভালই হ'ল। তুমিই বল ছেলেটা দাঁড়াবে কোথায়!

তাই বলে জাতধর্ম দেবে?

সে কি আর ইচ্ছে ক'রে দিয়েছে! আঠারো উনিশ বছরের ছেলে। বাড়ি নেই, ঘর নেই। পিসীমার ঘরে তার ঠাঁই নেই। কি অপরাধ তার। কেরামত চৌধুরীই তাকে বাঁচিয়েছেন।

বাঁচিয়েছেন?

হ্যাঁ, আমাদের হিন্দুদের এই তো দোষ। কোথায় কে অন্য জাতের ছোঁয়া খেয়েছে অমনি তার জাত গেল। ওই তো শহরের বড় বড় লোকের সঙ্গেই খেয়েছে রাজীব। তাদের তো জাত যায় নি! আর ওরাই তোমাদের ধর্মসভায় বক্তৃতা দেন।

ওরা কি আর ধর্ম মানে সুখেনদা!

সুখেন ডাক্তার হো-হো করে হেসে উঠলেন। এসব জাতটাত কিছুই থাকবে না ভুজঙ্গ। খাওয়া দাওয়ার জন্যে আর জাত যাবে না, দু'চার বছর দেখে নিও।

সন্ধ্যা হয়ে গেছে। সুখেন ডাক্তারের ডিস্‌পেন্‌সারীতে ভুজঙ্গের সঙ্গে ডাক্তারের কথা হচ্ছিল! এমন সময় হন্ত দন্ত হয়ে সে ঘরে ঢুকল সুরুচি। সুরুচি হাঁপাচ্ছিল।

ফিস্ ফিস্ করে বলে, দোরটা বন্ধ করে দিন সুখেনদা। শীতে কাঁপতে লাগল সুরুচি। সুরুচির মুখের দিকে তাকিয়ে ডাক্তার

বিস্মিত হ'ন।

বল, কি হয়েছে? দত্তমশাই ভাল আছেন?—উৎকণ্ঠা ফুটে ওঠে ডাক্তারের কথায়।

না, না, আমি সেজন্য আসি নি। সর্বনাশ হবে সুখেনদা, আপনি আজই পালিয়ে যান।

পালিয়ে যাবো?

হ্যাঁ, পালাতেই হবে। পুলিস পিছু নিয়েছে।

পুলিস? --তুমি জানলে কি ক'রে?

জেনেছি সুখেনদা! আমি আড়ালে থেকে ওদের কথাবার্তা শুনেছি। আপনি নাকি বিপ্লবীদলের লোক। আর—বলতে যেন বাধো বাধো ঠেকে সুরুচির।

আর,—আপনার সঙ্গে বাজুদাকেও নিয়ে যান।

সুখেন ডাক্তারের মুখে যেন বিদ্যুতের ঝিলিক খেলে গেল।

হ্যাঁ, যেতেই হবে। তুমি এখনি চলে যাও সুরুচি! তা না হ'লে তুমি বিপদে পড়বে!

আমায় আগে কথা দিন সুখেনদা।—সুরুচি যেন ভেঙে পড়েছে।

কথা দিচ্ছি বোন!—আমি আগেই তা বুঝতে পেরেছিলাম। হয়ত দু'একদিন দেরী হ'ত। ওই নতুন লোকটিকে তোমাদের বৈঠকখানায় দেখেই আমার সন্দেহ হয়েছে।

এতক্ষণ ভুজঙ্গ চুপ ক'রে ছিল।

সে বললে, পুলিস? পুলিস কি করবে সুখেনদা!

ডাক্তার উত্তর দেন,—তুমি বুঝতে পারবে না ভুজঙ্গ। আমি যে বিপ্লবী। বোমা, পিস্তল দিয়ে ইংরেজের রাজত্বটা উড়িয়ে দিতে পারি।

হো-হো ক'রে হেসে উঠলেন সুখেন ডাক্তার।

আবার সুরুচির দিকে ফিরে বললেন, তুমি শীগ্‌গির চলে যাও। এসময়ে আসা তোমার ঠিক হয় নি। তোমার শরীরও বেশ খারাপ

সুরুচি বললে,—এ ছাড়া যে উপায় ছিল না সুখেনদা। খবরটা যে দিতেই হবে।

—ভাল করেছো। এখন চলে যাও।

ভুজঙ্গ বললে,—আমি তোমাকে এগিয়ে দিয়ে আসছি।

না,—তা'হলে আরো বিপদ হবে।—বললেন সুখেন ডাক্তার।

সুরুচি বললে, আমাকে এগিয়ে দিতে হবে না। আমি আম-বাগানের পথ দিয়ে চলে যেতে পারব। কিন্তু আপনি আজই চলে যান সুখেনদা!

সে হবে'খন।

আচ্ছা আসি।—সুরুচি বেরিয়ে পড়ল!

আম বাগানের পথ।

স্টীমার ঘাটের পশ্চিম দিকে পালেদের ঘরে সুখেন ডাক্তারের ডিসপেন্‌সারী। তার আশেপাশে বড় বড় কয়লার ঢিবি। ছোট ছোট পাহাড়ের মত কালো কালো দৈত্য যেন দাঁড়িয়ে রয়েছে। তারপর আম বাগান। আম বাগানের পথ ধরল সুরুচি।

গাছের ডালপালা অন্ধকার গাঢ় ক'রে তুলেছে। তবু ফাঁকে ফাকে পড়েছে জ্যোৎস্নার আলো। এ পথ সুরুচির বেশ চেনা। তবু ভয়ে ভয়েই চলেছে। মনে আকাশ-পাতাল চিন্তা।

কে আবার এ পথে এগিয়ে আসছে?—থমকে দাঁড়াল সুরুচি।

অস্ফুট কণ্ঠে উচ্চারিত হ'ল—কে?

জ্যোৎস্নার আলো পড়েছে মুখে। যে আসছিল সেও থমকে দাঁড়াল। তারও মুখে প্রশ্ন আর বিস্ময়—কে?

দুজনেই দুজনের মুখোমুখি হয়েছে—সুরুচি আর রাজু,—রাজীব।

রাজীবকে দেখে যেন একটা করুণ আর্তনাদ গুমরে বেরিয়ে এল,—তুমি! তুমি এ কি করলে রাজুদা!

রাজীব চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল। কোনো উত্তর নেই।

বল, বল,—তুমি এ কি করলে?

রাজীব এবার উত্তর দেয়,—আমার আর করবার কি ছিল তুমিই বল?

—ছিল না? কেন পালিয়ে গেলে না! মরতে পারো নি

রাজুদা! তুমি মরতে পারো নি?

—বিদ্রূপের ভ্রুকুটি দেখা দিল রাজীবের চোখে মুখে,—হ্যাঁ, মরব। মরব বৈ কি? কিন্তু রাত্রের অন্ধকারে এ পথে বেরিয়েছো কেন বলতে পারো?

—বেরিয়েছি মরা মানুষকে বাঁচাতে। তুমি সত্যি মরেছো রাজুদা! যাও, সুখেনদার ওখানে যাও। পালিয়ে যাও এখান থেকে। তুমি আজ থেকে আমার কাছে মরে গেছো, মনে রেখো।

—বাঃ, বেশ বক্তৃতা দিতে শিখেছো সুরো! এত কথা শিখলে কোত্থেকে?

সুরুচি হঠাৎ নু'য়ে পড়ে রাজুর পায়ে হাত দিতে। ফোঁটা ফোঁটা চোখের জল পড়ল তার পায়ে। অভাবনীয় ঘটনা। রাজু তো অবাক্। সে সুরুচিকে ধ'রে উঠাতে গেল। কিন্তু সে তাকে ধরতে না ধরতে ছিট্‌কে বেরিয়ে ছুটে অন্ধকারে মিশে গেল সুরুচি।

সেই দিন থেকেই সুরুচি রাজুর কাছে অন্ধকারেই থেকে গেল। হাতড়ে হাতড়ে সে অন্ধকার আজো ঘোচাতে পারে নি রাজু। রাজু চোখ থাকতেও অন্ধ হয়ে গেছে। আরো কত কথা,—আরো কত ইতিবৃত্ত! শুনবি?

আউলিয়ার কানে বাজছে—শুনবি, শুনবি সে ইতিবৃত্ত!

ছায়ামূর্তির কথা শুনে আউলিয়া কেমন যেন হ'য়ে পড়ে। ফ্যালফ্যাল করে তার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে। সত্যি কি কেউ তার সামনে দাঁড়িয়ে তাকে গল্প শোনাচ্ছে! জোরে জোরে মাথার চুল টানতে থাকে আউলিয়া।

নাঃ, কিছু মনে পড়ছে না। এ কি স্বপ্ন? কে? কে তুমি?

হিঃ হিঃ করে হেসে উঠল সে যুবক—ছায়ামূর্তি?

শোন, আরো আছে। আম বাগানের পথ ধ'রে রাজু সুখেন ডাক্তারের ঘরে এল। এবার পালাবার পালা। ডাক্তার বললে, আজ এক্ষুনি এখান থেকে চলে যেতে হবে রাজু!

চলে যেতে হবে?

হ্যাঁরে, তুইও আমার সঙ্গে যাবি।

আকাশ-পাতাল ভাবে রাজীব।

সুরুচি আর সাকিনা,—সাকিনার চোখ দুটি শান্ত আর সজল। আর সুরুচির চোখে আগুন জ্বলছে।

সাকিনা বলেছে,—"তুমি এ কি করলে রাজুভাই! কেন তুমি কেরামত চাচার কথায় রাজি হলে? আমার জন্যে তুমি ধর্ম দিলে?"

আর সুরুচি? সুরুচির মনে যে কি আছে, রাজীব বুঝতেই পারে না। সুরুচির কাছে তো রাজীব মরে গেছে। রাজীব এখন রজব হয়েছে। -এখন সুখেন ডাক্তারের কথা আরো হেঁয়ালি হয়ে উঠেছে। চুপ করে থাকে রাজীব।

কি রে, কি ভাবছিস্? এখনি যেতে হবে।

একটা সুটকেস হাতে নিয়ে রাজীবের হাত ধরল সুখেন ডাক্তার।

চল, চল! এখনি পুলিস এসে পড়বে।

পুলিস!

হ্যা পুলিস। বুঝতে পারলিনে। আমাদের পেছনে পুলিস লেগেছে।

রাজীবের হাত ধরে প্রায় টেনে নিয়ে চলল সুখেন ডাক্তার। অন্ধকারে পথঘাট মাঠ পার হয়ে কোথা যে যাচ্ছে রাজীব বুঝতেই পারে না। তার মুখে কথা নেই। ডাক্তারের কথায় কোনো প্রতিবাদ করবার শক্তিও সে হারিয়ে ফেলেছে।

ডাক্তার বলতে লাগল,—এখন হয়ত পুলিস আমার ঘরটা তন্ন তন্ন করে দেখছে। কিছুই পাবে না বুঝলি। যা কিছু ছিল নষ্ট ক'রে দিয়েছি। আজ সুরুচি বাঁচিয়েছে। সে খবরটা ঠিক সময়ে না দিলে ধরাই পড়তাম।

কেন ধরা পড়তে সুখেনদা!

হ্যাঁরে বোকা! আমরা যে বিপ্লবী।

সুখেন ডাক্তার পকেটে হাত দিয়ে একটা রিভলবার বের ক'রে রাজীবের চোখের সামনে ধরল,—এই ছাখ্!

আতকে উঠল রাজীব—এ যে রিভলভার।

হ্যাঁ। একটা নয় রে, এরকম হাজার হাজার রিভলবার পিস্তল সারা দেশে ছড়িয়ে পড়েছে। এক এক করে শত্রুর শেষ করতে হবে।

শত্রু।—ইংরেজ আমাদের শত্রু।

হ্যারে, তোদের ওই অসহযোগ আর জেলে যাওয়ায় কিছুই হবে না। দেখলি তো! হুজুগে প'ড়ে জাতও খোয়ালি। এখন কেমন মিইয়ে গেছে। ওদের চাকা ঘুরেই চলেছে। ওই চাকা ভাঙতে হবে।

গুম্-গুম্ করে অন্ধকারে আগুনের ফুলকি উড়িয়ে রিভলভারের আওয়াজ করলে সুখেন ডাক্তার।

চল, তোকে এমন এক জায়গায় নিয়ে যাবো যেখানে সবই জানতে পারবি, কিন্তু সাবধান। বড় শক্ত কাজ। দেশের কাজে বেইমানি করলে রক্ষে নেই।

খুন করতে হবে!

হ্যাঁ, শুধু সাহেবগুলোকে নয়, যারা দেশের শত্রু তাদেরই খুন করতে হবে। নিজের ভাই হ'লেও রেহাই পাবে না।

পুলিসে ধরবে যে।

না। লুকিয়ে কাজ করতে হবে। শুধু শুধু পাগলের মতো কোনো কিছুই চলবে না। আগে মন্ত্রে দীক্ষা নিতে হবে, যখন যা আদেশ হবে, তখনি তা করতে হবে। চল, সব বুঝতে পারবি।

শেষ রাত্রে সুখেন ডাক্তারের সঙ্গে রাজীব একটা রেলস্টেশনে এসে পৌঁছাল। ঘুরঘুট্টি অন্ধকার। ছোট্ট স্টেশন। মিট্‌মিট্ করে হু'টো আলো জ্বলছে। ট্রেন আসার ঘন্টি পড়ল। ডাক্তার দুখানি টিকিট করে রাজীবকে নিয়ে ট্রেনে চেপে বসল।

তারপর যাত্রা শুরু হ'ল।

ট্রেন চলেছে, স্টেশনের পর স্টেশন,—হাঁকডাক কানে আসছে। যাত্রীরা ওঠানামা করছে। দিনের আলো ফুটে উঠল। আশে-পাশে মাঠ গাছপালা গ্রাম। নিজেদের গ্রামের কথা মনে পড়ে গেল

রাজুর। একটা স্টেশনে ডাক্তার চা কিনে খাওয়াল। দুপুরে লুচি আর সন্দেশও খাওয়ালে ডাক্তার। ট্রেন চলছে তো চলছেই।

একদিকে অনন্ত কৌতূহল আর পিছনে অদৃশ্য হাতছানি। সজল চোখে চেয়ে রয়েছে একটি মুখ।

কাউকে বলেও আসে নি রাজীব। কেরামত চৌধুরা এখন কি করছেন! নাসিম শেখ বোধ হয় হাঁকডাক শুরু করে দিয়েছে। ভুজঙ্গ সিং নিশ্চয়ই রাগ করেছে। আজ যে রহমত চৌধুরীর ওখানে নিমন্ত্রণ ছিল। তাকে নিয়ে যে এপাড়ায় ওপাড়ায় উৎসবের ভোজ!

সাকিনার দিদিমা কি করছে। আহা-হা, বুড়ী চোখেও ভাল দেখতে পায় না। বুড়ী দিদিমাকে নিয়ে সাকিনা কি-ই বা করবে। আর ও পাড়ায় ফুলছড়ি গাঁয়ে কি হচ্ছে। পিসীমার জন্য কষ্ট হয়। —না, না, সে তো আর তাদের কেউ নয়। রাজীব মরে গেছে,- সত্যি কথা বলেছে সুরুচি।

আগুনের হল্কা যেন সুরুচির কথাগুলো এখনো কানে বাজছে।

তুমি কি বুঝবে রাজুদা! তোমার মন ব'লে একটা জিনিস থাকলে তো?—কি! আমার মন বলে কোনো জিনিস নেই! কি বলতে চায় সুরুচি! কেন আমার সঙ্গে এত মেশে? কি চায় সুরুচি?—ভাবতে ভাবতে কেমন একটা পুলকে ভরে যায় রাজীবের মন। তখনি আবার ভেসে ওঠে সাকিনার মুখখানি।

ওরা রাজীবকে ভালবাসে,—রাজীবের মঙ্গল চায়।

—কিন্তু?—রাজীব আজ কোথায় চলেছে? ডাক্তার তাকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছে। শুনেছে কলকাতায় বারীন আর মহেন্দ্রবাবু আছে। বারীনের কাছে গেলেই হয়। কিন্তু ওরা যখন শুনবে রাজীব ধর্ম দিয়েছে, মুসলমান হয়েছে, তখন কি হবে?

সমস্ত দিন চিন্তায় হাবুডুবু খায় রাজীব। পথে কত নদী পড়ে, কত গাছপালা, মঠ মন্দির! ছোট ছোট ছেলেমেয়ে ট্রেনের কাছে এসে হল্লা করছে। ঝাঁকে ঝাঁকে বকপাখি উড়ে যায়।

চাঁদপুর! মস্ত বড় স্টেশন। দোকান পাট, হৈ-হল্লা! সুখেন

ডাক্তারের সঙ্গে নেমে পড়ল রাজীব। সামনে পদ্মা! ঘাটে স্টীমার একটা হোটেলে গিয়ে দুজনে খাওয়ার পর্ব সেরে নিল।

এবার স্টীমারে যাত্রা শুরু হল।

আমরা কলকাতা যাচ্ছি রাজু!

কলকাতা?-- তার সেই স্বপ্নের কলকাতা। বইতে কলকাতার কথা পড়েছে রাজীব। কত বড় শহর। তাদের শিলচর কিংবা সীলেটের মত হাজার হাজার শহর মিলেও একটা কলকাতা হতে পারে না মাটি নেই কলকাতায়। তাদের গাঁয়ের গোবিন্দ সাহা গল্প করেছেন, —বাবা, সেখানে হাতে দেবার মাটিও কিনতে হয়। এমন কি পূজোর জন্য দুর্বাঘাসও কিনতে হয়। কিছু নেই, কিছু নেই,- সবই সবই পাথর। রাস্তায় রাস্তায় রেলগাড়ির মত গাড়ি চলে, রাতদিন ঠং ঠং, ঢং-ঢং শব্দ। ভোঃ-ভোঃ আওয়াজে কান ঝালাপালা। মানুষের উপর মানুষ। আলোতে ঝলমল। সেখানে অমাবস্যা নেই, পূর্ণিমা নেই। সবই সমান বাবা! সবই সমান। ইংরেজের কল!

সেই কলকাতায় যাচ্ছে রাজীব। এখানেই রয়েছেন বড় বড় সব লোক, যাদের নাম সে বইতে পড়েছে; যাদের ছবি কাগজে বের হয়। তারা কলকাতারই লোক। তাদের দেখতে পাবে রাজীব।

স্টীমারে লোকের ভিড়! বসবার পর্যন্ত জায়গা নেই। তাদের সঙ্গে কোনো জিনিসপত্রও নেই। শুধু সুখেন ডাক্তারের হাতে একটা ছোট স্যুটকেস। দোতলার রেলিং-এর একপাশে দুজনে কোনো রকমে বসে সময় কাটাতে লাগল।—এই তো পদ্মা! কি প্রকাণ্ড নদী!

ঢেউ উঠেছে; তার মাঝে নৌকাও চলছে। জেলেরা মাছও ধরছে। দূরে গ্রামও দেখা যাচ্ছে। রাজুর মনোজগতেও ঢেউ উঠেছে—কলকাতা! কত দেখবার জিনিস আছে এখানে। আবার ডাক্তারের সেই পিস্তলের কথাও মনে পড়ে।

রাজীব কি করতে কলকাতা যাচ্ছে?—সুখেনদা তাকে কোথায় নিয়ে যাবে? না, না,—সে ওইসব খুন জখমের কাজ করতে পারবে না।—মনে মনে কত কথা ভাবে রাজীব

দেশের কাজ ?—দেশ আমার কি করবে ? এই তো দেশের কাজ করতে গিয়ে জাতধর্ম খুইয়েছি। এখন প্রাণটাও যাবে।

ফাঁসি ?—আতকে ওঠে রাজীব।

ক্ষুদিরামের ফাঁসি—ছোটবেলা থেকে গান শুনে আসছে রাজীব। আর, সেদিনও কলকাতায় কার যেন ফাঁসি হ'য়ে গেল। স্বদেশী ক'রে ফ ? কি লাভ আমার ? যারা প্রাণ দিল, তাদের কথা কেউ মনে বেখেছে। দেশ স্বাধীন হ'লেই বা কি ? তাদের তো কোনো লাভই হবে না। বড়লোকদেরই লাভ ! এই তো রাজীব এখন রজব হ'ল। কিন্তু শহবেব অম্বিকা উকিল আর বসন্ত সাহার পসার বাড়ল। মুসলমানের সঙ্গে খানাপিনা করছে। সাহেবস্ুবার সঙ্গে ওরা তো দিব্বি খানাপিনা করছে। লাট সাহেবের দরবারে আসন পেয়েছে ওরা !

তরুণ বয়েস। আঠারো উনিশ বছরেব ছেলে আজ পাকে-চক্রে বিবাগী দেশছাড়া হতে বসেছে। সুখেন ডাক্তার তাকে ফাঁসি কাঠের সামনে ঠেলে দিচ্ছে।

•

কিন্তু কোথায় কলকাতা ? অসংখ্য লোক আর আলোর ঝিলি-মিলির মাঝে যেন লুকিয়ে থাকা ! সুখেন ডাক্তার গম্ভীর হয়ে গেছে। বাগবাজার না কোথায় কোন্ এক জরাজীর্ণ বাড়ির মেসে গিয়ে উঠল তারা। সেখানে যারা থাকে, তাদের কেউ কেরানী, কেউ বা ডকে চাকরি করে। কেউ বা ভোর হতে না হতে বেরিয়ে যায়। কেউ. দালালী করে, কেউ করে শেয়ার মার্কেটের কাজ।

শেয়ার মার্কেট ! রাতারাতি কেউ বড়লোক হ'য়ে যায়। কেউ বা সর্বস্ব খুইয়ে হাহুতাশ ক'রে। লোহার বাজার,—কোম্পানির শেয়ার, গানিমার্কেট—কতসব বিচিত্র কথা !

রাজুর উৎসাহ নিভে যায়। সুখেনদা তাকে কোথায় নিয়ে এল। এর চাইতে যে তার ফুলছড়ি গাঁ-ই ভাল ছিল। স্যাঁতস্যাতে ঘর, দেওয়ালের চুনবালি খসে খসে পড়ছে। বাড়িটা কুঁড়ে একপাশে

একটা বট গাছও উঠেছে। সকাল হতে না হতেই মেসের বাসিন্দাদের এক এক জন ক'রে বেরিয়ে যায়। বেলা দশটা হ'তে না হ'তেই মেস খালি হ'য়ে পড়ে! সুখেন ডাক্তারও মেসে কতক্ষণ থাকে? সেই যে ভোর বেলা বেরিয়ে যায়, আর ফেরার নামও নেই। কোনোদিন রাত বারোটা একটায় ফেরে।

রাজুকে যার হেপাজতে রাখা হয়েছে, তিনি আবার গেরুয়া পরেন। দিন রাত বই পত্র নাড়াচাড়া করেন। তিনি বড় একটা মেসের বাইরে যান না। কথাও বলেন খুব কম। মাঝে মাঝে রাজুর দিকে তাকিয়ে হাসেন।

রাজু গেরুয়া-পরা এই ভদ্রলোকের হাবভাব কিছুই বুঝতে পারে না।—সাধু?—সন্ন্যাসী? কিন্তু এখানে কেন? ভোর বেলা উঠে গীতা পড়েন এই সাধু। মেসের দু'একজন তাঁকে সাধুবাবু বলে ডাকে। সুখেন ডাক্তার তো মেসে ফিরে গভীর রাত পর্যন্ত এই সাধু বাবুর সঙ্গেই কি সলাপরামর্শ করে।

কি এত কথা এই সাধুবাবুর সঙ্গে!—রাজুর মন তোলপাড় করে। ঘুমও আসে না। কোথায় যেন একটা বাজা-ঘড়িতে ঢং ঢং করে ঘণ্টা বেজে ওঠল, ঘুমের ঘোরে কিছুই বুঝতে পারে না রাজু। রাত দু'টো কি তিনটে ঠিক বুঝতে পারে না। বিপ্লব আর পিস্তল? সাহেব মারতে হবে! মাথার ভেতরটা কেমন যেন ক'রে ওঠে। কি হবে সাহবদের মেরে? যত সব পুলিস আর দারোগা,—সকলেই তো এদেশের লোক। হ্যাঁ, স্বাধীনতা চাই বৈ-কি? কয়টা সাহেব আছে এদেশে? এরা চলে গেলেই তো সব ল্যাঠা চুকে যায়।

হ্যাঁ, মহাত্মা গান্ধীকে দেখেছে। সেবার জানিগঞ্জ বাজারে দূর থেকে দেখেছে তাঁকে। কি জোর বক্তৃতা দিয়েছেন! কত লোক হয়েছিল! শুধু মাথার ওপর মাথা। স্বরাজ চাই, ইংরেজরা শোষণ করছে। শোষণ করছে এদেশকে। কি করে যে শোষণ করছে?—কিছুই বুঝতে পারে না রাজু! ওদের সঙ্গে যুদ্ধ করবে সুখেনদার দল? কি ক'রে পারবে?

রাজুর স্বপ্ন ভেঙে যায়। কে যেন বলছে!

রাজু!—ঠেলে তুলছে সুখেন ডাক্তার!

চল্, চল্—এখুনি বের হ'তে হবে।

হতভম্ব হয়ে যায় রাজীব।

কোথায় যেতে হবে?

ডাক্তারের চোখের দিকে তাকিয়ে আর কিছুই জিজ্ঞেস করতে রাজীবের সাহস হয় না। সে দেখতে পায় এক কঠোর কঠিন আদেশের ভঙ্গী। রাজীব উঠে দাঁড়ায়।

সাধুবাব বলেন,—খুব সাবধান।

ডাক্তার আর কোনো কথা না ব'লে রাজীবকে চোখের ইঙ্গিতে তার পিছু পিছু আসতে নির্দেশ দিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে পড়েন।

রাস্তায় নেমেছে রাজীব। কলকাতার শীতের রাত। নির্জন রাস্তাঘাট। আলো জ্বলছে রাস্তায় রাস্তায়। কিন্তু তার সে জৌলুস নেই। আলোগুলোও যেন শীতে কুঁকড়ে জড়সড় হয়ে পড়েছে।

আকাশের তারাগুলোও যেন আর তাকাতে পারছে না। তাদের চোখেও যেন ঘুম লেগেছে। ঘুমন্ত পৃথিবীকে হাজার হাজার চোখ মেলে সারা রাত পাহারা দিয়েছে তারা। আর যেন পারে না।

সুখেন ডাক্তারের পিছু পিছু এগলি ওগলি দিয়ে পূবদিকে এগিয়ে যাচ্ছে রাজীব। এসব জায়গার নামও সে জানে না। কলকাতা? দেখবার কত জিনিস রয়েছে, কিছুই দেখা হ'ল না। যাদুঘর, চিড়িয়াখানা, হাওড়া-ব্রীজ!—অথচ প্রায় সাতদিন হ'ল রাজীব কলকাতায় এসেছে।

মনে হ'ল সামনে একটা খাল। বড় বড় নৌকাও রয়েছে; সবই নিঝুম, নিশ্চুপ! ওকি! বড় একটা গাছের তলায় দাঁড়িয়ে রয়েছে একটা মোটর গাড়ি।

সুখেন ডাক্তার গাড়িটার কাছে এগিয়ে যাবার আগে মুখ দিয়ে কি রকম একটা শব্দ করল। মোটরগাড়ি থেকেও ঠিক সেরকম উত্তর এল। তারপর রাজীবকে নিয়ে ডাক্তার গাড়ির কাছে গিয়ে গাড়িতে

চেপে বসল।

গাড়িটা চলছে তো চলছেই। শীতের কন্‌কনে হাওয়া। দুপাশে দৈত্যের মত বড় বড় বাড়ি। শহর ছেড়ে বাইরে বেরিয়ে পড়ল তারা। ঝোপঝাড়, কলকারখানার উঁচুউঁচু চিমনি,—প্রেতপুরীর মত পাশে পাশে যেন কেমন বিভীষিকা।

এক জায়াগায় এসে মোটরটা থামল। এবার হাঁটাপথ। মোটরটা তাদের ছেড়ে দিয়ে চলে গেল। সুখেন ডাক্তারের পিছু পিছু চলেছে রাজীব।

জঙ্গলে ঘেরা পুরোনো বাড়ি।

আশ্চর্য! চমকে উঠল রাজীব?

কি রে আমাকে চিনতে পারলি নে?

বারীনদা! তুমি?—তুমি এখানে?

হ্যাঁ। তুই এসেছিস্ ভালই হল! কিন্তু—।

সুখেন ডাক্তার বারীনকে বাধা দিয়ে বললেন,—হ্যাঁ, একে নিয়ে এসেছি। এতে আর কিন্তু নেই।

বারীন বললে,—তা তো হবে কিন্তু যে রকম ব্যাপার। এ নিতান্ত আনাড়ি। ভয় পেয়ে যাবে। তন্ন তন্ন ক'রে পুলিস চারিদিকে খুঁজে বেড়াচ্ছে। কখন কি হয় বলা যায় না। রাজুকে এখানে না আনলেই ভাল হ'ত সুখেনদা!

সুখেন ডাক্তার উত্তর দেন,—কেন? কি হয়েছে?

বারীন বলে,—হবে আবার কি? রাজুকে সামলাতেই হিমসিম খেতে হবে।

হো-হো করে হেসে উঠল বারীন।

না, না, আমার জন্য তোমাদের ভাবতে হবে না বারীনদা!—রাজীবের উত্তর শু'নে বারীন আরো হেসে ওঠে।

সুখেন ডাক্তার বলেন—তোমার ওপরই এর ভার রইল বারীন! দেশে থাকা এর পক্ষে আর সম্ভব হ'য়ে উঠল না। রাজীবকে রজব চৌধুরী হতে হয়েছে।

রাজীবের মুখখানি লজ্জায় রাঙা হয়ে ওঠে। সুখেন ডাক্তারের কথা শু'নে বারীনও বিস্মিত হয়।

কেন? তাতে দোষ কি? সময় বু'ঝে আমরা তো হামেশাই নাম পালটাই! নাম, শুধু নাম। কেন সময় সময় চেহারাও পালটাতে হয়!—বলতে বলতে বারীন রাজীবের কাঁধে হাত রেখে ঝাঁকুনি দিয়ে বলে ওঠে,—ভয় নেই রাজু!

—কখন ভিখেরী, কখন বা মাতাল, কখন অন্ধ, কখন বা পঙ্গু। আরো কত কি সাজতে হয়।—ফকির, বৈষ্ণব, জটাধারী সন্ন্যাসী।

সুখেন ডাক্তার হাতের ঘড়ি দেখলেন,—হ্যাঁ, এখনই মহেন্দ্রদা এসে পড়বেন। রাজু! মনে রাখিস এখানকার সব ব্যাপারই বড় গোপন। যা দেখবি বা শুনবি—কোনোদিন কোথাও প্রকাশ করতে পারবি নে। এখানকার নেতার আদেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করতে হ'বে। পুলিসের চোখে ধুলো দেওয়া যায়। কিন্তু আমাদের দলের চোখে ধুলো দিতে কেউ পারবে না।

সুখেন ডাক্তার কেমন যেন গম্ভীর হ'য়ে গেলেন।

বারীন বললে,—তুমি একে কেন ভয় দেখাচ্ছ সুখেনদা! আমি বলছি, রাজু এখন তার ফুলছড়ি গাঁয়ের স্বপ্ন দেখছে!

সত্যই রাজীব তখন আকাশ পাতাল ভাবছে। ফুলছড়ি গাঁয়ের মাঠ ঘাট তার চোখের সামনে এলোমেলো হয়ে ভাসছে, আর উঁকি ঝুঁকি মারছে কত মুখ! আর এই নির্জন ভাঙা বাড়িতে যেন ভয়াবহ বিভীষিকা তার সামনে। তার সামনে দাঁড়িয়ে সুখেন ডাক্তার যেন নির্মম এক দস্যু!

চমক ভেঙে গেল। পেছনের খোলা দরজা দিয়ে ঘরে ঢুকলেন একজন। তার মুখভরা দাড়ি। চুলগুলো উস্কখুস্ক। অনেকদিন চুলছাটা হয় নি। চোখের দৃষ্টির মাঝে রয়েছে কঠোরতা।

তার পেছনে আরো তিনজন ঘরে ঢুকল। কাউকেই চেনে না রাজীব। কিন্তু প্রথম যিনি ঘরে ঢুকেছিলেন তার মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। কোথাও যেন তাকে দেখেছে বলে মনে হ'ল। কিন্তু কিছুতেই

মনে করতে পারলে না।

বারীন বললে, চিনতে পারলি নে রাজু, মহেন্দ্রদা!

রাজীব এগিয়ে তার পা ছুঁয়ে প্রণাম করতে যাচ্ছিল। মহেন্দ্রবাবু বাধা দিতে দিতে বললেন, "হয়েছে।" তারপর বারীনের দিকে ফিরে বললেন, রাজুকে কয়েক দিন ট্রেনিং দিয়ে তুমি ওদের দেশেই চলে যাও বারীন! এখানে থাকার কোনো দরকার নেই। এখন ছড়িয়ে পড়তে হবে।

সুখেন ডাক্তার বললেন,—রাজুর পক্ষে ফিরে যাওয়া সম্ভব নয়। সেখানে যেসব ঘটনা ঘটে গেছে, তারপর তো ফিরে যাওয়া চলে না।

মহেন্দ্রবাবু বললেন,—আপনি মারাত্মক ভুল করেছেন সুখেনবাবু, রাজু তো বেশই ছিল। মুসলমানদের মধ্যে রাজু থেকে গেলে আমাদের ভালই হ'ত। ওদের সমাজে থেকে অনেক কাজ করা যায়। এখনো মুসলমান সমাজকে ইংরেজ বিশ্বাস করে।

—কিন্তু রাজু কি তা করতে পারত? গাঁয়ের লোকের চক্রান্তে প'ড়ে ছেলেটার সর্বনাশই হ'ত। কৈলাস দত্ত তো সেই সুযোগই চাইছিলেন।

সুখেন ডাক্তারের কথায় বাধা দিয়ে মহেন্দ্রবাবু বললেন,—না। দত্তমশাই আরো বড় শিকারী। বারীনের উপরই তাঁর ঝোঁক। আর বারীনও—।

মহেন্দ্রবাবুর মুখে হাসির রেখা ফুটে উঠল।

—কি বল বারীন্?

বারীনের মুখেও হাসি। কিন্তু কেমন এক রকম লজ্জা ও সংকোচ ফুটে উঠল।

সুখেন ডাক্তার বললেন—তার কিছুই তো আমি জানিনে।

—জানবেন কি করে? এটা তো জানেন, বারীনের বাবা রায়বাহাদুর, তার উপর সরকারী উকিল। ছেলে ডাক্তারী পরীক্ষায় পাশ করেছে। হয়ত বা বিলেতেই পড়তে যাবে। আর দত্তমশাইও টোপ ফেলেছেন।

বারীন বলে উঠল—যত সব বাজে কথা।

মহেন্দ্রবাবু বললেন,—সব বাজে কথা নয় বারীন! আমি যত-টুকু জানি, তাই বলছি। আর তোমারও যদি ইচ্ছে থাকে, বেশতো বিলেতে পাড়ি দাও। দত্তমশাইয়ের মেয়ে যোগ্য পাত্রই হবে।

হেসে উঠলেন মহেন্দ্রবাবু। স্নখেন ডাক্তারও হাসলেন। রাজীব এতক্ষণ চুপ করে ছিল। তার কাছে এসব কথা হেঁয়ালির মতই ঠেক্‌ছে।

বারীন আর দত্তমশাইয়ের মেয়ে—স্নরুচি! এত কাণ্ড ঘটে গেছে!

এক নতুন ভাবনার ঢেউ উঠেছে রাজীবের মনে। বারীন শিক্ষিত,—বারীন মেডিকেল কলেজ থেকে ডাক্তারী পরীক্ষায় পাশ করে বেরিয়েছে। বারীনের বাবা রায়বাহাতুর। সরকারী উকিল। সুন্দর সুঠাম চেহারা। আর স্নরুচি?—রাজীব কে? স্নরুচির গাঁয়েরই ছেলে। গরীব,—না, শুধু গরীব কেন? রাজীবের কিছুই নেই। লেখাপড়া?—ক্লাশ নাইনের বিদ্যে। তারপর,—তারপর! কি সম্পর্ক তাদের! জাত নেই, ধর্ম নেই,—কি দাবি আছে তার? ছোট বেলার সঙ্গী,—আর? আর কি? এত কথা তো রাজীব কোনো দিন ভাবে নি। গোড়ায়ই যে গলদ ছিল! ওরা কায়েত, আর রাজীবরা ব্রাহ্মণ। তাও কোনো দিন চিন্তা ক'রে দেখে নি রাজীব। খেলা!—খেলার বয়স যে এমন করে কেটে যাবে, তা তো ভাবে নি। স্নরুচি চলে যাবে, তার বিয়ে হবে!—এ কি চিন্তা!

বারীনের মুখে হাসি লেগেই আছে।

এ মানুষ আবার পিস্তলের গুলি ছুঁড়ে মানুষ মারতে পারে! বড়লোকের ছেলে। ডাক্তারী পাশ করেছে। এর আবার চিন্তা কি? মানুষ মারার দলে নাম লিখিয়েছে বারীন! আর রাজীবকেও এরা এ দলে নাম লেখাতে নিয়ে এসেছে। মরণ-ফাঁদে পা দিয়েছে রাজীব!—রাজীবের মাথাটা গুলিয়ে যায়।

শত্রু,—শত্রু,—এরা সকলেই তার শত্রু!

কি বলেছিল সুরুচি?—তখন তো এত কিছু ভাবে নি রাজীব। সুরুচি বলেছিল, আমি কোনোদিন বিয়ে করব না রাজুদা! বুঝলে, —বুঝলে। বাকীটুকু বলেনি সুরুচি! হেসেও ছিল, কিন্তু টপ টপ ক'রে চোখের জলও ফেলেছিল।

খেলার জুটি! বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে সে জুটি ভেঙে গেল। কেমন যেন এক লজ্জাশরমের আব্রুতে সুরুচি নিজেকে ঘিরে রাখে। আর রাজীব? সুরুচিকে দেখতে পেলে তারও কথা কেমন জড়িয়ে যেতো।

ফুল-ফোটার দৃশ্য! তন্ময় হ'য়ে যেতো রাজীব!—সেই সুরুচি! হ্যাঁ, সুরুচিই বলেছিল, না, না। পিসীমাই বলেছিল, ওরা কায়েত, আর আমরা বামুন, ওকথাটা ভুলে যাস নি।

সুরুচি বলেছিল,—চল, আমরা পালিয়ে যাই রাজুদা!—রাজীব বলেছিল,—কোথা যাবো? সুরুচি বলেছিল,—দুজনে মিলে দেশের কাজ করব। গান্ধীজীর আশ্রমে গিয়ে থাকব।

সে আর হয়ে উঠে নি।—এখন রাজীব প্রেতপুরীতে। তার সামনে দাঁড়িয়ে যত সব প্রেতমূর্তি!—এদের দয়া নেই, মায়া নেই।

মহেন্দ্রবাবুর কথা রাজীবের কানে গেল,—সোদপুরে আমাদের দু'জন ধরা পড়েছে। ওদিকে চাটগাঁয়ে সবই ঠিক হয়ে আছে। কলকাতায় কয়েকজন থেকে যাবে! পালাবার পথ রাখতে হবে।

সুখেন ডাক্তার বললেন—সবই জানি। রাজুকে নিয়েই হয়েছে মুশকিল।

বারীন বললে,—কোনো মুশকিল নেই সুখেনদা। রাজুকে আমার মেসেই রাখব।

মহেন্দ্রবাবু বললেন,—বেশ, তাই ভাল। তুমি এখন ধরা-ছোঁয়ার বাইরেই থেকে যাও। আমাদের সঙ্গে যেন তোমার কেনো সম্পর্কই নেই।

চল রাজু।—রাজীবের কাঁধের উপর একটা ঝাঁকুনি দিয়ে বারীন রাজীবের হাত ধরে বেরিয়ে পড়ল। ভোরের আলো তখনো ফোটে নি।

ছায়ামূর্তি কি যেন দেখিয়ে দিচ্ছে—ঐ ছাখ্ !

আউলিয়া এদিক্-ওদিক্ তাকিয়ে দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে। তার চোখের সামনেও সে মূর্তি নেই।

আউলিয়া রজব।

দরগার মাঝে ব'সে রজব ঝিমোচ্ছে। স্বপ্ন, সবই তার কাছে স্বপ্ন দিশেহারা মানুষগুলো এসে তার স্বপ্ন ভেঙে দেয়। কত আবেদন-নিবেদন আর কত আকুতি-মিনতি !

—বাবা! তুমি বাঁচাও।

সত্যিই কি আউলিয়া তাদের বাঁচাতে পারে? ওরা তার পায়ে উপুড় হয়ে পড়ে কাঁদে। তার ধমক, গালাগাল শোনে না। ধুলো ছুঁড়ে মারে আউলিয়া। কখনো বা হাতের লাঠি নিয়ে তাড়া করে, তবু শোনে না।

ওরা যে নিরুপায়। জগৎ-জোড়া নিরাকার ভগবানের দরবারে মাথা খুঁড়ে যখন কিছুই হয় না, তখনই আসে আউলিয়ার কাছে।

—বাবা রক্ষে কর!

কার ছেলে পালিয়ে গেছে। কারো বা ছেলে মরমর। কারো বা সোমত্ত মেয়েকে খুঁজে পাচ্ছে না, কারো স্বামী কোথায় অস্থানে-কুস্থানে মদ খেয়ে পড়ে আছে। তাদের হদিস দাও।

আউলিয়া সর্বশক্তিমান। তার পায়ের ধুলোর এত গুণ।

হিঃ হিঃ করে হাসে আউলিয়া।

ছুনিয়ার খবর সে রাখে। কিন্তু তার খবর কেউ রাখে না। নিজের খবর নিজেই জানে না আউলিয়া। শুধু স্বপ্ন। স্বপ্নে কে একজন চেনাচেনা মুখ গল্প ব'লে যায়। কিন্তু কার গল্প, কার কাহিনী বুঝতেই পারে না।

ভগবান, ঈশ্বর, আল্লা। কোথায় সে? বনজঙ্গল, মন্দির-মসজিদ কোথাও তাকে খুঁজে পায় নি আউলিয়া। আকাশের তারাগুলো শুধু হাসে। ফুলের মাঝে কে যেন মুচকি মুচকি হাসে। মানুষের

ঘরে আসে ছোট শিশু। শাঁখ বাজে। উল্লাসে ফেটে পড়ে মানুষ-গুলো আবার মানুষ যখন মরে, তারা কাঁদে। ভগবানকে ডাকে।

মায়ের কান্না মিশে যায় বাতাসে, দূরে,—বহুদূরে ওই আকাশের গায়ে জমে আছে যত কান্না, তারাই ফোঁটা ফোঁটা হ'য়ে বৃষ্টির জলের সঙ্গে ঝরে পড়ে। জমাট মেঘ,—না, না জমাট চোখের জল।

পুজা-আর্চা, নমাজ আর প্রার্থনা, তবু তার মন গলে না।

বিচার করবে ভগবান ?

হ্যাঁ, রামসদয়বাবুর স্ত্রী তাই বলেছিল. বাবা, ভগবান নেই। তা না হলে, আমার চোখের সামনে আমার শ্বশুর-শাশুড়ীকে কুচি কুচি করে কাটে। ভাশুর আর দেওরকে পিছমোড়া করে বেঁধে রেখে কুপিয়ে কুপিয়ে কাটে।

তাদের বাঁচিয়েছিল জব্বার আর জব্বারের মা। মাস্টারী করতেন রামসদয়বাবু। গৌরনগর পাঠশালার মাস্টার। কোথাও কিছু নেই, দুপুর রাতে আল্লা-হো-আকবর! সেদিন ছিল লক্ষ্মীপূর্ণিমা। কোজাগরী লক্ষ্মী। জব্বার নাড়ু খেতে ভালবাসত। কোজাগরী রাতে মিষ্টি-মিঠাই আর নাড়ুর ছড়াছড়ি। মা-লক্ষ্মী আসবেন। উঠোনে আর ঘরে আলপনা, মা লক্ষ্মীর পা। তরু আলপনা এঁকেছিল। সন্ধ্যারাতে তো তারা কোনো কিছুই বুঝতে পারে নি। শুধু জব্বার বলেছিল, শু'নে এলাম শহরে হাঙ্গামা বেধেছে গুরুমা। মারামারি, কাটাকাটি। দোকানপাট লুঠ করছে ; ঘরদুয়ারেও আগুন দিচ্ছে।

হিন্দু আর মুসলমানে দাঙ্গা। আগে তো একথা ভাবে নি তারা। হৈ-হল্লা শুনে জেগেছিল। পাড়ায় আগুন লেগেছে। ডাকাতরা ছুটে আসছে। না, না ডাকাত নয়, এরা কারা ? ছুটে এসেছে জব্বার আর জব্বারের মা। অরু আর তরুকে ছিনিয়ে নিয়ে ছুটল জব্বারের মা। জব্বারের চাচী এসে টেনে হিঁচড়ে নিয়ে চলল রামসদয়বাবুর স্ত্রীকে। কল্যাণী। হ্যাঁ কল্যাণীই তাঁর নাম। কতদিন লুকিয়ে ছিলেন তাঁরা। তারপর এসেছেন এই শহরে। দু'খানা ঘর নিয়ে আছেন রামসদয়বাবু। গায়ে বল ছিল, বই ফেরি

না বইয়েব ক্যান্‌ভাসিং কবেছেন। ভোরবেলা ইস্টিশনের বাজার থেকে পাইকাবী দবে তবি-তবকাবী কিনে কোলেদের হাটে বিক্রী কবতেন। বেশ চলছিল সংসাব।

কিন্তু মানুষ ভাবে এক আর হয়ে যায় আব এক। মাষ্টারি কবতে চেয়েছিলেন বামসদয়বাব। কিন্তু তা জোটেনি। টিউশনি জুটেছিল. কিন্তু তাও টেঁকেনি। বাঙ্গাল-বাঙ্গাল কথা শিখলে ছেলে মানুষ হবে না—মন্তব্য কবেছিলেন ছেলেব বাবা! ছেলেটি ত তাঁব কথা শুনে হেসে লুটোপুটি খেতো!—এতকাল মাষ্টাবি কবেছেন, কেউ একথা কোনো দিন বলেনি। "সইত্য নয় মাষ্টারমশাই, সত্য—সত্‌ত।" উচ্চাবণেব এ কাবচুপি বুঝতে পারেন না রামসদয় বাবু। চিবটা কাল 'বাইক্য'—'সইত্য' উচ্চাবণ কবে এসেছেন। তাঁবই ছেলেবা জেলায় ফাস্ট হয়ে স্কলারশিপ পেয়েছে! ঠেকে আজ শিখলেন বামসদয় বাবু—পূর্ব আব পশ্চিম! তাঁব ইংরেজী উচ্চারণ না কি একেবাবে অচল!

তাই ত ওসব ছেড়ে দিয়ে বইয়েব ক্যানভাসিং ধরেছিলেন বামসদয়বাবু। বেশ চলছিল। তরুটা সেকেণ্ড ক্লাশে উঠেছিল। আর অরু পড়ত ফোর্থ ক্লাশে।

হঠাৎ বাতে ধবল। একমাস ত বিছানা ছেড়ে উঠতে পারেন নি রামসদয়বাবু! সে কি যন্ত্রণা! কল্যাণী যখন তাঁব স্বামীর কথা বলছিলেন তখন মনে হয়েছিল, কল্যাণীই যেন বাতেব যন্ত্রণায় ছটফট কবছেন। পঙ্গু হয়ে গেলেন রামসদয়বাবু! তাঁকে হাত ধ'রে দোর-গোড়ায় একটা টুলের উপর বসিয়ে দিতে হয়। যা কিছু ঘরে ছিল সবই গেছে।

তরু চাকরি পেয়েছে। উদ্বাস্তু মেয়েদের না কি সহজে চাকরি মেলে! কে এক মতিবাবু না কি জুটিয়ে দিয়েছেন। সরকারী চাকরি! তা ব'লে কি যে সে পায়! অপিসের বড়বাবুর না কি খুব ভাল লেগেছে। আগে লজ্জা পেতো তরু! এখন কেমন সেজেগুজে বেরিয়ে যায়। সন্ধ্যার পরও না কি ওভারটাইম খাটতে হয়। বিকেলে

কোনোদিন বাড়ি আসে আবার কোনো দিন আসে না।

মায়ের মনে কত চিন্তা-ভাবনা! তিনি বুঝতেই পারেন না। তরু এমন কি কাজ পেয়েছে। শাড়ির উপর শাড়ি কিনছে তরু। স্নো-পাউডার ঘসে কেমন সেজেগুজে বেরিয়ে যায়। কোনো কোনো দিন রাত বারোটাও হয় ফিরতে।

রামসদয়বাবু খিট্‌খিট্‌ করেন। তবু মুখ ফুটে মেয়েকে কোনো কিছুই জিজ্ঞেস করতে পারেন না। তরু সংসার চালাচ্ছে। কত বয়েসই বা হবে। এই তো একুশে পড়ল। সেকেণ্ড ক্লাশের বিছে নিয়ে মাসে দেড়শো-ছুশো টাকা! রামসদয়বাবু আপন মনে বিড়বিড় করেন। কল্যাণী শুনতে পান। তাঁর চোখে জল ঝরে। কি বলবেন মেয়েকে! অরু পড়াশোনা ছেড়ে দিয়েছে। বড় লক্ষ্মী এই মেয়েটি। কিন্তু তাকে নিয়েও জ্বালা। তুপুর রাতেও জানলার কাছে শিস্‌ দিয়ে যায় কারা!

পাশের দোতলা বাড়ির ছাদ থেকে উঁকি-ঝুঁকি মারে একটি ছেলে।

হিন্দি আর বাংলা গানের খিঁচুড়ি—'প্রাণ টগ্‌বগ করে!' কল্যাণী বকেই চলেন। আর মাঝে মাঝে বলেন, কি হবে বাবা? একটি বিহিত ক'রে দিন্‌। উনি তো কখন কি ক'রে বসেন, তার ঠিক নেই। এদিকে নড়তে চড়তে পারেন না, কিন্তু মুখের ত বিরাম নেই। মেয়েটার কি দোষ বলুন, চা দিতে বেরিয়েছে অরু। সে কি অতশত বোঝে. না জানে। পাশের বাড়ির ছেলেটা রকে বসে শিস্‌ দিচ্ছিল।

কর্তা হঠাৎ খিঁচিয়ে উঠলেন—হারামজাদী মেয়ে! এখন চা দেবার সময় হল! ঠাস্‌ করে মেয়ের গালে বসিয়ে দিলেন চড়!—বলো বাবা, আমি কি করি! কত দিক্‌ সামলে চলব! তরুকে কিছু বলতে সাহস হয় না। আর বলেই কি হবে, এতগুলো পেট চলবে কি করে? কেন ওরা আমার পেটে এসেছিল বাবা! কেন আঁতুড়েই মরে যায় নি। তরু চাকরি করছে! হায়রে ভগবান! কুকুরেরও অধম আমি, তাই মেয়ের পয়সা গিলছি। কুকুরেরও অধম হয়ে গেছি

বাবা! আমবা কুকুব

চোখেব জল মুছছিলেন কল্যাণী, বামসদযবাবব স্ত্রী। মাথায ঘোমটা। সেলাই কবা লালপাড শাডি। কালো বঙেব সূতোর সেলাই। সূতোগুলো যেন বিদ্রূপ কবছে। তাব দেহটাও যেন এমন ক'বে কাপডটাব মতই ফালি ফালি হ'যে গেছে, শুধু কালো সূতোব সেলাইযে টিঁকে আছে। স্বামী পঙ্গু বিকাবগ্রস্ত, আব দুটি মেযে নব আব অরু। পূর্ব বাংলাব কোন এক গৌবনগবে গাছ-গাছালি ঘেবা তাদেব ঘব বাড়ি আজ কোথায? আজ পডে আছেন এক বস্তীব ঘবে। বাবোজাতেব তেবো উঠোনেব ঘব। হিন্দি টপ্পা গাইছে কেউ, কেউ গাইছে ভজন, আবাব দু'একটি ছোক্‌বা সদ্য দেখা সিনেমাব গান গাইছে—। 'আমাব মন কেমন ক'বে।' কলতলায লাইন প'ডে যায, এখানে আব্রু-বেআব্রুব কোনো মানে নেই। মেযেবা কাপড কাচছে, ভিজে কাপডে দাঁডিযে আছে। পাশে দাঁডিযে লুব্ধ জোডা জোডা চোখ! নাস্তি, ক্ষেস্তি, অরু নরু কিংবা বামুনপিসী সবই এখানে একাকাব।

কি কববে আউলিযা? কল্যাণীব দুঃখ ঘোচাবে?—বামসদযবাবুর বাত ভাল ক'বে দিযে তাঁকে চাঙ্গা কবে তুলবে? নরুব সবকাবী চাকবিব হদিস বেব কববে আউলিযা?

হ্যাঁ, আউলিয়া তো কত দেখে। সেদিন কোটপ্যান্ট পবা এক ভদ্রলোক এমনি একটি মেযেকে নিযে টানাটানি কবছিলেন। নদিব ঘাটের নিবালা বনে তাদেব দেখেছিল আউলিযা। মেয়েটি বলছে এবাব ছেড়ে দিন। বাড়ি যাই। দেবি হযে যাচ্ছে। আর তাকে প্রায জড়িয়ে ধ'বে বলেছিলেন, তা কি হয়। কি লাভলি অন্ধকাব নামছে। সুন্দর না? এখন তোমাকে ছাডা যায়?

নিবালা বন! নদীব ধাবে সখেব উদ্যান! হাওয়া খেতে যায় কত জন! জোড়া বেজোড়া ছেলেমেয়েতে কিলবিল কবে সন্ধ্যেবেলাটা কত দিন দেখেছে আউলিয়া! আগে মেম সায়েববাই এসব বাগানে হাওয়া খেতো। এদেশেব লোক এমন লাভলি অন্ধকারে খেলা করতনা।

সায়েব মেম চলে গেছে। দেশের ছেলে মেয়েদের সাহস বেড়ে গেছে।

লাভলি অন্ধকার!—মনে মনে হেসে উঠেছিল আউলিয়া। বড় সুন্দর কথা! অথচ কত ভয়ঙ্কর! রামসদয়বাবুর স্ত্রীর মুখে তার মেয়ে তরুর কথা শুনে কত মুখ আউলিয়ার চোখের সামনে ভেসে উঠল। না, কাউকে তো আউলিয়া চেনে না। আকাশের দিকে ডান হাত তুলে কি যেন বলেছিল আউলিয়া তাতেই কল্যাণী যেন খুশী হয়েছিলেন। আউলিয়ার পায়ের ধূলো মাথায় মেখে তিনি বিদায় নিয়েছিলেন। এমনি কত জন আসে। শুধু কি কল্যাণী? একদিন তরুও এসেছিল! —আমার উপায় কি হবে বাবা!

—না, না, তরু হবে কেন? আউলিয়া কি তরুকে চেনে? না, চেনে না। তবে, তরুর মতনই একটি মেয়ে। সেও চাকরি করে। বড় সাহেবের ভাল লেগেছিল তাকে। হ্যাঁ, ভালই লেগেছিল, চাকরি তিনি দিয়েছিলেন। কি চাকরি? বড় সাহেবের সেক্রেটারী হয়েছিল মেয়েটি। গালভরা কথা! মনে বেশ গর্বই হয়েছিল। ক্লাশ নাইনের বিদ্যে নিয়ে সেক্রেটারী! আর কাজ?—কাজ আবার কি? ঘর-টেবিল গোছগাছ করে রাখতে হবে। যারা দেখা করতে আসবে, সেক্রেটারীর কাছে তাদের আগে নামের স্লিপ দিতে হবে। সেক্রেটারী আনবে হুকুম। বড় সাহেব!—কার্ এণ্ড্ চৌধুরী কোম্পানীর ডাইরেক্টার কুণাল চৌধুরী।

বড় সহজ কাজ!—আর কি কাজ?—বড় সাহেব তাকে মিস্ সিন্‌হা বলে ডাকেন। সুন্দর সুপুরুষ, কিন্তু মিস্ সিন্‌হার বাপের বয়সীই হবেন। লজ্জা পেতো তরু! ভয়ও পেতো; সে ভয় ভাঙ্গিয়ে দিলেন মিস্ মল্লিক। মিস্ হলে কি হয়, বয়সটা প্রায় বড় সাহেবেরই মতো। তিনি যখন-তখন এসে গল্পগুজব লাগিয়ে দিতেন। বড় কর্তার নাম জানত না তরু। মিস্ মল্লিকের মুখেই তার নাম প্রথম জানতে পারল। মিস্ মল্লিক বড় কর্তাকে নাম ধ'রেই একদিন ঠাট্টা রসিকতা করছিলেন,—বেশ বাগিয়েছো কুণাল। এমন তাজা মাল জোটালে কোত্থেকে। বাইরে তার সীটে বসে ঘেমে

উঠেছিল তরু! চোখ-মুখ তার রাঙা হ'য়ে উঠেছিল। কিন্তু এ আর বেশি দিন থাকে নি। ফাঁদে পড়েছিল তরু। শাড়ি ব্লাউজ আর টাকা,—ঘরে পঙ্গু বাপ, অক্ষম মা, আর একটি বোন। পাশের বাড়ির সেই বকাটে ছোক্‌রা অসীম!—নিস্তার নেই! বরং টাকা জমিয়ে বাপ-মা আব বোন্‌কে নিয়ে একটা ফ্ল্যাটে চলে যাবে তরু।

তরুর স্বপ্ন ভেঙ্গে গেল। তরুর ডিপার্টমেণ্ট বদলে গেল। তার জায়গায় এল আর একটি মেয়ে। মিং কুণাল চৌধুবী তরুকে কিছুদিন বিশ্রাম নিতে উপদেশ দিলেন। কিন্তু মতিবাবু বলেছিল, তোমাব সব ভারই নেবেন তিনি। ওব বয়স বেশি হ'লেই বা। ক্ষতি কি! আরামে থাকবে। চাকরিও আর করতে হবে না। কিন্তু কোথায় কি? কুণাল ছুটি নিয়েছেন। তিনি নাকি বাইবে কোথায় চলে গেছেন।--এদিকে যে সর্বনাশ।

আউলিয়া দেখে—মাহতে চলেছে মেয়েটি!

চীৎকার কবে উঠল আউলিয়া—ইয়া আল্লা! ইয়া আল্লা! তুনিয়া কা মালেক!

কাঁদছে মেয়েটি, কাঁদছে। আবাব সেই অন্ধকার,–সেই লাভলি অন্ধকাব! কিন্তু এখানে সে নিবালা বন নেই! মেয়েটির চোখে-মুখেও হাসি নেই; স্নো-পাউডাব ধুয়ে মুছে গেছে!—কালি! যেন কালিব ছোপ পড়েছে মুখে-গালে।

বাবা! আমাকে বাঁচাও'—কাঁদছে মেয়েটি।

সাদি করো ব্যাটা! এই লেড়কীকে তুমি সাদি করো।—আউলিয়ার সামনে দাঁড়িয়ে আছে আর একজন,- নাম তার হিমাদ্রি। হিমাদ্রি ডাক্তার,—আউলিয়ার কাছে মাঝে মাঝে আসে। তরুরা যখন উদ্বাস্তু হয়ে আসে, তখন হিমাদ্রি এই শহরেই থাকত। সবে মাত্র ডাক্তারী পাশ করেছে। দেশ থেকে খবর এল দাঙ্গার। দেশ বিভাগ হয়েছে; স্বাধীন হয়ে গেছে দেশ; কিন্তু তার বাবা আর মা নেই। দেশে ফেরে নি হিমাদ্রি। আর কে-ই বা তার আছে। হিমাংশু মিশনারীদের দলে নাম লিখিয়েছে; যেখানেই আর্ত মানুষের

ডাক আসে, সেখানেই ছোটে হিমাদ্রি ডাক্তার।

হিমাদ্রি তরুকে জানে না, চেনে না। সে শুধু দেখে একটি মেয়ে আউলিয়ার সামনে বসে অঝোরে কাঁদছে। আউলিয়ার কথা শুনে হকচকিয়ে ওঠে হিমাদ্রি---কি বলছো বাবা!

আউলিয়া অনুনয় করছে—ভ্যাখ্ বাবা! ওটি আমার একটি মা। মা হতে চলেছে। এর আর কোন উপায় নেই। তুমি যদি সাদি করো, সব ল্যাটা চুকে যাবে।

হিমাদ্রি ডাক্তার কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে কি যেন ভাবল। তারপর বললে,—কিন্তু এর তো কোনো বৃত্তান্তই আমি জানিনে বাবা!

—কোনো কিছুই জানতে হবে না। কি বেটী রাজী?—তরুকে হাত ধ'রে ওঠায় আউলিয়া। তরুর চোখে জল ঝরছে, --আমার মা, আর বাবা?

আউলিয়া বলে,—সব ঠিক আছে বেটী! কোনো ভয় নেই। আমার হিমাদ্রি বাবা সব ভার নেবে।

হিমাদ্রির হাতে তরুর হাত তুলে দেয় আউলিয়া! হতভম্ব হিমাদ্রি আর কোন কথাই বলতে পারে না!

—যা ব্যাটা, বেটীর ডেরায় ওর মা-বাবার কাছে চলে যা!

হিমাদ্রি তরুর হাত ধ'রে অন্ধকারে মিলিয়ে গিয়েছিল। আর আউলিয়া হেসে হেসে আওড়াচ্ছিল,—কি লাভ্লি অন্ধকার!

হিমাদ্রি আর তরুর জীবনের আলো-অন্ধকারের যবনিকা খুলে দেখে নি আউলিয়া। আর কোনো দিন তারা হয়ত তার কাছে ফিরেও আসবে না। রামসদয়বাবু আর কল্যাণীর জীবনের সমস্যা মিটে গিয়েছিল কি না জানে না সে। নবজন্ম!—তরুর নবজন্ম দিয়েছে আউলিয়া।

জন্ম দিয়েই তো বাপ-মা খালাস। হ্যাঁ, কিছুদিন দিনরাত আগলে

থাকে বটে। কত মায়া, কত মমতা! ছেলে-মেয়ে বড় হয়। কেউ বা অকালে ঝরে পড়ে। বাপ-মা কাঁদে। ছেলেদের মানুষও করে বাপ-মা। কিন্তু তারা সকলেই কি বাপ মায়ের মনের মতন গড়ে ওঠে! মায়া মমতা দিয়ে কি ছেলেমেয়েকে আগলে থাকতে পারে?

নিজেরাই খ'সে পড়ে। আর বেঁচে থাকলেও মমতার আগল দিয়ে কতটুকু আগলে রাখতে পারে? নদীর স্রোত কি বাঁধ মানে? আপন মনে খুশীমত চলাব দিন এক দিন আসেই! রামসদয়বাবু কি তাঁর মেয়েদের আগলে রাখতে পেরেছিলেন?

না,—কেউ তা পারে না। স্রোতের ঘূর্ণি। ঘূর্ণিতে পড়ে হাবুডুবু খাচ্ছে মানুষ। বাড়ছে, ফুটে উঠছে: হাসছে কাঁদছে। আবার দীপও নিভে যাচ্ছে। হাজার মোমবাতি জ্বেলেও সে অন্ধকার ঘুচবে না। হিমাদ্রি আর তরু,—হয়ত সংসার বাঁধবে। সুখী হবে কি না বলা যায় না! কিন্তু তরু কি অপরাধ করেছে? লোভ লালসা আর আরামে থাকার লোভ কার না হয়? লেখাপড়া করছে ছেলেরা;—তা আরামে থাকবার জন্যেই।

মেয়ে আর পুরুষ!—চুম্বকের আকর্ষণ! কি দোষ তাতে? সমাজ আর শাসন। শৃঙ্খলা থাকে না? কিন্তু মানুষগুলো নিজেরাই তা ভাঙছে। নিজেরাই অপরাধ ক'রে বসছে। পরকে শাসন করবে কি? কুণাল চৌধুরী তো দিব্বি পার পেয়ে গেল। মতিবাবুর আব দেখা নেই। তরু করবে কি? মরবে? আত্মহত্যা করবে? কি অপরাধ করেছে মেয়েটি?

হিমাদ্রি কি তাকে নিয়ে সুখী হবে?—এত ভেবে লাভ কি? কালের চাকা চলবেই। ভেবেচিন্তে তার কুলকিনারা মিলবে না। আউলিয়ার পেছনে যে লাভলি অন্ধকার! এ অন্ধকার যে কিছুতেই ঘুচবে না।

সিদ্ধপুরুষ আউলিয়া! নিজেকে ভুলে গেছে। ভুলে যাওয়ার নামই কি সিদ্ধি! পাগল!—পাগল!—আউলিয়া নিশ্চয়ই পাগল।

পাশ নয়, সবই ফাঁস! সবই মায়ার পাশ!

আউলিয়ার মনেও মায়ার পাশ। তা না হলে, ওদের চোখের জল দেখলে তার ভেতরটা উথলে ওঠে কেন? এই তরু, অরু আর কল্যাণী, কত মেয়ে দেখল আউলিয়া। তাদের দুঃখের কথা শুনল কিন্তু তার দুঃখের কথা কে শুনবে? নিজের দুঃখের কথা কিছু আছে কি?

না, কিছুই নেই! সত্যি কি কিছুই নেই? পেছনে ফেলে-আসা দিনগুলো অন্ধকারে ঢেকে গেছে। আজ সে আউলিয়া।—কে তাকে বুঝবে? কিন্তু তার মনেও লুকিয়ে রয়েছে ওদের মতই একটি মানুষ। বড় বড় চোখ ক'রে পেছনের দিকে ফিরে তাকায় আউলিয়া! তারপর বিড়বিড় করে ওঠে,—নাঃ, কিছুই নেই। ওই যে, ওই যে, শুধু ছায়াছবির মতো ভাসছে; কে এক পাগল ছুটে ছুটে যাচ্ছে। আর যেন চীৎকার ক'রে বলছে, নেই, নেই, সব হারিয়ে গেছে।

পাহাড় পর্বত ডিঙ্গিয়ে চলেছে সেই পাগল। কার খোঁজে কে জানে? ছুটছে তো ছুটছেই। পেয়েছে কি? যা চায় সে পেয়েছে কি? পায়ের আঙুলের উপর ভর করে উঁচু হ'য়ে তাকায় আউলিয়া।

দেখছে আউলিয়া—

আকাশের গায়ে কোনো কিছু নেই, নবপল্লীর সেই সাদা বাড়িটার ছাদটা দেখা যাচ্ছে। তার উপর দিয়ে উড়ে যাচ্ছে দুটো পাখি,—চিলই হবে। ওই যে বিন্দুর মত আকাশের গায়ে মিলিয়ে যাচ্ছে।

বড় চেনা একটি মুখ ভেসে ওঠে আকাশের গায়। পাহাড়ী মেয়ে রাতাবী। দু'দিনের পরিচয়; তবু কত যেন আপন জন। আজ সে কোথায়? এমন ক'রে দুনিয়ায় কেউ তাকে আপন ক'রে নিতে পারেনি।

হঠাৎ চমকে ওঠে আউলিয়া। না, না, সবই তো স্বপ্ন! রাতাবীও একটা স্বপ্ন! তবে কি স্বপ্নের মায়াজাল কাটাতে পারেনি আউলিয়া। তার মনে হল,—চিরটা কাল এমন চুলদাড়িওয়ালা আউলিয়া সে ছিল না। কিন্তু কেন এমন হ'ল তার হদিস্ও পায় না।

চুল দাড়ি টেনে টেনে দেখে আউলিয়া।

কতদিন?—কতদিন কেটে গেছে? যত সব আজগুবি কাণ্ড!

সে কি ঘুমিয়ে ছিল? কুম্ভকর্ণের নিদ্রাভঙ্গ হয়েছে! রাবণের রাজপুরী যে আজ শূন্য!

ইংরেজ চলে গেছে। ওরা বলে দেশ স্বাধীন হয়ে গেছে। দেশের লোকের হাতে এসেছে শাসনের ভার। মন্ত্রী উপমন্ত্রী,—আর বিধান-সভা, লোকসভা! লাটের বদলে রাজ্যপাল!—কিন্তু সবই তো ঠিক রয়ে গেছে। কি যে বদল হয়েছে, আউলিয়া বুঝতে পারে না!

শুধু ইস্টিশনে, ইস্টিশনে ঝুপড়ি বেঁধে রয়েছে একপাল মানুষ। শহরের বড় রাস্তার ধারে যে পার্কগুলো রয়েছে; তারও পাশে মানুষ বেঁধেছে বাসা। এই কি জীবন? এই কি বেঁচে থাকা?

রাস্তায় রাস্তায় ভিখারী বসে। আর ওই ঝুপড়িগুলোর বাসিন্দা লোকগুলো মানুষ না জন্তু জানোয়ার! কেউ ওদের দিকে তাকায় না। এভাবে ওরা থাকে কি ক'রে? তাদের বাচ্চাগুলো রাস্তার ধারে বসে খেলা করে। রাস্তার ওপরেই উনুন পেতে রান্না চড়িয়েছে কেউ। খিঁচুড়ির মতন ও কি একটা পদার্থ গিলছে দু'তিনজনে একই থালা থেকে,—একটি আধবয়সী মেয়েছেলে আর দু'তিনটা বাচ্চা।

উদ্বাস্তু এরা,—দেশঘর ছেড়ে এসেছে।

তাদের বাড়িঘর, মাঠ ঘাঠ, পুকুর, হাটবাজার আজ কোথায়? পুকুরে হাঁস চরে বেড়াচ্ছে; বিলের ধারে বকপাখি বসে আছে। মাঠে ঘুরে বেড়াচ্ছে গোরু আর ছাগল। মালিকানা পালটে গেছে!

চোখের জল ফেলেছিলেন কল্যাণী!—পিতৃপুরুষের ভিটে। রক্তে রক্তারক্তি হয়ে গেছে। মায়ের কোল থেকে ছিনিয়ে নিয়ে গিয়ে আছড়ে মেরেছে কোলের ছেলেকে। ঘরে শেকল তুলে দিয়ে আগুন দিয়েছে; পুড়ে মরেছে মানুষ। তবু এরা বেঁচে আছে।

মোটর হাঁকিয়ে যাচ্ছে কতজন। বড় বড় বাড়ি উঠছে; ব্যবসা বাণিজ্য সবই চলছে। চলছে উৎসব,—বিবাহ, অন্নপ্রাশন আরো কত কি উৎসব। বছরে দু'বার করে স্বাধীন হয়ে যাবার উৎসব হচ্ছে।

আরো কিছু বদলেছে দেখতে পায় আউলিয়া। রাস্তায় রাস্তায়

সিনেমা হাউস। চালের লাইন আর সিনেমার টিকিট কেনার লাইন। বাঃ, বাঃ, সিনেমারস্টারকে দেখবার জন্য লোকের ভিড়। নতুন কথা—সিনেমা-স্টার,-চিত্রতারকা। একটা বড় পণ্ডিত মরলে লোক দেখতে যায়না, কিন্তু চিত্রতারকাকে দেখবাব জন্য এত ভিড়। পুলিশ এসে ঠেঙিয়ে দেয়! তবু নাছোড়বান্দা!

আউলিয়া সেই আউলিযাই থেকে গেল!

এরা কেউ তাকে চেনে না। কেউ জানে না আউলিয়ার পরিচয়। তাদের কাছে আউলিয়া মানুষই নয়। তবু যেন তারা আউলিয়াকে ভয় করে। ভয় করে আউলিয়াকে! কেন? না নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির জন্য! ওরা বিশ্বাস ক'রে, আউলিয়া হয় কে নয় করতে পারে।

হাঃ হাঃ হাঃ—বিকট হাসি হাসে আউলিয়া।

গাছের পাখিগুলো যেন ভয়ে ডানার ঝটাপট শব্দ করে ওঠে। এ ডাল থেকে ও ডালে দু'একটা উড়ে চলে যায়।

স্বপ্নরাজ্যের গল্প বলে যে ছায়ামূর্তি, তার গল্প বলা যে শেষ হয় নি! কি আশ্চর্য! আউলিয়া দেখেছে, আগে যে মূর্তিটা ছিল নিতান্ত ছেলে মানুষ। গল্প বলার সঙ্গে সঙ্গে তারও বয়েস বেড়ে চলেছে। কিশোর তারপর যুবক! তার চেহারায় এসেছে পরিবর্ত্তন! কেমন যেন পাগল পাগল ভাব। বুড়ো হয়ে গেছে যেন। কখন যে আবার এসে সে আউলিয়ার ঘাড়ে চাপবে তার ঠিক ঠিকানা নেই!

বাতাবীর কথা তো সে কোনোদিন বলে নি! আর বলবেই বা কি ক'রে? সে তো তার নিজের জানা এক গল্প বলে চলেছে। বাতাবী!—মনে পড়ে সেই পাহাড়ী মেয়েটাকে।

কত দেশ ঘুরে বেড়িয়েছে আউলিয়া! কত রকমের মানুষ দেখেছে। রামের দেশ অযোধ্যা আর অর্জুনের দেশ ইন্দ্রপ্রস্থ দেখেছে, —দিল্লী! হাসিও পায়! মহাপ্রস্থানের পথে এগিয়ে গিয়েও ফিরে এসেছে আউলিয়া। তখন সে পাগলা রজব।

হিমালয়ের গা বেয়ে বেয়ে চড়াই উতরাই ভেঙে ভেঙে কতদূর যে গিয়েছিল, তা সঠিক জানে না। ঢেউয়ের উপর ঢেউ,—মায়াব ওপর মায়া! সে যে কি দৈবী আকর্ষণ! নীচে গহীন খাদ, পা পিছলে গেলেই পাতালে চলে যেতে হবে।

অজানা কত সব গাছপালা,—ঘন সবুজের রাজ্য ডিঙিয়ে চলেছে নীরেট কালো পাথরের রাজ্যে। তারপর সব সাদা,—তুষারশুভ্র হিমালয়। শাঁখ বাজছে,—শত শত শাঁখ! এখনো যেন কানে লেগে রয়েছে সে আওয়াজ!

কেন গিয়েছিল? কি ক'রে গিয়েছিল, আজ তাব কিছুই মনে পড়ে না। শুধু মনে পড়ে, কি যেন এক হাহাকার আজো তার বুকের মাঝে ঢেউ তুলছে, কাউকে যেন খুঁজে বেড়াচ্ছে আউলিয়া।

সে খোঁজা আজো শেষ হয় নি। পাগলের মত রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়িয়েছে। যে দিকে চোখ যায়, ছুটে চলেছে। খাওয়া দাওয়া আর ঘুম? কিছুই মনে ছিল না।

হ্যাঁ, মনে পড়ে, কেউ কেউ ভিখারী মনে করে চালও দিয়েছে, পয়সাও দিয়েছে। তারপর চুলদাড়ি এমন ক'রে লম্বা হয়ে গেছে। কেউ মনে করেছে পাগল,—কেউ মনে করেছে সাধু। কাপড়-চোপড়েরও ঠিক ছিল না।

কেউ বা কাপড় দিয়েছে। জামা-কম্বলও দিয়েছে কেউ। খিদে পেলে দুপুর বেলা কারো দুয়ারে গিয়ে দাঁড়িয়েছে। কেউ বা দয়া করে খেতে দিয়েছে, কেউ বা খেতে দেয় নি। কতদিন উপোস করে কাটিয়েছে তার ঠিক-ঠিকানা নেই।

ছেলেরা ঢিল ছুঁড়ে মেরেছে। 'পাগল' বলে কেউ বা ক্ষেপিয়ে তুলতে চেয়েছে। কিন্তু কিছুতেই কিছু হয় নি। সে শুধু এগিয়ে চলেছে দিনের পর দিন। কত শহর, কত গাঁ আর কত রকমের মানুষ। তাদের কথাবার্তাও বুঝতে পারত না। আর তার কথাও কেউ বুঝতে পারত না। গয়া, কাশী হয়ে দিল্লী পৌঁছাল সেই পাগল।

সেখানে একদল সাধুর সঙ্গে মিশে গিয়ে অমরনাথের পথে যাত্রা

শুরু হল। সাধুদের ফাইফরমাস খাটে, তাদের কম্বল-বিছানা কাঁধে নিয়ে চলেছে পাগলা রজব।

হিন্দু কি মুসলমান কেউ জিজ্ঞেসও করে না। সে নিজেই জানে না, সে হিন্দু কি মুসলমান! কিছুই মনে পড়ে না। সাধুরা জিজ্ঞেস করলে কি উত্তর দেবে?

কিন্তু সে রকম কোনো কিছুই ঘটল না। নাগা সন্ন্যাসী এরা। দল বেঁধে ঘুরে বেড়ায় তীর্থে তীর্থে। প্রয়াগে মাঘমেলায় গিয়েছিল। এখন চলেছে অমরনাথে।

নাঙ্গা সাধু! কোনো বাচবিচার নেই। ভগবানের নাম করে ব'লে তো মনেই হয় না। যেখানেই যায়, মাড়োয়ারী শেঠেরা ভোজের আয়োজন করে।

হর-হর ব্যোম্-ব্যোম্ ক'রে ভোগ লাগায় সন্ন্যাসীর দল।

ব্যাটা, তুমকো আভি নাঙ্গা কোবে লেয়েঙ্গে।—ভাঙ্গা ভাঙ্গা হিন্দিতে বলে ওঠে এক বড়ো সাধু। আউলিয়াও হিন্দি বাংলা মিশিয়ে উত্তর দিতে চেষ্টা করে। কিন্তু ওদের সঙ্গ তার ভাল লাগে না। এমন সাধুগিরিতে তাব কাজ নেই। পাহাড়ী পথে ছিটকে সে বেরিয়ে পড়ল।

সামনে শুধু পাহাড়ের ঢেউ। আর নীচে ছবির মত লাগছে, -মানুষের আবাস—পৃথিবী। যেন পাহাড় আর পৃথিবী—এ দুই আলাদা,—স্বর্গ আর মর্ত্য! একদিকে মায়া আর অন্য দিকে মুক্তি। নীচের দিকে তাকিয়ে দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলেছিল সেদিন। না, স্বর্গটা সে একবার দেখেই আসবে!

যমুনোত্রীর পথে এক সাধুব আশ্রমে সে কয়েক দিন কাটিয়েছিল। ভস্মমাখা দেহ। কৌপীনমাত্র সাব। ছোট্ট গুহা,—গুহায়ই তাঁর আবাস। পাইন আর ঝাউ জাতীয় গাছ রয়েছে এপাশে-ওপাশে।

গুহার সামনে আগুনের চুল্লি,—ধুনি জেলে বসে রয়েছেন সাধুবাবা।—আশ্চর্য ভাবেই এই সাধুজীর আশ্রমে স্থান পেয়েছিল পাগলা রজব।

নিজের অতীত ভুলে গেছে। শুধু মনে আছে সে যেন কারো খোঁজে বেরিয়েছে। কিন্তু কার খোঁজে তাও জানে না। নিজেকেই যেন নিজের মাঝে খুঁজে বেড়াচ্ছে। যেদিকে চোখ যায়, সেদিকেই দেখে কে যেন হাতছানি দিয়ে তাকে ডাকছে।

কোথায় তার বাড়িঘব, কে ছিল তার আপন, কে-ই বা পব, কোনো কিছুই জ্ঞান নেই। মনে আছে সে শুধু জেলে ছিল; অনেক কয়েদীর সঙ্গে বদ্ধ ছিল সে। উঁচু পাঁচিলের বাইরে তার দৃষ্টি যেতো না। হাতে-পায়ে বেড়ী পরিয়ে তারা দিনের পর দিন তাকে বেখে দিয়েছিল।

মেবেছে।—মেরেছেও খুব। গায়ে-পিঠে চাবুক মেরেছে। মাটিতে ফেলে চেপে ধবে মুখে ওষুধের মত কি যেন ঢেলে দিয়েছে। চীৎকাব কবে কাঁদলেও শুনত না তারা।

জেল!—জেলখানা! যমদূতের মত ওয়ার্ডারগুলো দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে গাল পাড়ত। তাকে তালাবন্ধ করে রেখেছিল অনেকদিন। অনেকদিন কারো সঙ্গে মিশতেও দিতো না।

নারকেলের ছোবড়া হাত দিয়ে ছাড়িয়ে তুলোর মত কুচিকুচি করতে হ'ত। হাতের ছাল-চামড়া উঠে গিয়ে দগ্‌দগে ঘা হয়ে গিয়েছিল। ঘানি টানিয়েছে ওরা। গোরুর মত পিঠে চাবুক মেরেছে।

পাগল! পাগল!—পাগল বলেই ডাকত ওয়ার্ডারগুলো। তারাই নাম দিয়েছিল পাগলা রজব।

সত্যিই কি সে পাগল হ'য়ে গিয়েছিল? আর কেনই বা সে জেলে গিয়েছিল; তার কোনো কিছুই আজ ভেবে ঠিক করতে পাবে না। সে তো কোনো দিন চুরি ডাকাতি করে নি।

তাহলে কেন তার জেল হয়েছিল?

হ্যাঁ, সত্যি তো একদিন তার কোমরে দড়ি বেঁধে আর হাতে হ্যাণ্ডকাপ পরিয়ে কয়েকটা লালপাগড়ি পুলিস তাকে টেনে হেঁচড়ে নিয়ে গিয়েছিল।

খুনী!—খুনের আসামী!

পথের ধারের লোকগুলো তার দিকে তাকিয়ে যেন ঘৃণায় মুখ সরিয়ে নিয়েছিল। কেউ বা গালাগালও পাড়ছিল !

খুনী !—মানুষ খুন করেছে ! চোর নয়, ডাকাত নয়। খুনী !

সবই স্বপ্ন।—সবই স্মৃতির পর্দায় এলোমেলো হ'য়ে ভেসে ওঠে।

হিমালয়ের পথ ভাঙে আর এলোমেলো চিন্তায় বিভোর থাকে ! সেই পাগল। চড়াই উতরাই ভাঙতে ভাঙতে পা আর চলে না। ফেঁটে গিয়ে, ছড়ে গিয়ে রক্ত বেরিয়ে আসছে। বাঁ-পায়ের বুড়ো আঙুলটা ফুলে উঠেছে। তবু চলতে হবে।

পাহাড়ী মানুষ আর পথের যাত্রী সকলেই চলেছে তাদের গন্তব্য পথে। গঙ্গোত্রী আর যমুনোত্রীর যাত্রীও রয়েছে দু'একজন। যে যার পথে আপন মনেই চলেছে।

খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে চলেছে সে। নাগা সাধুদের সঙ্গে থাকতে থাকতে সে গায়ে ভস্মমাখা শিখেছে। কিন্তু তাদের মত নাঙ্গা হতে পারে নি। মালকোঁচা দিয়ে ছোট-খাটো ধুতি পরেছে। কাঁধের উপর একখানি কম্বল। মাঝে মাঝে পাথরের উপর বসে পড়ে। আবার লাঠি ভর ক'রে উঠে দাঁড়ায়।

তাকে সাধু মনে করে দু'একজন পথযাত্রী আধকাঁচা রুটি কিংবা পুরিও দু'চারখানা ক'রে দিয়ে যায়। এই ক'রেই তো চার দিন কেটে গেল। পাথরের উপর বসে সে বিশ্রাম করছিল, অসহ্য ক্ষিদে আর পায়েব যন্ত্রণা ! মনে হচ্ছিল, এখানেই যেন তার যাত্রা শেষ হবে।

দূরে নেচে নেচে চলেছে জলস্রোত ; পাথরের পর পাথরে ঝাঁপিয়ে ঝাঁপিয়ে চলেছে, উজ্জ্বল ফেণায় রোদের ঝিলিক। কিন্তু তার ওঠবার শক্তি নেই। পেয়েছে দারুণ পিপাসা।

বিধাতারই দান ! এলো এক গাড়োয়ালী মেয়ে। মুখে তার হাসি যেন ফেটে বেরোচ্ছে। মেয়েটি কাছে আসতেই সে মুখে হাত রেখে তার পিপাসার কথা বোঝাতে চাইল।

হেসে উঠল মেয়েটি। তার মাথায় ছিল দুধের কলসী। তার কলসী নামিয়ে একঘটি দুধই তাকে খেতে দিল। তারপর মেয়েটি

চলে গেল। আবার খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে কিছু দূর এগিয়ে গেল সে। একদল যাত্রীর সঙ্গে তার দেখাও হ'ল।

তারা কলকাতা থেকে এসেছে। পাহাড়ে ওঠার জুতো, গরম জামা-প্যাণ্ট ও পিঠে বাঁধা ব্যাগ। হাতে তাদের লাঠি। কোনো কিছুরই তাদেব অভাব নেই। কেউ সিগারেট টানছে; কেউ মুঠো মুঠো বাদাম-পেস্তা চিবোতে চিবোতে চলেছে। চটিতে গিয়ে উঠবে তারা। চটি নাকি এখান থেকে তিন মাইল।

তাদেরই একজন বললে—কি ক'রে তুমি ওখানে পৌছাবে সাধুজী! ফিরে যাও। পায়ে জুতো নেই; এরকম খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে কি চলতে পারবে।

আহা-উহু করল বা কেউ। কিন্তু তাবা চলে গেল। অনেক কষ্টে কিছুদূর এগিয়ে গিয়ে সে একটা পাথরের ওপর বসে পডল। এমনি ক্লান্ত হয়ে পডেছিল যে, সে ঘুমিয়ে পড়ল! কোনো খেয়ালই নেই; এদিকে যে বেলা পড়ে যাচ্ছে! হঠাৎ কে যেন তার ঘুম ভাঙিয়ে দিলে।

হেই!—তার গায়ে কে যেন আস্তে আস্তে ঝাঁকুনি দিলে।

চোখ চেয়ে দেখে সূর্য ডুবে যাচ্ছে। লালচে আভা পড়েছে পাইন গাছের পাতায় পাতায়। পাহাড়ী বনপথ। রাত্রি নেমে আসবে। আর রক্ষে নেই।

হিঃ হিঃ ক'রে হাসছে এক পাগলী। গাড়োয়ালী কি কোন্ জাতের হবে কে জানে। পোশাকে আশাকে কিছুই বোঝবার জো নেই। বগলদাবায় একটা পোটলা। আর একহাতে একখানা আখ চিবোতে চিবোতে এগিয়ে চলল পাথর ভেঙে।

সোজা রাস্তাটা ছেড়ে দিয়ে অন্য পথে চলেছে পাগলী। রজব ভাবে তা হ'লে নিশ্চয়ই কাছেপিঠে কোনো লোকবসতি আছে। পাগলীর পিছু নেওয়া ছাড়া আর ত কোনো উপায় নেই। পাগলীর পিছু পিছু ছুটল আউলিয়া। গায়ে বল ছিল, এখনকার মত অত চুলদাড়িও হয় নি। এখন সবই পেকে পিঙলে হয়ে গেছে। তখন ছিল ঘোর কালো।

দৈবই পথ দেখিয়ে নিয়ে চলেছে! দেবতাত্মা হিমালয়। মনে মনে প্রণাম জানায় আউলিয়া।

মানবী নয়, নিশ্চয়ই এই পাগলী হিমালয়-কন্যা কোনো দেবী। পাগলীর ছদ্মবেশেই দেখা দিয়েছেন!

কিন্তু কোথায়? পাগলী ছুটছে তো ছুটছেই; মাঝে মাঝে ঘাড় ফিরিয়ে দেখছেও। বড় বড় পাথর ডিঙিয়ে চলেছে। কখনো বা পাথরে আড়াল পড়ে যায়। সূর্যের লাল রশ্মিটা মাঝে মাঝে পাগলীর মুখে পড়ে। মনে হয়,—পটের ছবি।

পাথরের উপর পা ফেলে চলেছে আউলিয়া। পা পিছলে গেলেই বিপদ। পাগলীটা কেমন যেন নেচে নেচেই চলে যাচ্ছে। ঐ,—ঐ, ঐ যে। আবার আড়াল হয়ে পড়ে। একি? পাহাড়ী নালা নেমে যাচ্ছে। ঝির্‌ঝির্ করে জলও বইছে। পার হয়ে গেল পাগলী। তার পিছু পিছু আউলিয়াও পার হয়ে গেল। ওপারে উঠেই ছুটছে,—কাছেই পাহাড়ের পর পাহাড়। সূর্য ডুবে গেল। আর পাহাড়ের গায়ে আলোর বিন্দু যেন চিক্‌চিক্ করছে। ঐখানেই কোথায় যেন পাগলীটা মিলিয়ে গেল। কিছুদূর এগিয়ে গিয়ে আউলিয়া দেখে আগুন জ্বলছে!

আরো এগিয়ে গেল আউলিয়া। হ্যাঁ, সত্যিই আগুন। গুহার মুখে ধুনি জ্বালিয়ে বসে আছেন এক সাধু। কিন্তু কোথায় পাগলী?

আউলিয়ার দিকে চোখ তুলে তাকালেন সাধুজী। তাঁর চোখে প্রসন্ন দৃষ্টি। ইঙ্গিতে তাকে বসতে বললেন। তারপর বললেন,—এসেছিস্ বাবা! পথ হারিয়ে এসেছিস্। ভালই হ'ল।

সাধুজী যেন তারই অপেক্ষায় ছিলেন। তাঁর কথা শুনে মুগ্ধ হয়ে গেল আউলিয়া। না, না, আউলিয়া নয়। তখনো তাকে কেউ আউলিয়া নাম দেয় নি। সবাই ডাকত পাগলা রজব।

সাধুজী বললেন,—আমার পাগলী মাকে দেখেই বুঝেছি, আজও কেউ বিপদে পড়েছে। নিজেই যেতাম, কিন্তু পাগলী-মাই

বারণ করলে। তাতেই বুঝেছি, তুই নিজেই আসতে পারবি।

আশ্চর্য হয়ে যায় পাগলা রজব। এঁরা কি অন্তর্যামী? সাধুর কথায় কেমন যেন স্নেহ ঝরে পড়ে। কেউ তো এমন ক'রে অনেকদিন তার সঙ্গে কথা বলেনি।

কত সাধু দেখেছে। যেমন কাঠখোট্টা দেখতে, তেমনি তাদের কথাবার্তা। কেউ বা মৌনী, কথাও বলেন না। কেউ বা রাজসিক ভোগে ভোগী। মিষ্টি কথায় হুকুম চালান। এই হিমালয়ের পথেই সিল্কের গদিমোড়া আসনে দু'একজন সাধুকে বসে থাকতে দেখেছে। সাধু মহারাজ কা কুঠি,—সিল্কের পর্দা ঝুলছে। সেবিকারা দরজা আগলাচ্ছেন।

সাধু বললেন,—বিশ্রাম করো ব্যাটা। ওই কোণে একটা ডিবায় দাওয়াই আছে। পায়ে লাগাও সব দরদ ঠাণ্ডা হ'য়ে যাবে।

বাংলায়ই কথা বলছিলেন সাধুজী। তিনি বাঙালী কি অন্যদেশের লোক আউলিয়া তা বুঝতে পারে নি। মাঝে মাঝে হিন্দুস্তানীদের মতো তার বাংলা কথা জড়িয়ে যাচ্ছিল।

আজো মনে পড়ে তাঁর কথা। আউলিয়াকে চা খাওয়ালেন। তাঁর দেওয়া দাওয়াইটা লাগিয়ে আরামও পেল। গুহার ভেতর একটা জায়গা দেখিয়ে দিয়ে তাকে বিশ্রাম করতে বললেন। দু'খানা কম্বলও দিলেন।

আউলিয়ার তখন জোয়ান বয়েস। তবুও ক্লান্তিতে ঢুলে পড়ছে। ধুনির আগুনে সাধুজীকে ছাড়া আর কিছুই দেখা যাচ্ছে না। চারদিকে নিটোল অন্ধকার। তার মাঝেও যেন জলের গর্জন শোনা যাচ্ছে। পাথর ডিঙিয়ে চলেছে জলস্রোত ফোস্ ফোস্ হিস্ হিস্ শব্দ।

আউলিয়া পাথরের উপর গায়ে কম্বল জড়িয়ে বসে এক দৃষ্টে তাকিয়ে রইল সাধুজীর দিকে। কিন্তু সাধুজী নিজের কাজেই ব্যস্ত। তিনি যে লোটা, ঘটি ও জল নিয়ে নাড়াছাড়া করছেন, তা সে বুঝতে পারছিল। কিন্তু তন্দ্রায় পেয়ে বসেছে। তন্দ্রার সঙ্গে চিন্তা।

এই তো মহাপ্রস্থানের পথ। এ পথেই স্বর্গে গিয়েছিলেন পাণ্ডবেরা। সঙ্গে দ্রৌপদীও ছিলেন। কিন্তু পথে যেতে যেতে পড়ে গেলেন দ্রৌপদী, সহদেব নকুল, ভীম ও অর্জ্জুন। বাকী রইলেন শুধু ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির। ভীম আর অর্জুনের মত বীর এগিয়ে যেতে পারলেন না। পারলেন শুধু ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির। তাঁকে তো ভীরুই মনে হয়েছিল। যুদ্ধক্ষেত্রে তাঁর বীরত্বের কোনো পরিচয়ই কোনোদিন মেলে নি। তবু যুধিষ্ঠিরই টিকে রইলেন কেন?

মনে পড়ে যায় তার উত্তর ধৈর্য্য ও সহিষ্ণুতা। কে বলেছিলেন, আজ আর তা মনে পড়ে না। আবছা আবছা অনেক মূর্তি স্মৃতির পর্দায় ভেসে উঠে আবার মিলিয়ে যায়।

এদিকে সাধুজী ধুনির আগুনে একটা বড় লোটায় চাল, ডাল, তরকারি একসঙ্গে চাপিয়ে দিয়ে সিদ্ধ করলেন। তারপর একখানি পাতার উপর খিঁচুড়ির মত পদার্থটি ঢেলে ফেললেন।

সাধুজী ডাকছেন,—ওরে বাচ্চা! উঠে আয় বাবা!

একবার দু'বার, তিনবারের ডাকে আউলিয়ার তন্দ্রা ভেঙে গেল।

সাধুজী বললেন,—খেয়ে নাও বাবা! রাত হয়েছে। আগে ভুখ্ মিটাও। তারপর ঘুম দেও।

আউলিয়া মনে মনে ভাবে—সবটাই আমাকে দিলেন। উনি কি খাবেন?

তাব মনের কথা সাধুজী যেন বুঝতে পারলেন। তিনি হেসে হেসে বললেন, আমার একাহার বাবা! ভিখ্ মেঙে একবেলারই আহার জোটাই। ওবেলার জন্য রাখতে নেই। দেহ আছে বলেই তো ক্ষিদে রে বাবা! তা না হলে শঙ্করজীর নাম ক'রেই কেটে যেতো!

নাও বাবা! খেয়ে নাও।—পাগলী-মা তোমার আহারও দিয়ে গেছে। ছুঁড়ে দিয়ে গেছে চাল. ডাল আর তরকারির পুঁটলী। তারপর দে ছুট্!

হো—হো করে হেসে উঠলেন সাধুজী।

পাগলী-মা !—আউলিয়ার বিস্ময়ের ঘোর কাটে না।

পাগলী-মা কে বাবা ?

কে আবার ? আমিই জানি নে। মাঝে মাঝে আসে। যারা পথে প'ড়ে দিশেহারা হয়। তাদেরই পথ দেখিয়ে এনে কোথায় উধাও হয়ে যায়।

উধাও হয়ে যায় ? আশ্চর্য !

আমার গৌরীমায়ের লীলা বাবা ! এখানে থাকলে কত লীলা দেখতে পাবে ! কিন্তু এখন খেয়ে নাও।

আউলিয়াকে খেতেই হ'ল। গৌরীমা—পাগলী মেয়ের দান ! কি পরিতৃপ্তি ! খিঁচুড়ি নয়, যেন অমৃত।

খাওয়ার পর্ব শেষ হলে সাধুজীর দেখিয়ে দেওয়া জায়গায় আউলিয়া গিয়ে শুয়ে পড়ল। সে এত ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল যে আর সাধুজীর কথা চিন্তাও করতে পারলে না। কিন্তু তার চোখে লেগে রয়েছে সেই পাগলীর মূর্তি।

হাসছে আর আখ চিব্‌চ্ছে।—পাথর ডিঙিয়ে ডিঙিয়ে চলেছে পাগলী। তার মুখে পড়েছে সোনালী রোদ্ !

তারপর আর কিছুই মনে নেই। গাঢ় ঘুমে সব ভুলে গিয়েছিল আউলিয়া—পাগলা রজব। পরের দিন ঘুম ভাঙতেই গুহার ভেতর থেকে বেরিয়ে এল। কই, সাধুজী কোথায় ? ধুনীর আগুন নিভু নিভু হয়ে এসেছে। সাধুজীর আসন শূন্য ! তবে কি সাধুজী রাত্রে ঘুমায় না ? এদিক্ ওদিক্ তাকিয়ে দেখে আউলিয়া।

কি সুন্দর দৃশ্য ! পাহাড়ের ধারে একটা চাতালের মতই পাথর। তারই উপর দাঁড়িয়ে রয়েছে সে ! আর পাশেই পাহাড়ের গায়ে গুহা। এপাশে-ওপাশে ঝাউগাছের মতনই দু'একটা গাছ পাথর ফুঁড়ে বেরিয়ে এসেছে। দূরে সারি সারি পাইন গাছ। ডালচিনির গাছও রয়েছে। ভূর্জপত্রের বনের মাঝখান দিয়েই সে এগিয়ে এসেছে।

এখানেও পাখি আছে। কাক, টিয়া ও নানা জাতের পাখি।

পাহাড়ের গা বেয়ে ঝরণার মত জলধারা নেমে আসছে। নীচের দিকে তাকিয়ে দেখে নেমে যাচ্ছে জলস্রোত। যমুনা! পাথরের উপর যেন লাফিয়ে ঝাঁপিয়ে ছুটে চলেছে—পাহাড়ী মেয়ে পাগলী-মা!

ঐ যে সাধুজী পাহাড়েব গা বেয়ে এগিয়ে আসছেন। কাঁধে একটি ঝোলা! বেলা তত হয় নি। রোদের তেজও বেড়ে চলেছে। তার মাঝেও হিমশীতল কন্‌কনে্ হাওয়া।

সাধুজী কাছে এসে বললেন—যা বাবা! স্নান আহ্নিক সেরে নিয়ে আয়। মায়ের রাজ্যে কোনো ভয় নেই।

সাধুজীর নির্দেশে আউলিয়া বেরিয়ে পড়ল। যমুনার জলে স্নান করল। হিমশীতল জল। কিন্তু জলের কি তোড়! পা ফসকে গেলে আর নিস্তার নেই। গড়িয়ে গড়িয়ে গুড়ো হয়ে যেতে হবে।

স্নান সেরে সাধুজীর গুহায় ফিরে এ'ল আউলিয়া। আবার ধুনী জ্বলেছে। সাধুজী আগুনের দিকে তাকিয়ে মিটিমিটি হাসছেন। কখন যে তাঁর রান্নার পর্ব সারা হয়ে গেছে আউলিয়া তা বুঝতে পারে নি। আউলিয়া এসে কাছেই বসল।

সাধুজী বললেন—এবার ভোজনপর্ব সেরে নেওয়া যাক্ বাবা!

এই বলে দুটি পাতার উপর লোটা থেকে আগের রাত্রের খিঁচুড়ির মতই পদার্থ ঢাললেন। একটি পাতা আউলিয়াকে দিয়ে নিজে একটি রাখলেন।

ভোজন পর্ব সত্যই শেষ হল।

আউলিয়া ভাবে এখানে সাধুজীর দয়ায় ভোজন পর্ব তো রোজই সমাধা হবে। কিন্তু সে তো এরকম ভাবে দিন কাটাতে আসে নি। নিজেও সংকোচ বোধ করছে। কোন্ ভোর বেলা বেরিয়ে ভিক্ষে ক'রে দু'জনের খাবার মত সামগ্রী নিয়ে এসেছেন! আবার রান্নাও করেছেন।

ইনি জপতপ করেন কখন? নিশ্চয়ই সারারাত জেগে জপতপ করেন সাধুজী। কি আশ্চর্য!

সাধুজী বলেন,—এই আগুনের মাঝেই সৃষ্টির লীলা দেখি বাবা!

আমার আর জপতপ নেই। আঁখ দিয়েছেন শঙ্করজী, আঁখি ভ'রে তাঁর রূপ দেখায়ই আনন্দ।

দু'চারদিন সাধুজীকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখেছে আউলিয়া। সত্যি তাঁকে কোনোদিন জপতপ করতে দেখেনি। রাত্রে জেগে থাকেন কি না বুঝতে পারে না ; তবে এই ধুনির কাছে এক একভাবে আসনে বসে থাকতে দেখেছে। ভোর হতে না হতে সাধুজী বেরিয়ে যান।

একদিন সাধুজীর পিছু পিছু গিয়েছিল সে। দূরে দাঁড়িয়ে দেখেছে সাধুজী প্রাতঃকৃত্য সেরে যমুনার জলে স্নান করেন। তারপর সূর্যের দিকে অনেকক্ষণ তাকিয়ে থাকেন। কি যেন এক পুলকে তাঁর দেহ-মন জ্যোতিতে ভরে ওঠে। তারপর পাহাড়ী পথে ঝুলি কাঁধে বেরিয়ে পড়েন।

দূরে পাহাড়ের কোলে আছে পাহাড়ী বস্তী। সে সব বস্তীতে ভিক্ষা করতে যান সাধুজী। কিন্তু কোনোদিন দু'জনেব একবেলার বেশী সামগ্রী আনতে তাঁকে দেখে নি।

মাঝে মাঝে পাহাড়ী মেয়ে দু' একজন দুধও দিয়ে যায়। চায়ের চিনিও দিয়ে যায় কোন্ এক সরাইখানা থেকে। পাহাড়ীরা ধুনির কাঠেরও জোগান দেয়।

এই ত তপস্যা! এই ত সন্ন্যাসীর জীবন!—সাধুজীর খোঁজা কি শেষ হয়ে গেছে? আনন্দ? দেখার মাঝেই আনন্দ। আঁখ দিয়েছেন শঙ্করজী—আকাশকে দেখবার জন্যই। আঁখ আর আকাশ। আঁখি তো আকাশ থেকেই পেয়েছে দেখার শান্তি। আকাশ না থাকলে আঁখ দিয়ে কোনো কিছুই দেখা যেতো না।

চোখ খুললেই আকাশ।—চোখ বুজলেই সব অন্ধকার!

কি ছেলেমানুষের মত হাসি!

সাধুজী কি এত আনন্দ পেয়েছেন আউলিয়া বুঝতেই পারে না। বনজঙ্গল, পাহাড় পর্বত দেখে তারও মনে প্রশান্তি এসেছে। কিন্তু এই একঘেঁয়েমি কি চিরকাল ভাল লাগে।

সাধুজীর কাছে মাঝে মাঝে পাহাড়ীরা আসে। মাথা লুটিয়ে

প্রণাম করে। সাধুজী হাসেন। দু'একদিন বড় বড় মাড়োয়ারী শেঠকেও আসতে দেখেছে সে। নিশ্চয়ই সাধুজীর ক্ষমতা আছে। আউলিয়ার ভেতর যে আগুন জ্বলছে। এ আগুন যে নিভছে না। সাধুজী কি এ আগুন নিভোতে পারবেন?

সাধুজীর পায়ে একদিন লুটিয়ে পড়ল সে,—আমার ভেতর যে আগুন জ্বলছে বাবা! নিভিয়ে দাও তুমি।

সাধুজী হেসে জবাব দিলেন—এ আগুন নিভে গেলে যে তুই একেবারে নিজেই নিভে যাবি বাবা! আনন্দের সাধনা কর। আঁখ খুলে আকাশ দেখতে চেষ্টা কর। একদিন ও আগুনে আনন্দের ফুলঝুরি ঝরবে বাবা!

আমি যে জাতকুল খুইয়েছি বাবা!

জাত?—জাত আবার কি রে বাবা? জাতটা ভুলে যা। দেখবি সবই পাবি। আমি, তুমি আর জাত—এ তিন নিয়েই মারামারি কাটাকাটি। এ তিন জিনিস ভু'লে না গেলে আকাশের রূপ দেখতে পাবি নে, আর আনন্দও পাবিনে।

মনে মনে আজও আউলিয়া সেই সাধুজীর কথাগুলো আওড়ায়। রহস্যময় সে সাধুজী। সাধুজী তাকে বলেছিলেন—ঐ তিন জিনিস ভুলতে না পারলে তোকে ফিরে যেতে হবে বাবা! হিমালয়ে তুই গৌরীমাকে পাবি না, আর শঙ্করজীকেও পাবি না। গোমুখীতে দেখবি শুধু বরফগলা জল—পাগলা ঝর্ণা। শঙ্করজীর জটা ত তুই দেখতে পাবিনে বাবা!

সাধুজীর আশ্রয় আউলিয়া ইচ্ছা করেই ছেড়ে দিয়েছিল। সেদিন ভোরে উঠেই বেরিয়ে পড়েছিল সে। পাহাড়ের পর পাহাড়,—পথের রেখা ধরে কোথা যে যাচ্ছে, তার কোনো ঠিকঠিকানা নেই। পথ আর পথ। মাথার উপর আকাশ আর আশে পাশে বন আর বন। মাঝে মাঝে পাথুরে প্রান্তর। সেদিন পেটে কিছুই পড়েনি। এক একবার ভাবে ফিরে যাবে সাধুজীর কাছে, ফিরেও চলে। কিন্তু দিশাহারা হয়ে যায়। কোথায় পথ?

আশ্চর্য ! কোথা থেকে সামনে এসে দাঁড়াল একটি মেয়ে ।

পাগলী নয়, পাহাড়ী মেয়ে—মোটা নীলরঙের ঘাগরা পরা । মাথা থেকে পা পর্যন্ত ঘোমটার মতন পরা নীল জামা । গায়ের রঙ তামাটে হলেও তুষার-কন্যার ছাপ রয়েছে মুখে । মাথায় ক'রে কাঠের ঝুড়ি নিয়ে যাচ্ছিল মেয়েটি । হাতে কমলালেবুর মত ছুটি ফল ।

পাথরের উপর বসেছিল আউলিয়া । দূরে পাহাড়ের কোলে ছু' একখানা ঘর দেখা যাচ্ছে । কিন্তু মনে হচ্ছে অনেক দূর । এ কয়দিনে পাহাড়ীদের ভাষাও কিছু কিছু বুঝতে শিখেছিল আউলিয়া ।

সন্ধ্যা হ'য়ে আসছে । তার সামনে দাঁড়াল পর্বতকন্যা রাতাবী । মেয়েটি বলছে,—পাগলা মানুষ আছে ! উখানে এলি কোথা থেকে ?

মেয়েটির মুখের দিকে তাকায় আউলিয়া ।

একি ? মেয়েটি বাংলাও জানে !

মেয়েটি খিল খিল করে হাসে—মরবি, এখানে প'ড়ে থাকলে বাঘ শেয়ালে খেয়ে ফেলবে । মোর ঘরে চল ।

আউলিয়া উঠতে চায় না । আর যে চলতে পারছে না । ধমক লাগায় পাহাড়ী মেয়ে । সূর্যের শেষ রশ্মি ঝিলমিল করে ওঠে ।

মুগ্ধ হয়ে মেয়েটির মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে আউলিয়া ।

হেই, কি দেখছিস ! বলে,— মেয়েটি তার হাত ধরে ওঠায় ।

পাহাড়ী বস্তীতে থাকে আউলিয়া । কয়েক দিন বিছানা ছেড়ে উঠতে পারে নি । জ্বরের ঘোরে অচেতন হয়ে পড়েছিল । শুধু চীৎকার করে উঠত—আগুন, আগুন ! সেরে উঠতে কয়দিন যে লেগেছিল সে জানে না । তারপর সবই ভুলে গিয়েছিল ।

পাহাড়ী মেয়ে রাতাবী । তারই সেবা শুশ্রূষায় আউলিয়া বেঁচে উঠেছিল । পাহাড়ী বস্তি দেখেছে । নিজের হাতে ফলের রস করে খাইয়েছে রাতাবী । জ্বরের ঘোরে চোখ মেলে রাতাবীর মুখই দেখেছে সে ।

বড় দুর্বল হ'য়ে পড়েছিল আউলিয়া।

মেয়েটি নাম দিয়েছিল রাজা।

জ্বরের ঘোরে কি যে বকেছিল, তা জানে না আউলিয়া। কিন্তু দেখতে পায়, রাতাবী যেন তার মনের ঘরের চাবিকাঠি পেয়ে গেছে।

কি যে তোমার নাম বুঝতেই পারি নে। আচ্ছা রাজীবই বা কে আর রজবই বা কে?

রাতাবীর মুখে এ দুটি নাম শু'নে আঁতকে উঠেছিল আউলিয়া।

না, না, ওদের আমি চিনি নে।

মুচকি হেসে রাতাবী উত্তর দেয়—বেশ, নাইবা চিনলে। তোমার নাম দিলাম রাজা। রজবও নয়, রাজীবও নয়। বুঝলে, রাতাবীর রাজা তুমি।

আউলিয়া রাতাবীদের কথাও শুনলে। কোন এক বাঙালী সাহেব সাধু হয়ে গিয়েছিলেন। যমুনোত্রীব কাছে এসে আশ্রম বানিয়ে ছিলেন সেই বাঙালী সাহেব। তারই কাছে ছিল রাতাবীর বাবা,—পাহাড়ী সর্দার। সাহেবের বিবিও ছিলেন তার সঙ্গে। রাতাবী তাঁদের সঙ্গে অনেকবছর কাটিয়েছে। সম্প্রতি সেই সাহেব দেহরক্ষা করেছেন। আর সাহেবের বিবি হরিদ্বারে ফিরে গেছেন।

বাঙালীরা বড় ভাল মানুষ!—খিল খিল করে হাসে রাতাবী।

বাঙালীবাবুদের ত আমি দেখেছি। তারা কেমন ছিমছাম থাকে। তোমার এত চুলদাড়ি কেন?—সাধু হবে? না, না, ওসব আজই ছেঁটে ফেলবে।

আউলিয়া কোনো উত্তরই দিতে পারত না।

বড় সুন্দর তুমি! চাঁদপারা মুখ।

খিলখিল করে হেসে উঠত রাতাবী।

আউলিয়ার মনে হ'ল, আবার যেন সে ফাঁদে পড়েছে। আনন্দ না মোহ কিছুই বুঝতে পারে না। 'এ কি জ্বালা! রাতাবী কি চায়?

বাঙালী ভালবাসতে জানে! আমি ত বাঙালীসাহেব আর তার বিবিকে দেখেছি। বিবির একবার গায়ে বসন্ত ফুটে বের হ'ল।

আমাদের হলে ত সবাই পালিয়ে যায়। জঙ্গলের কাছে ঝুপড়ি বেঁধে তার মাঝে ফেলে দিয়ে আসে। কিন্তু সাহেব পালিয়ে গেল না। নিজের হাতে ওষুধ লাগিয়ে দিয়েছে। সব পরিষ্কার করেছে। আমার বাবা তো পালিয়ে এসেছিল, কিন্তু আমি পালাই নি। কেমন যেন মায়া লেগে গিয়েছিল। সাহেব আমাকে কাছে আসতে দিতেন না। ডাক্তার ছিলেন সেই সাহেব-সাধু।

অনর্গল বকে চলত রাতাবী,—এরই নাম ভালবাসা। আমাদের ত কুকুরের জীবন। মরদরা একজনকে ছেড়ে আর একজনকে সাদি করছে।

সত্যি বলছি, তোরা ভালবাসতে জানিস।—কথা বলতে বলতে রাতাবীর মুখ রাঙা হয়ে উঠত।

সাধুজীকে ছেড়ে এসেছে আউলিয়া। হিমালয়ের মায়া কাটাতে চায়, তাই ত সে বেপরোয়া ভাবে বেরিয়ে এসেছে। নতুন মায়া পুরোনোকে খোঁজার নেশা কি কাটিয়ে দেবে? সে কি সত্যি রাজা হয়ে নতুন সিংহাসনে বসবে?

বেশই ছিল আউলিয়া। রাতাবীর যত্নে সে নিজের কথা প্রায় ভুলেই গিয়েছিল। এদিকে চলেছে ফিস্‌ফাস্ গুন্‌গুনের পালা। কানেও আসে,—ওসব ভাল নয় রাতাবী। কে যেন তাকে শাসিয়ে দিয়ে যায়।

রাতাবীর বাবা পাহাড়ীদের সর্দার। এমনি ভাল মানুষ; কিন্তু তার চোখেও বিরক্তির চিহ্ন ফুটে উঠেছে। আউলিয়াকে নিয়েই কথা উঠেছে। কোথাকার কে এক জোয়ান মরদকে ঘরে রেখেছে রাতাবী। রাতাবী কুমারী মেয়ে।

সর্দার মেয়েকে বোঝায়,—সাবধান ক'রে দেয়। সমাজের আইন তাকে মানতে হবে। নিমুচা এখানকার সেরা ছেলে। সেও শেষে হাতছাড়া হয়ে যাবে।

রাতাবী নিমুচাকে কথা দিয়েছিল। নিমুচা রাতাবীর ভাবী বর।

আউলিয়া নিমুচাকে দেখেছে। নিমুচাকেও তার ভাল লেগেছিল।

তার অসুখের সময় নিমুচাও কত ফল নিয়ে এসেছে।

রাতাবী রসিকতা করে বলত—আমার মনের মানুষ নিমুচা! মনের মানুষ,—পাগলা রাজা! দেখবি কোন্‌দিন পালিয়ে যাবে। তোর ভয় নেই।

মনের মানুষকে বেঁধে রাখা যায় না।—খিলখিল ক'রে হেসে উঠত রাতাবী।

রাতাবীর বাবা বলে,—এখন ত ভাল হয়ে গেছো। নিজের ঘরে চলে যাও বাবু! আমিই একদিন তোমাকে হরিদ্বারের পথে এগিয়ে দিয়ে আসি। দেশে চলে যাও।

রাতাবী বলে,—কেনে যাবে? ওর তো কেউ নেই। পাগল মানুষ। মনের খেয়ালে কোথায় পড়ে মরবে!

আউলিয়ার মনেও চলে দ্বন্দ্ব। কোথায় যাবে সে? ঘর?—ঘর তো তার নেই। অথচ তার সবই ছিল। সবই আজ হারিয়ে গেছে। তাই ত সেই হারানো ঘর খুঁজতে বেরিয়েছে।

আউলিয়া চুপ ক'রে থাকে।

নিমুচাই একদিন সব সমস্যার সমাধান করে দিয়েছিল!

তুই চল, আমাদের টুঙ্গী ঘরে। তোকে আমাদের চাল চলন শিখিয়ে দেবো। আমাদের কাছেই তুই থাকবি।

মন্দ নয়! পাহাড়ী চাল চলন শেখে আউলিয়া। বর্শা ছুঁড়ে হরিণ মারে। বাঘের পিছুও তাড়া করে। সে তাদের ভাষাও শিখেছে। রাতাবীর সঙ্গেও দেখা হয়। কিন্তু রাতাবীর মুখে আগের মতো আর হাসি নেই। আর কল্‌কল করে অনর্গল কথা সে বলে না।

আউলিয়া শুনল রাতাবীর বিয়ে হবে। দিন স্থির হয়ে গেছে।

রাতাবীর সঙ্গে নিমুচার বিয়ে।

ধুমধাম লেগে গেছে রাতাবীর বাড়িতে আর নিমুচার বাড়িতে। দশটা শূকর আর চারটা হরিণের ডালি পাঠিয়েছে নিমুচার বাবা।

রাতাবীর বাবাও কম যায় নি। সেও হরিণ আর শূকর পাঠিয়েছে। তার সঙ্গে পাঠিয়েছে দশ হাঁড়ি মদ। সে কি হুল্লোড়,

আর হৈ-হৈ। বিয়ের ঠিক আগের দিন। গভীর রাত। ঘুমিয়ে আছে আউলিয়া। রাতাবীর রাজা।

রাজা স্বপ্ন দেখছে,—তার রাজত্ব চলে যাচ্ছে!

মনে হ'ল কে যেন তাকে জড়িয়ে ধরেছে। বড় স্নিগ্ধ সে স্পর্শ,—কি যেন্ পুলক লাগে ঘুমের মধ্যে। চমকে ওঠে রাজা। তার বুকে দু'ফোঁটা চোখের জল পড়ে।

রাজা,—রাজা! আমি।—ফিস্‌ফিস্ করে কথা বলছে রাতাবী।

রাতাবী!—বিস্ময়ের সুর রাজার কণ্ঠে।

হ্যাঁ আমি। চল আমরা পালিয়ে যাই।

কোথায় পালাব? আর কেনই বা তুমি পালাবে?

কোথায় পালাবো? কেন পালাবো,—বুঝতে পারলি নে রাজা! আমার মন যে মানছে না রে! নিমুচাকে আমি চাই নে।

নিমুচাকে রাতাবী চায় না?—এ কি স্বপ্ন দেখছে রাজা।

না, তা হয় না রাতাবী। কাল যে তোদের বিয়ে।

ফোঁস করে ওঠে রাতাবী।

চল্,—চল্,—নেমকহারামী করিস নে। দেরী হলে বিপদ্ হবে।

রাজাকে জোর করে টেনে তুলল রাতাবী। রাজা বাধা দিতে পারলে না। এই বুনো মেয়ের গায়ে এত জোর!

রাজা বলতে থাকে—বিপদ হবে রাতাবী। আমার সঙ্গে কোথায় যাবি? আমার ত ঘরবাড়ি নেই।

ভয় নেই রাজা! বনের মাঝেই ঘর বাঁধব। ঘর কি আপনা থেকে হয় রে। মরদের সঙ্গে জেনানা হাত মেলালেই ঘর হয়ে যায়। জঙ্গলে ভরতি আছে খাবার জিনিস। মাটি খুঁড়লে সোনা পাবি। ঘরের ভাবনা তোকে ভাবতে হবে না।

রাজাকে টেনে নিয়ে চলেছে রাতাবী। বাধা দেবার শক্তিও তার নেই। অজানা পথ,—রাত্রির অন্ধকার। কোথা নিয়ে যাচ্ছে কিছুই বুঝতে পারছে না।

তবু বলে,—তুই অবুঝ হলি রাতাবী! তোদের লোকগুলো

আমাদের খুন করে ফেলবে। তোর বাবাই হয়ত বর্শা ছুঁড়ে মারবে।

কেউ আমাদের নাগাল পাবে না রাজা। আর যদিই বা পায়, তুই বর্শা ছুঁড়ে মারতে পারবি না! আমিই এগিয়ে গিয়ে বুক পেতে দেবো।

তুই পাগলা হয়ে গেলি রাতাবী। জানিস নিমুচা তোকে কত ভালবাসে!

ভেংচি কেটে উঠল রাতাবী—ভালোবাসে! তুই কি আমাকে ভালোবাসিস নে রাজা!

কি উত্তর দেবে রাজা?—ভালবাসা! মনে হ'ল তার বুকের আগুনটা যেন হঠাৎ নিভে গেছে। ভালবাসা না লোভ আর লালসা? এতদিন মনে হয়েছিল সাধুজীর কথা মিথ্যে। মনে হয়েছিল তার মাঝে লোভ বা লালসা কিছুই নেই। কিন্তু আজ ওকি উঁকিঝুঁকি মারছে। রাতাবীকে তার ভাল লাগে। এ কথাটা যেন এতদিন মুখ ফুটে বলতে পারে নি! তাকে পাবার ইচ্ছা যে আজ তাকে পাগল করে তুলেছে। এই কি লোভ এই কি লালসা? রাতাবীর স্পর্শে আছে কি এক পুলক।

রাতাবীর হাত দুখানি নিজের হাতের মুঠিতে ধরে রাজা। রাতাবীর চোখেও এক মোহ-ঝরা দৃষ্টি। দুজনে এগিয়ে চলেছে। শেষ রাতে জ্যোৎস্না উঠেছে। প্রেতের তাঁবুর মত পাহাড়ের পর পাহাড়।

রাতাবী বলে এই সোজাপথে পাহাড়ের নীচে নেমে যাব রাজা! নেমে গেলেই নিশ্চিন্দি। গাঁয়ের দিক ছেড়ে শহরের দিকে চলে যাব। আর এ পথে ফিরবো না।

পথ আর শেষ হয় না। দিনের আলো ফু'টে উঠল। পথ কোথায়? শীতে শরীর প্রায় আড়ষ্ট হয়ে এসেছে। দূরে পাহাড়ের চূড়ায় সোনালী রোদের ছটা পড়ে ঝিলমিল করছে। কন্‌কনে হাওয়া। পেছন ফিরে দেখে ওদিকে যেন সাদা কাপড়ের গুণ্ঠন পড়েছে। কুয়াসায় চারদিক ধূসর হয়ে উঠেছে, পেছনের কোনো কিছুই আর দেখা যায় না।

থমকে দাঁড়াল রাতাবী।

আমরা ভুল পথে এসেছি বাজা!

তাহলে এখন কি হবে?

ভয় নেই। পুবদিকে ফিবতে হবে। ওদিকে গঙ্গোত্রী যাবাব পথ। আমি সব পথই জানি।

আউলিয়া হতাশায় যেন ভেঙে পড়ে। দুদ্দম এই পাহাড়ী মেয়ে তাকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছে!

বাতাবী বলে,—ঐ দিকে যেতে হবে। আমাব পিছু পিছু আয়।

পাহাড়েব গা বেয়ে চলেছে দুজনে। পাহাড়েব খাঁজে খাঁজে পা ফেলে চলতে হচ্ছে। কোথাও বা খাড়া পাহাড়। নীচে সরু রেখাব মত জলধাবা।

বাতাবী বলে,—আব ভয় নেই রাজা! আমাদেব এলাকা ছেড়ে চলে এসেছি। এখানে কেউ আমাদেব মাবতে পারবে না। গঙ্গা মায়ীব পথ। এখানে কেউ খুনখাবাপী কবতে পাবে না।

খুনখাবাপী!—আউলিযা শিউবে ওঠে।

হ্যাঁবে! পাহাড়ী এলাকায় পেলে কেউ বেহাই দিত না। কিন্তু এখানে সে ভয় নেই।

চুপ কবে থাকে আউলিয়া!

ভুখ্ লেগেছে বুঝি? চল্ চল্। পাহাড়েব এই বাঁকটা পেরোলেই চটি পাবো, হোথা দোকানপাট আছে।

দোকানপাট?

হ্যাঁ, রূপিয়া তঙ্কা আমি নিয়ে এসেছি। তোব ভয় নেই।

বেলা তখন অনেক হয়েছে। তারা এসে সত্যই এক ধর্মশালায় পৌছালো। তার পাশেই আছে দোকান। রুটি, পুরী ও শুকনো ফল পাওয়া গেল। খাওয়া দাওয়া সেরে নিয়ে ধর্মশালায় গিয়ে উঠল দু'জনে।

ঘুম আসে না। রাতাবী অনর্গল কথা ব'লে চলেছে। ঘরেব কোণে আগুন জ্বালিয়ে দিয়েছে রাতাবী। আগুনের কাছেই শুয়েছে

আউলিয়া। কিন্তু শীত ভাঙে না। কানে আসছে জলস্রোতের শব্দ। বাইরে অসীম স্তব্ধতা। তার মাঝে গুড়্ গুড়্ শব্দ হচ্ছে। মনে হচ্ছে যেন কামান দাগছে!

রাতাবী বলে,—ধ্বসে পড়ছে বরফের পাহাড়। জানিস রাজা, আমি কতবার এপথে সেই বাঙালী সাহেবের সঙ্গে এসেছি। এখানকার সবাই আমাকে চেনে।

আউলিয়া বলে,—এপথে গিয়ে আর কি হবে রাতাবী? চল্ কালই আমরা নামার পথ ধরি।

খিলখিল করে হেসে উঠল রাতাবী,—কি বল্লি নেমে যাবি? গঙ্গামাইকো দর্শন করবি না? গোমুখী না দেখে ফিরে যাবি! পাপ হবে রে, পাপ হবে রে, পাপ হবে। হেথা এসে ফিরে যেতে নেই।

পাপ আর পুণ্য!—আউলিয়া মনে মনে আওড়ায়। পাপ আর পুণ্যের কোনো হদিসই জীবনে পেলে না। এটুকুই দেখেছে,—যাতে যার সুবিধা সে সেটাকেই পুণ্য মনে করছে।

রাতাবীর কথায় আর কোনো প্রতিবাদ করে নি সে।

পথ চলা আর রাতাবীর গল্প-শোনা ছাড়া আউলিয়ার আর কোনো কাজই ছিল না। কত গল্প বলেছে রাতাবী। কে এক নরবাহাদুরের মেয়ে আলোনার কথা!

আলোনা মানে স্বর্গের ফুল! রাতাবী নিজের নামেরও মানে বলেছিল,—জানিস আমার নামের মানে কি?—রাতরাণী! হিঃ-হিঃ করে হেসে ফেটে পড়ছিল রাতাবী।

তোরা ভালবাসতে পারিস্ রাজা, আবার কাঁদাতেও পারিস্। জানিস্ আলোনার কথা! এক বাঙালী বাবুকে ভাল বেসেছিল আলোনা। সরকারী কাজে যমুনোত্রীতে সেই বাঙালী-সাহেব এসে ডেরা ফেলেছিল। তার ডেরার কাছেই আলোনাদের তাঁবু পড়েছিল। পাহাড় কেটে পথ করাচ্ছিল সেই বাঙালীবাবু। নরবাহাদুর তার কাছেই কাজ করত। আলোনা সেই বাবুর রান্না-বান্না করত। সুন্দর মেয়ে আলোনা। পাঁচ ছয়মাস তারা ওখানেই ছিল। বাঙালীবাবুর

বিষম বোখার হ'ল। রাতকে দিন করেছে আলোনা। সোমত্ত মেয়ে। কত কথাও রটেছিল। কিন্তু বাঙালীবাবু নরবাহাদুরকে বলেছিল, ভয় নেই বাহাদুর, আমি আলোনাকে সাদি করব। স্বামী-স্ত্রীর মতই ছিল তারা! কিন্তু একদিন বাঙালীবাবু নরবাহাদুর আর আলোনাকে রেখে চলে গেল।—জরুরী কাজে যাচ্ছি। শীগ্‌গির এসে আলোনাকে দেশে নিয়ে যাবো।

আউলিয়া বলে,—তারপর কি হ'ল?

আর ফিরে আসেনি সেই বাবু। আলোনার একটি ফুটফুটে ছেলে হ'ল। বাঙালীবাবু ফিরলে না। দিন গুনতে গুনতে আলোনা আহার নিদ্রা ছাড়লে। শুকিয়ে শুকিয়ে শেষে পাগল হ'য়ে গেল আলোনা। নরবাহাদুর নাতিকে দেখে। একদিন পাহাড়ের চূড়ায় উঠে নীচে ঝাঁপ দিল আলোনা।

ঝর ঝর ক'রে রাতাবীর চোখে জল ঝরতে থাকে। আর আউলিয়ার চোখও কেমন ভিজে ভিজে ঠেকে। হাত দিয়ে চোখ মোছে আউলিয়া।

হঠাৎ চমকে উঠল আউলিয়া। তার পাশে রাতাবী নেই।

কোথা গেল রাতাবী?

সে যে সঙ্গেই ছিল? মনে হয় এই মাত্র তারই পাশে এসে দাঁড়িয়েছিল।

রাজা! রাজা! আমার রাজা!

সে যে অনেকদিন আগেকার কথা। স্বপ্নের কাহিনী! রাতাবী হারিয়ে গেছে।—সামনে পাহাড়ের মত দাঁড়িয়ে রয়েছে এক বিরাট-কায় দৈত্য,—বরফের স্তূপ। তারই নীচে একটা গহ্বর-মুখ। হু-হু ক'রে বরফগলা জল বেরিয়ে আসছে। কি তার গর্জন। তুষার-ধবল পর্বত-চূড়া আকাশে গিয়ে ঠেকেছে। তার উপর পড়েছে সূর্যের রশ্মি। মহাদেবের মাথায় মুকুট ঝলমল করছে; সাদা, লাল, হলদে নানা রঙের হীরা জ্বলছে। গোমুখী, গঙ্গোত্রী! পুণ্যার্থীরা মাথায় জল ঢালছে।

ভাগিয়ে, ভাগিয়ে—আর্ত চীৎকার! পিছনের দিকে আচমকা ঠেলে দিল কে যেন! উপর থেকে মস্ত বড় বরফের চাঙ্গড় ভেঙে পড়ল। ছিটকে ছড়িয়ে পড়ছে টুকরো টুকরো হীরে। ভয়ঙ্কর আওয়াজ! আবার হাজার হাজার শাঁখ যেন বাজছে।

গেল,—গেল,—সর্বনাশ হ'ল। চাপা পড়েছে? কোলাহলের মধ্যে সম্বিৎ ফিরে পেয়ে আউলিয়া দেখে তার পাশে রাতাবী নেই! রাতাবী! চাঙ্গড়ের চাপে পড়ে গেছে গঙ্গার স্রোতে—গহীন পথে গর্জে গর্জে চলেছে গঙ্গা,—ভাগীরথী। মাটির পৃথিবীতে চলেছে পাহাড়ী মেয়ে। কিন্তু রাতাবী নেই। মিশে গেছে গঙ্গায়।

গঙ্গা চলে গেছে,—চলে গেছে পাহাড়-পর্বত ডিঙিয়ে। দেশ-দেশান্তরের উপর দিয়ে বয়ে গেছে তার স্রোতে। হরিদ্বার, ফরক্কাবাদ কানপুর, পাটনা, প্রয়াগ, কাশী—কলকাতা। গঙ্গার পাড়ে পাড়ে কত শহর, কত গ্রাম! রাতাবীও চলে গেছে তার সঙ্গে।

তাকেও ফিরতে হবে।

বাতাবী! রাতাবী!—রাতরাণী!

গলা ফাটিয়ে চীৎকার করেছে রাতাবীর রাজা। পাণ্ডাঠাকুর বলেছে, এ কি করছো বাবা! এ তো পরম ভাগ্যমানী আছে। গঙ্গামায়ীকা সাথ মিশে গেছে।

আর এক পাণ্ডা বলেছিল,—তুমি সাধু আছো বাবা! এসব মায়ার বন্ধন টুট্ গিয়া। শঙ্করজী লীলা করছেন। জানিস্ নে এই হিমাচলকা উপুরসে সতীমার দেহ সুদর্শন চক্র খণ্ড খণ্ড করে ছড়িয়ে দিয়েছিল। শঙ্করজী পাগলা বনে গিয়েছিল।

গোমুখীতে স্নান সেরে থর থর করে কাঁপছে এক আধবয়সী মহিলা। পরনে তার চাওড়া লালপাড় শাড়ি। সেই মহিলা একদৃষ্টে গঙ্গার স্রোতের দিকে তাকিয়ে আছেন।

জোড়হাতে তিনি প্রণাম করছেন—সতী! সতী! সতী।

চোখে তাঁর জলের ধারা।

আউলিয়াও ঝাঁপ দিতে যাচ্ছিল। পাণ্ডাঠাকুর তাকে জড়িয়ে

ধরেছিল। কিছুতেই তাকে ছেড়ে দেয় নি। বিহারী এক ভদ্রলোকের জিম্মায় তাকে দিয়েছিল পাণ্ডাঠাকুর।

বিহারী ভদ্রলোক সান্তনা দিয়েছিলেন—এ যে মহাপ্রস্থানের পথ ভাই! এমন যে যুধিষ্ঠির, তাকেও ভাইদের আর দ্রৌপদীকে ছেড়ে যেতে হয়েছিল!

সেই বিহাবী ভদ্রলোকেব সঙ্গে আউলিয়া ফিরে এসেছিল।

তার বুকে তখন আগুন জ্বলছে। যে আগুন নিভে গিয়েছিল, সে আগুন যেন আবাব দাউ দাউ ক'রে জ্বলে উঠেছিল। হিমালয়েব চড়াই-উত্‌রাই ভেঙে নীচের দিকে নামতে নামতে শুধু আগুন দেখেছে আউলিযা।

একবার মনে হয়েছিল সেই সাধুজীর আশ্রমে ফিবে যায়। কিন্তু তা খুঁজে বের করার কোনো উপায়ই ছিল না। বিহাবী ভদ্রলোক তাকে ভোলাবাব জন্য কত গল্প ফেঁদে ছিলেন।

জানো ভাই! বছরে একবার ক'রে বেরিয়ে পড়ি। এ দুর্গম পথের কি যেন একটা আকর্ষণ আছে। ঐ যে পাহাড়,—সীমা নেই সংখ্যা নেই, চূড়ার পরে চূড়া! গঙ্গাজীরও বিরাম নেই, বিশ্রাম নেই। কোন্ যুগ থেকে অমনি ছুটেই চলেছেন। এর কি শেষ আছে? এই ধর না, এবার নিয়ে তেরো বছর একই ভাবে দেখছি। তবু বার বার দেখতে ইচ্ছে হয়। ভগবানের লীলা ভাই! সবই ভগবানের লীলা! কত সাধু ব্যাসদেব, বশিষ্ঠদেব, সবাই এখানে আছেন। ভাগ্য থাকলে দর্শনও মিলে যায়। শাস্ত্রবাক্য কি মিথ্যা হতে পারে?

শাস্ত্রবাক্যের কথা চিন্তাই করে না আউলিয়া। সে আকাশে বাতাসে তখন রাতাবীর মুখের হাসির ঝিলিক দেখছে। তার কানে বাজছে—রাজা, রাজা, আমার রাজা!

ভদ্রলোক বলেই চলেছেন,—সেবার তো দর্শন দিয়েই ছিলেন একজন। কপালের দোষ ভাই! চিনতেই পারিনি।

কে দর্শন দিয়েছিলেন ?

তা যদি বুঝতে পারতাম, তা হ'লে কি ছেড়ে দিতাম ! সবই নসিব ভাই !

চিনতে পারলেন না ?

না, পথ হারিয়ে ফেলেছিলাম। কুলীর মাথায় বোঝা চাপিয়ে দিয়ে নিশ্চিন্তে চলেছি। সঙ্গে কেউ ছিল না। সকলেই এগিয়ে গেছে। আমাকে হঠাৎ বোখারে ধরলে। বুঝলে ভাই, জ্বর হল। হাঁটতে পারিনে। সেই ভূর্জপত্র-বনের মাঝখান দিয়ে কোন্ পথে যাব ঠাহর করতে পারিনে।

তারপর কি হ'ল জানো ? রামজীকে স্মরণ করলাম। ওদিকে সন্ধ্যে হতে চলেছে। চটি কতদূর বুঝতেই পারিনে। মাথাটা টলছে।

কেউ বুঝি পথ দেখিয়ে দিলে ?

হ্যাঁ, আশ্চর্য ! ময়লা চটপরা, আর একটা চট মাথা থেকে পা পর্যন্ত ঝুলে পড়েছে,—এক পাগলী। হঠাৎ দেখি পেছন থেকে এসে আমার পাশ কাটিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে।

ভয়ও হল ? এ আবার কে ?—কিন্তু রামজীকে স্মরণ ক'রে পাগলীর পিছু পিছু ছুটলাম। এই দেখি তো এই নেই। কখনো বা আড়াল হয়ে যায়। এই কন্‌কনে শীতেও গা দিয়ে ঘাম ছুটতে লাগল। তবু পাগলীকে ধরতে পারি নি ?

তারপর কি হ'ল ?

কি আবার হবে ? এক সময় দেখি এক জায়গায় অনেকগুলো আলো জ্বলছে। আর পাগলী ফিক্ করে হেসে কোথায় যেন মিলিয়ে গেল। আমি এগিয়ে গিয়ে দেখি চটিতে পৌঁছে গেছি।

আউলিয়ার মনে প'ড়ে যায় সেই সাধুজীর পাগলী-মার কথা। আখ চিবুতে চিবুতে পাথর ডিঙিয়ে চলেছে।

হরিদ্বারে এসে পৌঁছল আউলিয়া।

এখানে এসে বিহারী ভদ্রলোককে বিদায় দিল। তিনি তো তাকে কিছুতেই ছাড়তে চান নি। কিন্তু আউলিয়া কিছুতেই তাঁর সঙ্গে যেতে রাজী হল না।

লছমনজীর মন্দিরে আরতি দেখে আউলিয়া। কাঁসর-ঘণ্টা বাজছে; প্রদীপ আর চামরে চলেছে আরতি। ধূপধুনো জ্বলছে! রাবণ না কি ব্রাহ্মণের সন্তান। আর সেই কারণে মেঘনাদকে বধ ক'রে ব্রহ্মহত্যা পাপের প্রায়শ্চিত্ত করেছিলেন লক্ষ্মণ। এই সেই ক্ষেত্র।

স্বর্গদ্বারের বৈতরণী এই লছমন-ঝোলা। এ পুল বা ঝোলা পার হতে পারলে না কি স্বর্গের দরজা খুলে যেতো। সেই ঝোলা আর নেই; মানুষ স্বর্গের পথ সুগম করে নিয়েছে। লোহা ও তারে বাঁধা এই পুল। অনেক নীচে তব্‌তর্‌ করে বইছে খরস্রোতা গঙ্গা। ফুলঝুরির মতো সাদা ফেনা ছড়িয়ে পাগলের মত ছুটে চলেছে পাগলী মেয়ে।

লছমন-ঝোলার উপর সন্ধ্যারতিব পর দাঁড়িয়ে ছিল আউলিয়া। মাথার উপর খোলা আকাশ। সত্যই যেন একপাশে মাটির পৃথিবী পড়ে রয়েছে, আর ওপাশে উত্তুঙ্গ স্বর্গের সিঁড়ি হিমালয়। মাঝখানে এই বৈতরণীর সেতু। পাহাড়ের গায়ে কুঠি, মন্দির আর ছোট ছোট বাড়ি,—আলো জ্বলছে। কাঁসর-ঘণ্টার শব্দও শোনা যাচ্ছে।

আউলিয়া কিছুক্ষণ চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে রইল। তারপর ধর্মশালার পথে পা বাড়াল। এক জায়গায় অনেকগুলো সাধু মিলে জটলা করছে। তাঁবুর নীচে ধুনি জ্বলছে।

বড় বড় গামলায় পুরী ও তরকারী রয়েছে। একজন বললে,— দিল্লীর এক শেঠ ভোজন করাবে। একশো আট জন সাধুকে ভোজন করিয়ে শেঠজী পুণ্যলাভ করবেন। কিন্তু কিছুতেই একশো আট হচ্ছে না। সব সাধু এখানে আসতেও চাইছেনা। আশ্রমের সাধুরা তো নারাজ হয়েছেন।

আউলিয়াকে দেখতে পেয়ে একজন সাধু বললে—"আইয়ে,

আইয়ে, লছমনজী বহুত প্রসন্ন হোয়া। আপ্‌কো ভেজ দিয়েছেন।"
সাধুদের মুখ প্রসন্ন হ'য়ে উঠল।

সে-রাত সেই তাঁবুতেই কাটল। দু'একদিন এমন ক'রেই হরিদ্বারে কাটিয়ে দিল আউলিয়া। তারপর হাঁটাপথে এগিয়ে চলল। পাহাড় যেখানে শেষ হতে চলেছে, ঠিক সেখানেই গঙ্গার ধারে একখানি কুঠি। তার পাশেই মস্ত বড় একটা বেলগাছ।

দুপুরের রোদ। গাছের ছায়ায় বিশ্রাম করছিল আউলিয়া। সেই কুঠি থেকে দুজন লোক বেরিয়ে এল। তাদের কপালে সিঁদুরের ফোঁটা। আউলিয়াকে দেখতে পেয়ে তাদের একজন বললে,—আপ কা আশ্রম?

আমার কোনো আশ্রম নেই। নিজের দেশে ফিরে যাচ্ছি।

তারা বললে,—আপনি তো সাধুপুরুষ দেখছি। এই কুঠি তান্ত্রিক-বাবার আশ্রম। বহুত বড় সাধু।

আউলিয়ার কৌতূহল হল। এখানে যদি কোনো হদিস্ মেলে! সে সেই আশ্রমের ভেতর গিয়ে দেখে তান্ত্রিক সাধু সিঁদূরে-লেপা এক প্রকাণ্ড শিলার সামনে বসে আছেন। চোখ দুটি ঘোর লাল। আউলিয়াকে দেখতে পেয়ে বললেন,—এসেছিস্ ব্যাটা! তোর জন্যই বসে আছি।

যেন তারই জন্য বসে ছিলেন সাধুবাবা। আউলিয়া আশ্চর্য হয়ে যায়।

দাঁড়ালি কেন? এখানে বসে পড়।

তারপর ডাকলেন,—ভৈরবী! ভৈরবী! এই দ্যাখো না কে এসেছে!

মন্ত্রমুগ্ধের মত ব'সে পড়ল আউলিয়া—এ আবার কি রহস্য?

সাধু বললেন,—এত দিন তো ঘুরলি বাবা! চুলদাড়ি তো লম্বা করে ফেললি, কিছু কি পেয়েছিস্? আগুন কি নিভল?

কেমন এক বিচিত্র হাসি ফুটে উঠল সাধুর মুখে।

সবই ভুয়া ব্যাটা! সবই ভুয়া! একমাত্র প্রকৃতিই সত্য। এই যে পাহাড়-পর্বত, গঙ্গা, যমুনা সবই প্রকৃতির খেলা। প্রকৃতি কখন মা, কখন বা জায়া, কখন বা কন্যা, কখন বা প্রেয়সী। জন্ম, মৃত্যু—সবই ভুয়া। তবু কেন ঘুরে মরিস্।

আউলিয়া মনে মনে ভাবে,—এ সাধু কি অন্তর্যামী!

গোমুখী দেখেছিস্? বরফগলা জল হুহু করে বেরিয়ে আসছে। ও আর কিছুই নয়। পাহাড়-পর্বতের দুর্গম পথ ভেঙে ওসব দেখে লাভ কি? ভাল লাগে!—এই তো। আনন্দ,—আনন্দ! কিন্তু বুকের আগুন না নিভলে আনন্দ কোথায় পাবি?

আউলিয়া হতভম্বের মত সাধুর দিকে তাকিয়ে থাকে।

সাধু বলতে থাকেন,—গঙ্গাজলে আগুন নেভে না বাবা! প্রকৃতিকে জাগাতে হবে। বাইরের প্রকৃতি মায়ায় ফেলে, অন্তরের প্রকৃতিকে জাগিয়ে তুলতে হবে। তোর আমার ভেতরেই ঘুমিয়ে রয়েছে কুলকুণ্ডলিনী। তাকে জাগাতে হবে।

কারণ-বারি চাই! কারণ-বারিতে কুলকুণ্ডলিনীর তর্পন করতে করতেই জেগে উঠবে।

তারপর সাধু নিজের নাভিকুণ্ডলীতে আঙুল রেখে বললেন,—এখানেই সব। গোমুখীই বল্, আর গঙ্গোত্রীই বল্, এখানেই।

সাধু বোতল থেকে একটি পাথরের গ্লাসে তরল পদার্থ ঢেলে ঢক্-ঢক্ ক'রে গিলতে লাগলেন।

মা আনন্দময়ীই তোকে ঠিক সময়েই পাঠিয়েছেন। ভয় নেই, কুলকুণ্ডলিনী জাগিয়ে দেবো।—বারবার তরল পদার্থ গিলতে লাগলেন সাধু।

এরকম অনেকক্ষণ চলল। এক সময় রক্তিম-গেরুয়া-পরা এক মহিলা ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন। তাঁরও কপালে মস্ত বড় সিঁদুরের ফোঁটা।

ভৈরবী! এই সাধুজীর সেবার ব্যবস্থা করো। মা আনন্দময়ী তাঁর চেলাকে এতদিনে পাঠিয়ে দিয়েছেন। জয় মা! আনন্দময়ী!

ভৈরবীর হেপাজতেই আউলিয়া সেদিন থেকে সেখানে রয়ে গেল বাইরের দিকে একটা ছোট্ট কুঠরিতে তার শোবার জায়গা হল তান্ত্রিকসাধুর ফাইফরমাস অজস্র। সাধুর চেলা হয়েছে আউলিয়া।

ভক্তজন আসে। তাদের মুখে শোনে কত আলৌকিক কাহিনী সাধুবাবার না কি আশ্চর্য ক্ষমতা। মরা-মানুষ বাঁচাতে পারেন। একজনের না কি দশবছর আগে স্ত্রী মারা গেছে। সে এল সাধুবাবার কাছে দীক্ষা নিতে। সাধুবাবা বললেন,—সস্ত্রীক দীক্ষা নিতে হবে। প্রকৃতি ছাড়া পুরুষ পূর্ণ হতে পারে না। প্রকৃতি চাই।

সেই ভক্ত সব কথা খুলে বললে। সাধুবাবা বললেন, বহুত আচ্ছা!

ভক্ত-শিষ্য সামনে বসেছে। তার পাশে আর একখানি আসন শূন্য। সাধুবাবা ধ্যানমগ্ন হলেন। কারণ-বারি ছিটিয়ে দিলেন সেই শূন্য আসনে। আশ্চর্য কাণ্ড! ভক্ত-শিষ্য শূন্য আসনের দিকে তাকিয়ে দেখে তার দশবছর আগে মরে-যাওয়া স্ত্রী এসে ব'সে আছে সেই আসনে। সাধুবাবা হু'জনকে দীক্ষা দিলেন।

অমাবস্যায় আশ্রমে উৎসব লেগে যায়। বড় বড় শেঠেরা ভেট পাঠায়। হোম-যাগও হয়। কারণ-বারি প্রসাদ পায় শিষ্যেরা। কই, আউলিয়া যে আশায় এখানে রয়ে গেল, তার সে আশা তো পূর্ণ হ'ল না। সাধুবাবা বলেন,—সময় হয় নি বাবা! কুলকুণ্ডলিনীকে জাগাতে সময় লাগবে।

মাস হুই কেটে গেল! ভৈরবীকে দেখলে আউলিয়ার কেমন যেন মায়া লাগে। ভৈরবীর মুখের হাসি যেন বিষাদ-মাখা! তবু ভৈরবীর কথা বড় মিষ্টি। স্নেহ ঝরে তার কথায়। কিন্তু তার চোখে-মুখে যেন কি এক বেদনা ফুটে উঠেছে। যন্ত্রের মতই তিনি কাজ করে যাচ্ছেন।

গভীর রাত্রে ওদের ঘর থেকে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কান্নার শব্দও আসে। সে কোনো কিছুই বুঝতে পারে না। কে কাঁদে এমন ক'রে?

একদিন শুনতে পায় কে যেন রাগে গর্‌গর্‌ করে বলছে—"চুপ কর মাগী! ছেলের জন্যে মরে যাচ্ছেন। তখন তো মনে ছিল না!" —আউলিয়া কিছুই বুঝতে পারে নি। তবে কি ভৈরবীর ছেলে মারা গেছে? তার জন্যই কাঁদে ভৈরবী। এক একবার ভাবে ভৈরবীকে জিজ্ঞেস করে, কিন্তু সাহস হয় না। ওকথা তুলে তাঁর মনে আঘাত দিয়ে লাভ কি?

আর একদিন শুনতে পায়—'আমি বলে দেবো। সবাইকে ডেকে বলে দেবো। তোমার সাধুগিরি বেরিয়ে পড়বে। তারপর ধ্বস্তা-ধ্বস্তি আব পটাপট শব্দ। বাইরে প্রচণ্ড ঝড় উঠেছিল; আর কিছুই শুনতে পায় নি আউলিয়া। কিন্তু তার আর ঘুম হয় নি। সারারাত ব'সেই কাটিয়েছে।

পরের দিন সাধু ভোরবেলায়ই কোথায় বেরিয়ে গেলেন। তিনি নাকি তাঁর কোন্‌ এক শিষ্যের ডেরায় গেছেন।

ভৈরবীর ঘরে গিয়ে আউলিয়া হাজির হ'ল। এ কি? ভৈরবীর কপাল কেটে গেছে। তুলোর পট্টি লাগিয়ে রেখেছেন ভৈরবী।

আউলিয়াকে দেখতে পেয়ে ভৈরবী কাছে ডাকলেন,—তুমি লেখা পড়া জানো কি বাবা?

কেন কি হয়েছে?

আমাকে একখানা চিঠি লিখে দিতে হবে।—ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলেন ভৈরবী।

—কি হয়েছে মা?

—ডাকতের হাতে পড়েছি। কি আর বলব? আমার ছোট্ট একটি ছেলে আছে, তার কথাই রাতদিন ভাবি?

—আপনাদের ছেলে আছে?

—ওর নয় আমার। ঘরে সাত বছরের সুবলকে রেখে ওর সঙ্গে বেরিয়ে এসেছি বাবা! আমার সুবল!—ভৈরবী আর কান্না থামাতে পারেন না।

আউলিয়া হতভম্বের মত দাঁড়িয়ে থাকে।

—আর কিছু নয়, একটা চিঠি লিখে আমার সুবল কেমন আছে জানতে চাই।

—চিঠি? কাকে চিঠি লিখবে মা?

—তাই তো ভাবি। কুলের মুখে কালি মাখিয়ে বেরিয়ে এসেছি। কাকে চিঠি লিখব?

—তুমি আমার সঙ্গে দেশে চল মা!

—দেশে? কোন্ মুখে দেশে ফিরব বাবা? আমার সুবল তো আমায় চিনতে পারবে না। আর আমি ফিরলে তো সুবলের চাঁদপারা মুখেই কালি পড়বে। না আমি যাব না।

—তা হলে এই সাধুর কাছেই থাকবে?

—না। আমি আমার পথ দেখবো বাবা! একটা কথা, তুমি দেশে ফিরে গিয়ে একটিবার নবিনগরে যেয়ো। নবিনগরের বাড়ুজ্জে বাড়ির সুবলের মা আমি। আমার সুবল কেমন আছে। আমাকে চিঠি লিখে জানাবে।

আউলিয়ার কাছে বাংলাদেশ-জোড়া নবিনগরের বাড়ুজ্জে বাড়ির ছবি যেন ফুটে ওঠে। সাত বছরের ছেলে সুবল মাকে খুঁজছে। বাইরে সঙ্গী-সাথীর সঙ্গে খেলাধুলা ভুলে গিয়ে এঘর-ওঘরে উঁকি-ঝুকি মারছে একটি নাদুস্ নুদুস্ ছেলে।

ভৈরবী কাঁদছে—বলো বাবা! আমার কথা রাখবে?

আউলিয়া উচ্চারণ করে—নবিনগর!

হ্যাঁ, নবিনগর। ভাটেরা ইস্টিশান থেকে দু'কোশ পথ। গাঁয়ের পাশেই শিবমন্দির। মন্দিরের চূড়ো ইস্টিশান থেকেই দেখা যায়। সোজা পথ। অবশ্যি পাকা রাস্তায় গেলে অনেক ঘুরতে হবে। তুমি ইস্টিশানের পেছনে যে একটা চাতাল আছে, সেখানে দাঁড়ালে মন্দিরের চূড়ো দেখতে পাবে। মেঠো পথে চলে যাবে। গাঁয়ের সামনেই একটা মস্ত বড় ঝিল। তারপর রায়েদের আমবাগান। আমবাগানের গা-ঘেঁষে পথটা চলে গেছে চাটুজ্জেদের বাড়ির দিকে। চাটুজ্জেবাড়ির সামনে গিয়ে ডানহাতে বেঁকেই দেখতে পাবে সব

ধানের গোলা। ওসব গোলাই বাড়ুজ্জেবাড়ির।

নিশ্চয়ই যাবো মা। তুমি নিশ্চিন্ত থাকো। কিন্তু এই ডাকাত সাধুর কাছে তোমাকে ফেলে রেখে তো যেতে পারিনে। তুমি আর কত সহ্য করবে? আমি আজই এখানকার সবাইকে ডেকে এনে ওর বুজরুকি বের করে দেবো।

—না বাবা! ওসব ক'রো না। আমার জন্যে ভেবো না। শুধু আমার সুবলের খবর পেলেই আমি শান্তি পাবো। তুমি সত্যি যাবে বাবা! সুবলকে চিনতে তোমার কষ্ট হবে না। কপালে লালজড়ুল আছে।

—না, চিনতে কষ্ট হবে কেন?

—অনেক দিন দেখিনি বাবা। পাঁচবছর হল। এখন নিশ্চয়ই বড় হয়ে উঠেছে। তার বড় কষ্ট হচ্ছে। তার যে মা থেকেও নেই আমার শাশুড়ি তাকে বড্ড ভালবাসেন।

—পাঁচ বছর? তাহলে নিশ্চয়ই এখন সুবল বারো বছরে পড়েছে।

—তা হবে বাবা! এতো কি হিসাব রাখি! কি যে ভুল করেছি। তোমার এই সাধুর পাল্লায় প'ড়েই নিজের সর্বনাশ করেছি?

—কেন এমন করলে মা?

ওকথা জিজ্ঞেস ক'রো না বাবা! সুখেই ছিলেম, কিন্তু তা সইল না। সবই কপাল বাবা! সবই কপাল!

ভৈরবীর কপালের দিকে তাকিয়ে আউলিয়া তাঁর এ দুর্ভাগ্যের কোনো কারণই খুঁজে পায় না। সে শুধু মনে মনে ভাবে—ভুল, ভুল করেছে ভৈরবী। তাঁর ছেলে সারা জীবন মাকে খুঁজবে। আর অভিসম্পাত করবে তার হারানো মাকে। ভৈরবী কাউকে অভিসম্পাত করতে পারবে না, তাঁর আকুলি বিকুলি প্রার্থনা পৌঁছাবে শূন্য আকাশে।

—তুমি আজই চলে যাও বাবা! আমি তোমাকে টাকা দিচ্ছি।

না, মা। টাকা লাগবে না।

—সে যে অনেক দূর দেশের পথ বাবা!

—ঠিক আছে। আমি যেতে পারবো।

ভৈরবী দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে।

—সে এখুনি ফিরে আসবে বাবা! সে এসব ব্যাপার যেন জানতে না পারে। তুমি পালিয়ে যাবে। আর এক কথা, সুবলের বাবা বড় আগোছাল মানুষ। সময়ের জ্ঞানও থাকে না। কখন যে খায় তারও ঠিক নেই। খেয়েছে কি না, তাও অনেক সময় ভুলে যায়।

একটুখানি থামে ভৈরবী। তারপর আবার বলতে থাকে।

রাতদিন পড়া আর পড়া। এই নিয়ে ব'সে থাকে।

একটু হাসির ঝিলিক দেখা দিয়ে ভৈরবীর মুখে আবার কালিমা দেখা দিল। ভৈরবী বলতে লাগল—সেই মানুষটারও বড় কষ্ট হচ্ছে। কি করব আর তো কোনো উপায় নেই। তাঁর কথাও চিঠিতে লিখবে বাবা, বাড়ুজ্জেদের ছোট ছেলে সে। চিনতে কোনো কষ্ট হবে না।

—ওদের ফেলে আসতে তোমার কষ্ট হ'ল না মা?

—কষ্ট!—ভৈরবীর বুক ফেটে যেন কান্না বেরোতে চায়। দরদর ক'রে চোখে জল ঝরে।

আউলিয়া আর কোনো কথা জিজ্ঞেস করতে সাহস করলে না। যে নারী নিজের ফাঁদে নিজেই পড়েছে, তাকে কি সান্ত্বনা দেবে! তার যে কোনো উপায় নেই। সব হারিয়েছে ভৈরবী। অথচ সবই তাঁর রয়েছে। কিন্তু আমার বলে দাবী করার অধিকার হারিয়েছে।

এই তো সমাজ। এই তো জীবন! এগিয়ে যেতে যেতে পেছন ফিরে কেউ হাসির ঝিলিক দেখে, আর কেউ দেখে ভয়াল বিদ্যুৎ। যা-ই দেখুক, ফিরে যাবার উপায় নেই।

উতলা মন নিয়ে তান্ত্রিকের আশ্রম থেকে বেরিয়ে এল আউলিয়া।

নাঃ, সে তান্ত্রিকের চেলা হয়েছে। গঙ্গার বালি দিয়ে ঘষে ঘষে কপালের সিঁদুরের ফোঁটা মুছে ফেললে। এমন ঘষেছে যে কপালের চামড়া ছড়ে গেল। তান্ত্রিকের দেওয়া লাল রঙে ছোপানো কাপড় আর জামা! এগুলো কি করবে? তার নিজের কাপড় চোপড় তান্ত্রিকের আশ্রমেই রয়ে গেছে।

আর সে সেখানে ফিরে যাবে না। হরিদ্বারের পথে পথে ঘুরতে লাগল আউলিয়া। সন্ধ্যায় সে গিয়ে উঠল এক মৌনী সাধুর আশ্রমে। আউলিয়ার মুখের দিকে তাকিয়ে মৌনাসাধু যেন কি বুঝতে পারলেন। স্লেটে লিখে কি দেখালেন তিনি।

মৌনীসাধুর লেখা পড়ে আউলিয়ার চোখে জল এ'ল। সাধু তাকে কাপড় চোপড় ছেড়ে ঘরের কোণে রাখা গেরুয়া পরতে বলেছেন। আর গেরুয়া আলখাল্লা পরতে অনুরোধ করেছেন। তা না হ'লে শীতে মরে যাবে। আউলিয়া মৌনাসাধুর আশ্রমে কাপড়-চোপড় বদলাল। সে জানে শেঠেরা সাধুদের এসব দিয়ে যায়। সুতরাং কোনো আপত্তিই করল না। সেদিন মৌনীসাধুর ডেরায়ই রাত কাটাল আউলিয়া।

রাত্রে ঘুম হল না। হুহু করছে তার মন। ভৈরবীর অশ্রু-সজল মুখখানি বার বার মনে পড়ছে। তাঁর সুবলকে খুঁজে বের করতে হবে। কল্পনায় সুবলের মুখ আঁকে। ঘুমের ঘোরে নবিনগরের শিবমন্দিরের চূড়া দেখে।

পরের দিন সাধুবাবার কাছে বিদায় নিয়ে তান্ত্রিকসাধুর আশ্রমের পথে ফিরে চলল আউলিয়া। আশ্রমের কাছে এসে দেখে বেলগাছের তলায় অনেক লোক জড় হয়েছে। ভৈরবী-মা দেহরক্ষা করেছেন। তাঁকে নিয়ে বেরিয়ে আসছে ভক্তেরা। আগে আগে চলেছেন তান্ত্রিকসাধু। চীৎকার করে করে তান্ত্রিক বলছেন—জয় মা আনন্দ-ময়ী!

এ দৃশ্য আউলিয়া সহ্য করতে পারলে না। বন্ বন্ ক'রে তার মাথাটা ঘুরে গেল। তার মনে হল,—একটা পাথর তুলে সাধুর মাথায়

ছুঁড়ে মারে।

কোনো রকমে নিজেকে সামলে নিয়ে আউলিয়া সেখান থেকে ছুটে পালাল।—ভৈরবী মা দেহরক্ষা করেছে? না, এ হতে পারে না। তাঁর সুবলের খবর তাঁকে জানাতে হবে। সেই আগোছাল মানুষটার কথাও জানাতে হবে। কোথায় নবিনগর? খুজে বের করতে হবে।

ছুটছে আউলিয়া। সে যে কথা দিয়েছে,—চিঠি লিখে জানাবে। সুবলের খবর বের করতে হবে। কপালের ডান ধারে লাল জড়ুল। সাত আর পাঁচ বারো বছর। নবিনগরের বাড়ুজ্জেদের বাড়ি। ভাটেরা ইস্টিশন।

গাঁয়ের পরে গাঁ—মাঠের পর মাঠ, বন জঙ্গল পেরিয়ে চলেছে আউলিয়া। কোথাও বা সাধু দেখে কেউ কেউ খেতে দেয়। কোন দিন বা উপবাসে কাটে। এক শেঠজী সাধুসন্ত দেখে তাকে মোটরে ক'রে দিল্লী পৌঁছে দিলেন।

আলখাল্লা আর গেরয়ার মাহাত্ম্য আজ ভুলতে পারেনি আউলিয়া। এ তু'য়ের কাছে শেঠেরাও মাথা নোয়ায়।

তারপর দিল্লীতে তু'চার দিন ঘুরেফিরে মথুরা বৃন্দাবনের পথ ধরল আউলিয়া। দেখতে হবে। রাধাকৃষ্ণের পদরজ দিয়ে গড়া বৃন্দাবন দেখতে হবে। সেখানে নাকি এখনো নূপুরের ধ্বনি শোনা যায়। কদম্ববনে বাঁশির আওয়াজ শুনেছে কেউ কেউ। যমুনার জলে ব্রজগোপীর জলকেলিও ভাগ্যে থাকলে দেখা যায়।

বৃন্দাবন! কৃষ্ণরাধার নাম যেন আকাশে বাতাসে ভাসছে। কিন্তু কোথায় কৃষ্ণ আর কোথায় রাধা!

মন্দিরে মন্দিরে ঘুরে বেড়ায় আউলিয়া। শুধু মূর্তি—মূর্তি তো মানুষের গড়া। নিকষ কালো এই কৃষ্ণের মূর্তির মাঝে কি আছে? আর রাধার সোনালী মূর্তি তার পাশে। এ কিসের জন্যে?

প্রেম?—আলো আর অন্ধকারে জড়ানো বুঝি প্রেম!—আউলিয়ার

মনে অনন্ত জিজ্ঞাসা।

কেউ উত্তর দিতে পারে নি। এক মহান্ত বৈষ্ণব রাধাতত্ত্বের ব্যাখ্যা শুনিয়েছিলেন। কিন্তু তার কিছুই আউলিয়া বুঝতে পারে নি।

রা অর্থাৎ হ্লাদিনী শক্তি অন্তরে আছেন, তার আত্মার রমণেই আনন্দ।—রা-এর কোনো মানে বোঝেনি আউলিয়া আর হ্লাদিনী শক্তি তার কাছে দুর্বোধ্যই ঠেকেছিল। এসব তত্ত্ব কথা বুঝে তার লাভ নেই। কিন্তু ওরা দিনরাত কেমন বুঁদ হয়ে বসে এই তত্ত্ব কথার আলোচনা করে। কোথাও হয় নাম সংকীর্তন, কোথাও কৃষ্ণলীলা।

যমুনার জলের দিকে তাকিয়ে থাকে আউলিয়া—কই ব্রজগোপীদের জলকেলি তো দেখতে পাই নে? কদমগাছ দেখলেই থমকে দাঁড়ায়। ব্রজের সেই কিশোর প্রেমিককে খুঁজে বেড়ায়।

না সবই শূন্য। কোন যুগে এই বৃন্দাবনে এক রাখাল ছেলে বাঁশি বাজিয়েছিল। তার বাঁশির সুরে ব্রজগোপীরা উতলা হয়ে উঠেছিল। আর কুলমানের ভয় না ক'রে এক কিশোরী বধূ ছুটে বেরিয়ে যেতো। দাঁড়াতো গিয়ে সেই রাখাল বালকের পাশে।

ওরা রাধাকুণ্ড, শ্যামকুণ্ড, কেলিকদম্বের বন দেখায়। কিন্তু সবই ফাঁকা। ব্রজধাম জুড়ে শুধু ধূলো আর ধূলো। ওরা বলে ব্রজের রজ।

চুপ ক'রে যমুনার পারে দাঁড়িয়েছিল আউলিয়া।

ওমা! এ আবার কি এক সাধু—উচ্ছল মেয়েলি কণ্ঠের স্বর।

আউলিয়া ফিরে তাকায়। তরুণী এক মেয়ে। সঙ্গে এক বিধবা মহিলা।

খিলখিল করে হাসছে সেই মেয়ে—আবার আলখাল্লা পরেছে! ও সাধু! শোনো শোনো!

মহিলাটি বলেন,—চুপ কর বানু! সাধু-সন্ন্যেসী নিয়ে ঠাট্টা করতে নেই।

সব কথাই আউলিয়ার কানে যায়। মহিলাটি কিশোরীর হাত ধরে রয়েছেন। কিন্তু সে আউলিয়ার দিকে ছুটে আসতে চায়।

ও সাধু! তোমার বুঝি রাধা নেই?

মহিলাটির মুখ বিরক্তিতে ভ'রে উঠল--চুপ কর বলছি।

রান্নু কিন্তু তার হাত ছাড়িয়ে নেবার চেষ্টা করছে। তারা যমুনার জলে স্নান করে ফিরছেন মনে হল। মহিলার হাতে ভিজে কাপড়ও রয়েছে। আর মেয়েটির কাঁখে একটি ছোট ঘড়া।

আউলিয়া কৌতুক বোধ করে। সে ভাবে মেয়েটির মাথায় নিশ্চয়ই ছিট আছে। সুন্দর সুঠাম দেহ; গায়ের রঙও ফর্সা। গৌরী বলা চলে। বয়সও খুব বেশী ব'লে মনে হল না।

মেয়েটি বলছে,--তোমার রাধা নেই, তাই বুঝি এমন বিবাগী সেজেছো।

বিধবা মহিলাটি লজ্জা ও সংকোচের মাঝে যেন দিশেহারা হ'য়ে মেয়েটির হাত ধরে টানাটানি করতে লাগলেন।

আউলিয়া এগিয়ে গিয়ে বললে—কি হ'ল মা?

—ও পাগলা বাবা! তুমি কিছু মনে ক'রোনা। বেশ ভালই থাকে, মাঝে মাঝে অমন পাগলামি করে।

আমি পাগল হতে যাবো কেন? তুমি মার কথা বিশ্বাস করোনা সাধু। চল আমার সঙ্গে, তোমার রাধাকে পাইয়ে দেবো।

বিধবাটি বললেন—ছিঃ রান্নু, উনি কি মনে করবেন! চলো বাড়ি যাই।

না, আমি যাব না। ওকে নিয়ে চলো। বেঁকে দাঁড়াল মেয়েটি।

আউলিয়া বললে—বেশ তো দিদি! তুমি মায়ের সঙ্গে যাও। আমি পরে যাবো।

চোখ মুখ রাঙা করে মেয়েটি বললে—কি বললে, দিদি? না, না আমি রাইকিশোরী। দিদি নয়।

আচ্ছা, তাই হবে বোন্।

আবার বোন! বল রাইকিশোরী।

মহিলা বিরক্তির সুরে বললেন, ওকি হচ্ছে রান্নু!

আউলিয়া বললে, থাক মা, থাক! দিদি আমার রাইকিশোরী।

হিঃ হিঃ করে হেসে উঠল তরুণী মেয়ে।

বাঃ-বাঃ, আমি তোমার রাইকিশোরী। এবার চল আমার সঙ্গে।

মহিলা বললেন, তা হ'লে কষ্ট ক'রে আমার ঘরে চলুন বাবা! ও যখন খুঁটি ধরেছে তখন আর রক্ষা নেই।

মহিলাটি তার মেয়েকে নিয়ে এগিয়ে চললেন। আব আউলিয়া তাদের পিছু পিছু চলল। মাঝে মাঝে তরুণীটি ফিরে ফিরে তাকায়, পাছে আউলিয়া পালিয়ে যায়।

মহিলা বক্‌তে বক্‌তে চললেন, আমার হয়েছে যত জ্বালা! বোজ বায়না ধববে যমুনায় স্নান কবতে যেতে হবে। জলে সাঁতার কাটবে, ঘড়াটা ভাসিয়ে দেবে। সে কি কাণ্ড! সহজে কি উঠে আসে!

আউলিয়া ভাবে এমন সুন্দর মেয়ে তার মাথা খাবাপ হ'ল!

মেয়েটি ফিরে তাকায় আর বলে, চল সাধু, তোমার রাধা যে তোমাব বিচ্ছেদে কাঁদছেন।

ছিঃ, সাধুমানুষ। ওসব বলতে নেই বাজু। বিধবাটি ধমক দেন।

সাধু নয়, সাধু নয়, ব্রজের সখা।

হাসিতে ফেটে পড়ে মেয়েটি। ছলছল ক'রে ওঠে ঘড়ার জল।

নাঃ, আব তোকে ঘর থেকে বের হতে দিচ্ছি না।

দেবে না? আমার ব্রজেব সখাকে নিয়ে বেরিয়ে পড়ব। তোমাকে আর কষ্ট করতে হবে না মা! আজ আমার ব্রজের সখাকে পেয়ে গেছি।

কথা বলতে বলতে পথ ফুরিয়ে যায়। একতলা বাড়ি। নীচে পাকা মেঝে। উপরে টালি। বাংলোর মতো দেখতে। ঘরের সামনে ছোট্ট বাগানও রয়েছে। নানা ফুলের গাছ। এককোণে তুলসীর বেদী।

মহিলাটি অনুনয়ের সুরে বললেন,—একটু বিশ্রাম ক'রে যাও বাবা!

আউলিয়ার তেমন ইচ্ছে ছিল না! কিন্তু মেয়েটি বললে, শুধু বিশ্রাম? তোমাকে এখানে থাকতে হবে ব্রজের সখা!

মহিলাটি প্রায় অসহায়ের মতো বললেন,—তাই হবে। তোমার মুখ দেখে মনে হচ্ছে, তোমাকে বিশ্বাস করতে পারি। তুমি কোথায় থাকো বাবা।

কোথাও ঠাঁই নেই মা! ঘুরে ঘুরে এখানে এসে পড়েছি। সত্যি কথা বলতে কি আমি সাধুও নই। বুকের জ্বালা জুড়াতে ঘুরে বেড়াতে বেড়াতে এ রকম হয়ে গেছি।

মেয়েটি বললে,—ভয় নেই, তোমার জ্বালা জুড়িয়ে দেবো। ঠাঁইও পাবে ব্রজের সখা!

মহিলা বললেন,— যদি কিছু মনে না করো, দুদিন থেকে যাও বাবা! এখানে আমি হতভাগী আমার মেয়েটিকে নিয়েই থাকি।

—আর কেউ নেই মা?

—না, সে অনেক কথা! তোমার কোনো কষ্ট হবে না বাবা! বাইরে ঘরও রয়েছে। মহিলার কথার মাঝে অনুনয় ঝরে পড়ে।

—দেখবার কেউ নেই বাবা! এখানে ভাল ডাক্তার কবরেজও নেই। মেয়েটি এমন হয়ে গেল!

মহিলার কথা শুনে আউলিয়ার দুঃখ হয়, আহা, বিধবা মানুষ, এই বিদেশ বিভূঁইয়ে পাগল মেয়েকে নিয়ে দিন কাটাচ্ছেন। কিন্তু মনে মনে প্রশ্ন জাগে, সত্যি কি এদের কেউ নেই?

এদিকে মেয়েটি হৈ-চৈ আরম্ভ করে দিয়েছে। আউলিয়া একখানি টুলের উপর বসল। মহিলাটি ভিজে কাপড়গুলো এক পাশে রেখে ঘরের ভেতর গেলেন।

—মা! আমার ব্রজের সখার ভোগারতির কি হবে?

—তোকে ভাবতে হবে না রানু! আমি সবই করছি।

—বেশ! দাও আমি জলখাবার দিয়ে আসি।

আউলিয়াকে হাত-পা ধোবার জল দেওয়া হল।

নাও ব্রজের সখা, হাত-পা ধুয়ে ফেল।

রেকাবীতে ক'রে দুটি লাড্ডু আর এক গ্লাস জল নিয়ে এল মেয়েটি। আউলিয়া তার হাত থেকে রেকাবী আর জলের গ্লাস নিল। আউলিয়া যতক্ষণ না লাড্ডু দুটি খেয়েছে, মেয়েটি দাঁড়িয়ে রইল।

গুন্ গুন্ করে গান ধরেছে মেয়েটি 'দুহু কোরে দুহু কাঁদে, বিচ্ছেদ ভাবিয়া'। একই পদ বারবার গায়। আর কাঁদে।

পাগলের খেয়াল। নীলশাড়ি, লাল রঙের পাড়। পিঠে ছড়ানো চুল। বড় বড় আয়ত দুটি চোখ। চোখে হাসি কিন্তু কি যেন এক জ্বালা আছে সে হাসিতে।

মেয়েটি আউলিয়াকে বসিয়ে রেখে ঘরের ভেতর চলে গেল। আউলিয়ার কানে মা ও মেয়ের কথা ভেসে আসে।

—বুঝলে মা! ব্রজের সখা বড় ছেলেমানুষ। ও আবার সাধু হয়েছে। যত সব বদ্ খেয়াল। আজই মধু নাপিতকে ডেকে ওর চুল দাড়ি ছাটিয়ে দাও।

—চুপ কর রানু! ও শুন্‌লে কি মনে করবে?

—এই মনে করা নিয়েই তোমার যত গোল মা! লোকটা কি তোমার জ্বালায় বিবাগী হয়ে ঘুরে বেড়াবে!

আচ্ছা, আচ্ছা, দু'দিন যাক্।

আউলিয়ার হাসি পায়। মেয়েটি একবার বেরিয়ে এসে আউলিয়াকে বললে, চল সখা! আমার কৃষ্ণসখাকে দেখবে। আউলিয়া মেয়েটির সঙ্গে ভেতরে গেল।

পূজার ঘর! বেদীর উপর শ্রীকৃষ্ণের ছবি।

কথা বলে না। ছবি শুধু ছবি হয়েই রইল। এত ভোগ দি, মা কেমন পূজোও করে। ফুল-চন্দনে সাজায়। কিন্তু কথা বলে না, সাড়াও দেয় না। কাঁদি, কত কাঁদি।

আউলিয়া নির্বাক।

জানো, ছবির ভিতর থেকে কৃষ্ণসখা পালিয়ে গেছে। আর কোনোদিন ফিরে আসবে না। মানুষ চলে গেলে কি আর আসে?

রাইকিশোরী কত কেঁদেছে, 'মরিলে বাঁধিয়া রেখো তমালের ডালে'। সে আর ফিরে এলো না। রাইও নেই, মরে গেছে। এতকাল ধরে ওই মানুষগুলো ছবি নিয়ে আর মূর্তি নিয়ে বসে আছে। সে তো আর আসবে না। এ কথাটা মাকে বোঝায় কে?

দর দর করে মেয়েটির চোখ দিয়ে জল ঝরে।

পায়ের শব্দ শুনে আউলিয়া ফিরে তাকায়। মাও এসে পাশে দাঁড়িয়েছেন। তাঁরও চোখে জল।

মা বললেন, এমন ক'রেই আমার দিন কাটে বাবা! কি যে হ'ল বুঝতেই পারিনে। এ মেয়েকে নিয়ে আমি কার কাছে যাবো! তুমি সাধুসন্ত মানুষ, তুমি কিছু করতে পারো বাবা?

আউলিয়া জবাব দেয়, সব ঠিক হয়ে যাবে মা! এতো পাগলামি নয়।

হঠাৎ মায়ের কথা শুনে মেয়েটি ফিরে দাঁড়ায়। তার চোখে মুখে বিরক্তি ফুটে উঠছে। মাকে বললে, আমাকে নিয়েই তোমার জ্বালা! ওরকম করলে সে তো ফিরে আসবে না।—মেয়েটি ছুটে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

মা বললেন,—ওই তো ওর পাগলামি বাবা! আজ তিনবছর হল। দিন দিন পাগলামি বাড়ছে। কোন দিন আবার চীৎকার করে; রাত্রে বেরিয়ে পড়ে। পাড়ার লোকেরা বিরক্ত হয়। কতজন কত কথা বলে। আমার পোড়া কপাল বাবা!

পাগল! আউলিয়া মনে মনে ভাবে,—আমি তার কি করতে পারি? বুকের জ্বালায় মানুষ পাগল হয়ে যায়। হারিয়েছে নিশ্চয়ই। কিছু হারিয়েছে রাইকিশোরী।

আশ্চর্য এই রাইকিশোরী। অন্য কোনো পাগলামি নেই। কাঁদে আর গুনগুন করে গানও গায়।—রাই কানুর গান। বাধা দিলে, মানা করলে ক্ষেপে যায়।

এ আবার এক মায়া! রাতাবী আর ভৈরবীর কথা মনে পড়ে যায়। হু হু করে ওঠে মন।

এবার বিদায় নেবো।

দাঁড়াও ব্রজের সখা, তোমার রাই আসবে। এখনই পালাবে কোথা ?

পাড়ার লোকেরা আড়ালে কত কথা বলে। কুৎসিত সে সব কথা। সামনে যারা মহিলাটিকে মাসীমা বলে তোয়াজ করে, তারাই পেছনে টিটকারি মারে !

এবার এক সাধু জুটিয়েছে !—কুৎসিত ওদের ইঙ্গিত।

—বাবাজী ! ওদের ফাঁদে পড়েছো বুঝি ! ওই বিধবাটি কম নয়। মেয়েটা মন্দ ছিল না। ওর মাই মাথাটা বিগড়ে দিয়েছে। বিয়ে দেবে মেয়ের ? কণ্ঠিবদল করবে না। সুন্দরদাস বোষ্টমকে নাজেহাল করলে।

সবই আমরা জানি। এখানেই মেয়েটার জন্ম হল। কলকাতা থেকে এসেছিল। সঙ্গে এলেন এক ভদ্রলোক। আমরা ভেবেছিলাম স্বামী স্ত্রী।

যত সব কেলেঙ্কারি ! বাড়ি কিনলেন। ওদের থাকবার বন্দোবস্ত করলেন। তারপরে সেই যে উধাও হয়েছেন, আর দেখা নেই।

বিধবা ! হ্যাঁ, বিধবাই বটে। হাটে হাঁড়ি ভেঙে দিল নন্দা বৈষ্ণবী ! সেও সেই দেশেরই মেয়ে। বললে, ওমা ! ভাশুরের সঙ্গেই বেরিয়ে এসেছে। ঢি ঢি পড়ে গেছে দেশে। কলকাতার নয় শিয়ালটেকের রায়বাড়ির বউ !

তুমি ওখানে পড়ে আছো কেন সাধুবাবা ! তোমাকেও ভুলিয়েছে বুঝি ? তা আপন জন ছেড়ে বিবাগী হয়ে বেরিয়েছো। আবার কেন ?

আউলিয়াও ভাবে, সত্যি আবার কেন ? না, ওরা তো তার কাছে কোনো প্রত্যাশাই করে না !

নন্দা বৈষ্ণবীর সঙ্গেই দেখা হয়ে গেল। শিয়ালটেকের নন্দা বৈষ্ণবী। বৃন্দাবনে রাধামাধবের পায়ে ঠাঁই নিতে এসেছে।

কণ্ঠিবদলে অরুচি ধরে গেছে। তার বৈষ্ণববাবাজী নাকি আর এক বৈষ্ণবীর কণ্ঠে ঝুলছেন! এবার রাইকানু ভরসা!

মুখ বাঁকিয়ে কথা বলেন গৌরদাস বাবাজী—যত নব বিধবার মরণ বাবা! বাংলা মুল্লুকের যত আবাগীতে বৃন্দাবনের মাঠঘাট ভরতি হয়ে গেল। ওদের আর মরবার জায়গা কোথা? দেখতে পাও না, ভিক্ষা মাগে কারা!

যত সব অনাথা বিধবা!

এক মোহান্ত বলেছিলেন, এদের দেখলে কষ্ট হয় বাবা! কারো কারো বাপ-মাও নাকি মেয়েদের কেলেঙ্কারি ঢাকবার জন্য এখানে ছেড়ে দিয়ে চলে যায়।

আজকাল ওদের পেছনে লোক লেগেছে, যত সব দুষ্টু দালাল। মেয়েদের ভুলিয়ে ভালিয়ে কোথাও কোথাও চালান দেয়। কত কথা শুনেছি। কিন্তু উপায় নেই।

এক মনে শুনছে সেই বিধবার কথা।

—বাড়ির সকলেই তখন মুখ ফিরিয়েছে। জায়েদের ফিস্‌ফিস্ কানাঘুসা আমাকে পাগল করে তুললে। কুলে কালি পড়ল!

কোনো উপায় নেই। আত্মহত্যা করব কিন্তু তারও কোনো হদিস পাইনে। পেটে এসেছে এই অভাগী রানু!

ভাশুর এসে দাঁড়ালেন।—কোনো ভয় নেই বউ মা! তোমার আর এখানে থাকা চলবে না। তোমার কোনো দোষ নেই। দোষ এই রায়বাড়ির।

সেই ভাশুরই আমাকে এখানে রেখে গেছেন। তাঁর চিঠিতে জেনেছি, নিখিল এখন অন্য ভাই আর ভাইপোদের নানা ফন্দিতে ঠকিয়ে কলকাতার কারবার নিজের নামে করে নিয়েছে। ভাশুর তো এত সব বোঝেন নি। নিখিলের উপরেই সব ছেড়ে দিয়েছিলেন। ভাশুর নিবারণ রায় ভুলই করেছিলেন।

আইন পড়েছিল কি না! আজ রায়বাড়ির ছেলেমেয়েগুলো ফাঁকিতে পড়েছে। নিখিল এখন একখানা কাগজ বের করেছে।

দেশের কথা লেখে ; গভরমেণ্টও তাকে ভয় করে বাবা !

আজ মেয়ের আমার কোনো পরিচয় নেই ! কিন্তু তিনি আমার মান রেখেছিলেন বাবা। তিনি বলেছিলেন,—মেয়েকে মানুষ করো বৌমা ! ওতো রায়বাড়িরই মেয়ে।

ভুল করেছিলাম বাবা। কিন্তু বল দেখি সত্যই কি আমি ভুল করেছিলাম। না, না, আমার মনে হয়, এ অবস্থায় ভুল করা ছাড়া কোনো উপায় ছিল না। আমার এ বিয়ের জন্য কি আমি দায়ী ছিলাম বাবা ?

আউলিয়া মহিলাটিকে কোনো উত্তর দিতে পারেনি।—ভুল করেছিল ভৈরবী আর ভুল করেছেন এই মহিলা। তার ফল ভোগ করবে নবিনগরের সুবল, আর বৃন্দাবনের এই রাইকিশোরী রানু ! সুবল ব্যাটা ছেলে, সে মাথা তুলে দাঁড়াতে পারবে। কিন্তু রানু যে অবলা মেয়েছেলে। কি করবে ? তার সত্যিকার পরিচয় জানলে সে যে নিজেই আত্মহত্যা করতে চাইবে। কার কাছে দাড়াবে রানু ? কাকা নিখিলের কাছে দাঁড়ালে নিখিলই ঘেন্নায় মুখ ফিরিয়ে নেবে। অথচ নিখিলেরই ঔরসে তার জন্ম।

এই নিখিলই দেশের মুখপাত্র। তাঁর কাগজে দীনদুঃখীর অন্তরের আকুতি ফুটে ওঠে। দেশের দাবী ফলাও করে পেশ করে নিখিলের কাগজ !

—জানো বাবা ! তিনি আজ বেঁচে নেই , ভাইয়ের সঙ্গে মামলা লড়ে লড়ে তিনি সর্বস্বান্ত হয়েছেন। রায়বাড়ির অন্য অংশীদার নিখিলের ভাইপোরা আজ অন্নের কাঙাল। এক একবার মনে হয় নিখিলের মুখোমুখী গিয়ে দাঁড়াই। কিন্তু মনে ঘেন্না ধরে গেছে। ও মানুষ নয় বাবা !

এত দিন ভাবিনি, রানু ছোট ছিল। কিন্তু যতই সে বড় হচ্ছে ততই ভাবনা আমাকে দিশেহারা ক'রে তুলছে। রানুর বিয়ে দিতে হবে ? কি-ই বা তার পরিচয় ? অবশ্যি রানু জানে তার বাবা নেই। তার বাবা নিবারণ রায় তার ছোট বেলায় মারা গেছেন।

এই নামই রান্নুর জন্মের সময় হাসপাতালে তিনি লিখিয়েছিলেন।

সবই ভাল ছিল বাবা! হয়ত তাতে কোনো ক্ষতিও হত না তিনি বেঁচে থাকলে কিছুই আটকাত না। কিন্তু বাদ সেধেছে আমা পোড়া কপাল।

কাঁচা বয়েস! কি করবে বাবা! রাইকান্নুর নাম নিয়ে কি ও বয়সের ধর্ম ভুলে থাকতে পারে?

সত্যি কথা বলেছিলেন মোহান্ত!

কিন্তু এই মহিলার কথা আলাদা। নিজের বাড়িও আছে টাকাকড়ির অভাব আছে বলে মনে হয় না। শুধু এই অনূঢা পাগ মেয়েকে নিয়েই যত গোলমাল! ওরা যা বলে তা যদি সত্য হ তাহলে—?

এই বিধবা মহিলার কথা শুনেছে আউলিয়া। তার নিজে জবানিতেই শুনেছে।—ব্যাঙ্কে কিছু টাকা আছে বাবা! মাসে মা কিছু কিছু করে তুলে আনি। কিন্তু তাও তো অফুরন্ত নয়। যি রেখে গিয়েছিলেন, তিনি বেঁচে থাকলে কোনো ভয় ছিল না। মা মাঝে তিনি কিছু কিছু পাঠাতেনও।—বলতে বলতে বিধবাটি দী নিঃশ্বাস ফেলেন।

—মেয়েকে লেখাপড়া শিখিয়ে মানুষ করো, রত্নাবউ। নিজে পায়ে দাঁড়াতে পারলে মেয়ের কোনো ভাবনা থাকবে না।—চিঠি লিখতেন তিনি। তাঁর চিঠিও অনেকদিন বন্ধ হয়ে গেছে। আমাদে জন্য তাঁকে কত সহ্য করতে হয়েছে। বিষয়সম্পত্তি নিয়েও ঝগড়া- বিবাদ করতে হয়েছে। নিজের ছোট ভাই ফাঁকি দিল বাবা! তিনি আজ স্বর্গে, আমার সেই ভাসুর আজ স্বর্গে আছেন বাবা!

ভাসুর, তাঁকে ফাঁকি দিল তাঁরই ভাই?

হ্যাঁ বাবা, আমার ভাসুর। তিনি না থাকলে আমার যে কি হ' ভাবতেও পারিনে। বড় বাড়ির সংসার। রায়বাড়ির সেজো বউ আমি। কলকাতায় রায়বাড়ির কারবার—ছাপাখানার ব্যবসা। বড় ভাই আমার ভাসুর, আর ছোট ভাই নিখিল বেঁচে আছে।

কোনো কাজকর্মই দেখতেন না। গানবাজনায় সখ ছিল তাঁর। কিন্তু অন্দরের দিকে তেমন টান ছিল না। সুযোগ নিল ছোট দেওর। সে কলকাতার কলেজে আইন পড়ত; কিন্তু আইন পড়াও তার হয়নি। স্বামী বাইরেই কাটাতেন, অন্দরে আসার মত অবকাশ তাঁব থাকত না। মদে চুর হয়ে যেখানে সেখানে পড়ে থাকতেন। আমার অন্তব জ্বলে উঠত বাবা!

দেওর নিখিলই তখন সুযোগ নিলে। তাকে বিশ্বাস করলাম বাবা! স্বামীকে পাবাব উপায় নেই। বড়বাড়িব ছেলেদের যা দোষ তাঁর সবই ছিল। বয়সের মোহে আমিও ভুল কবলাম। না না, ভুল বলব কেন বলতে পারো?

আউলিয়া মনে মনে আওড়ায়—ভুল, সবই তো ভুল। স্বামী! আর বিবাহ! তাব ভিত্তি তো এক স্বার্থের লালসায় ভরা।

স্বামী মারা গেলেন। বিয়ের দু'বছরও কাটল না। বয়েস তাব এমন কিছুই হয় নি। কিন্তু কুৎসিত রোগ আর দেহের অত্যাচার তা মানবে কেন? স্বামী বেচে থাকতে তবু তাঁর দয়া আমাকে আগলে রেখেছিল, কিন্তু তাঁর মরে যাওয়াটাই হ'ল যেন অভিশাপ। আর তার জন্য যেন আমিই দায়ী। রায়বাড়ির সকলের ভ্রূকুটি যেন আমার উপরে! কুলক্ষণা মেয়ে আমি! দেওর নিখিল আড়ালে চুপিচুপি বললে, ভয় নেই তোমার। তোমাকে নিয়ে আমি কলকাতায় চলে যাবো। কিন্তু আর কলকাতায় যেতে হল না। এক বছর এমনি চলে গেল। দেওর মাঝে মাঝে আসত তাও বন্ধ হ'ল। এদিকে যে আমার সর্বনাশ হয়ে গেল, আমি বুঝতেই পারিনি।

আউলিয়া যেন নাটকের অভিনয় দেখছে! তার সামনে দাঁড়িয়ে একটি বিধবা আর তারই পেছনে দাঁড়িয়ে আছে একটি অনূঢ়া মেয়ে,—খিল খিল করে হাসছে।

রাইকিশোরী!—এখনো মাঝে মাঝে আউলিয়া চমকে ওঠে। রাইকিশোরীর হাসি যেন শুনতে পায়।

—রানুর বিয়ে দেবো খুবই আশা করেছিলাম! পাত্রও জুটেছিল।

এখানেই কাজ করতে এসেছিল একটি সুন্দর ছেলে,—জ্যোতির্ময়! খেয়ালী মানুষ, ছবি আঁকত। যমুনার পারে বসে আপন মনে ছবি আঁকত জ্যোতির্ময়। আমার রান্নুকে তার ভালই লেগেছিল। সবই ঠিক হয়ে গিয়েছিল। দুটিতে বেশ মানিয়েছিল।

সে পালিয়ে গিয়েছে বাবা! চিঠি লিখে জানিয়েছে—আমরা তাকে ঠকিয়েছি। সে অতশত জানত না। মেয়েকে নিয়ে আমি ফাঁদ পেতেছি। যার জন্মের ঠিক নেই—, আরও কত কি লিখেছে।

সেই থেকে রান্নুর কপাল ভেঙেছে বাবা! সেই দিন থেকেই আমার রান্নু এমন হয়ে গিয়েছে।

জ্যোতির্ময় পালিয়ে গেছে। রাই কানুকে খুঁজে বেড়াচ্ছে! যমুনার জল তেমনি বইছে। তমাল আর কদম্ব বন তেমনি রয়েছে। কানু আর ফিরবে না! পাগল হয়ে গেছে রাইকিশোরী!—হ্যাঁ. পাগল হবারই কথা!—আপনমনে বিড়বিড় ক'রে আউলিয়া।

একদিন নয়, দু'দিন নয়, দু'তিন সপ্তাহ কেটে যায়। কি যেন এক মায়ার বাঁধনে আটকে পড়ে আউলিয়া।

রাইকিশোরী বলে,—তুমি থেকে যাও সাধু! খুঁজবে কোথা? সারা দুনিয়া খুঁজলেও তোমার রাইকে খুঁজে পাবে না। সে যে পালিয়ে গেছে। [illegible], বড় চতুর তোমার রাই। বাতাসের সঙ্গে মিশে গিয়ে তোমার কাছে কাছেই ঘুরে বেড়াচ্ছে।

ঝর ঝর ক'রে চোখের জল ফেলে রাইকিশোরী রান্নু।

মান-অভিমান আর পাগলামিতে অতিষ্ঠ ক'রে তোলে রান্নু। এ আবার কি হ'ল? আউলিয়ার মনেও দোলা লাগে। পালাতে হবে. এখান থেকে পালাতে হবে।

গভীর রাত। আউলিয়া পথে পা বাড়িয়েছে। বিধবা বুড়া বউ ঘুমিয়েছেন। রান্নুও গভীর ঘুমে অচেতন। হয়ত তার হারিয়ে যাওয়া কানুর স্বপ্ন দেখছে রাইকিশোরী। এই তো পালাবার সময়।

বার বার ফিরে ফিরে তাকায় আউলিয়া। নিঝুম অন্ধকারে তার পথ চলা শুরু হয়। কিন্তু মনে হয়, কার যেন কণ্ঠস্বর সে শুনতে

পাচ্ছে। শো-শো বাতাসে রাইকিশোরীর, খিল খিল হাসি। আবার কান্নার সুরও শুনতে পায়,—ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে রাইকিশোরী।

অনেকদিন হয়ে গেছে। তবু মনে হয়, রাইকিশোরী তার কানে কানে কথা ক'য়ে যায়—সাধু তোমার রাই যে বাতাসে মিশে রয়েছে। কোথায় খুঁজছ তাকে? আকাশের তারার মাঝে তার চোখ দেখতে পাওনা?

আরো সাংঘাতিক! ঘুম ভেঙে গিয়েছিল। বৃন্দাবনের সেই রাতকে ভুলতে পারেনি আউলিয়া। তাকে জড়িয়ে ধরেছিল রাই-কিশোরী। ঘুমের ঘোরে কোন্ এক স্বপ্নের রাজ্যে ফিরে গিয়েছিল আউলিয়া। সে-ও জড়িয়ে ধরেছিল সেই ছায়ামূর্তিকে। বুকের মাঝে পেয়েছিল এক ভুলে-যাওয়া কোমল-পেলব স্মৃতি,—রক্তমাংসে গড়া এক প্রিয়ার স্পর্শ।

উন্মাদের মত তাকে বুকে চেপে ধরে নিজেকে হারিয়ে ফেলেছিল আউলিয়া। কিন্তু ক্ষণিকের মধ্যেই তার ভুল ভেঙে যায়। কি সর্বনাশ!

তাই তো পালিয়ে এসেছিল আউলিয়া।

চোখ রাঙিয়ে তার সামনে দাঁড়িয়ে শাসাচ্ছে আর একজন,-- তুই এ কি করলি? আমাকে ভুলে গেলি। আবার হেসে হেসে বলে, ভুল নয়, ভুল নয়, আমি তোর রাইকিশোরীর দেহে মিশে গিয়ে আমার ক্ষিদে মিটিয়ে নিলাম। তোর কোনো দোষ নেই। দোষ নেই তোর রাইকিশোরীর। তুই তো আমাকে ধরতে পারলি নে!

আবার সব গোলমাল হয়ে গিয়েছিল। আউলিয়া বৃন্দাবন ছেড়ে দিশেহারার মত পথে পথে ঘুরেছে। কত দিন যে কেটে গেছে তার ঠিক ঠিকানা নেই। বৃন্দাবনের মোহ তার কেটে গেছে। যুগের পর যুগ চলে যাচ্ছে, আসে যাত্রী,—তীর্থযাত্রী। আসে পথিক! অবিরাম স্রোত। কি দেখতে আসে তারা? আকাশ আর বাতাস উত্তর দেয়—নেই, নেই, নেই!

পড়ে রয়েছে শুধু মাটি। ওই মাটির উপরেই ছুটে ছুটে বেড়িয়েছে

ব্রজের রাখাল। শ্যামলী, ধবলী আজ কোথায়! রাইরঙ্গিনীর বিশাখা আর ললিতা কোথা গেল? শ্রীদাম, সুদাম আর সুবলই বা কোথা? শুধু স্মৃতি আর স্মৃতি।

মানুষ ভুলতে চায় না। তাই তো অবিরাম স্রোত চলেছে; তারা সেই স্মৃতির ধারাটাকে জিইয়ে রেখেছে। আহিরপল্লী আজ আহিরপল্লী নেই, সেখানে মানুষ কল্পনায় তীর্থ রচনা করেছে।

প্রেমের স্বর্গ!—রাইকানুর অঙ্গজ প্রেম দেহাতীত এক অব্যক্ত প্রেমের সন্ধান দিয়েছে। রাই আর কানু অমর হয়ে গেল। সেই চটুল কিশোর কিশোরীর জন্য স্বর্গে তৈরী হ'ল এক নতুন স্বর্গ গোলোকধাম। নদীয়ার নিমাই পাগল হ'ল; দেখা দিলেন এক নতুন মানুষ শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু।

রাইকিশোরীর প্রেম!— কত গান, কত পদ রচনা ক'রে গেল কত কবি, কত ভক্তজন। গানে গানে বাতাস ভরে ওঠে।—'কৃষ্ণ কাল, তমাল কাল, তাই কালরূপ ভালবাসি।'

মনে হয়, সারা পৃথিবীটাই কাঁদছে। আবার হাসছেও। কৃষ্ণ আর রাধা মিশে রয়েছে। ফুলে ফুলে, মেঘে মেঘে। আকাশে বাতাসে। অথচ তারা তাদের বিরহে কাঁদছে—"দুহুঁ কোরে দুহুঁ কাঁদে বিচ্ছেদ ভাবিয়া।"

মনে পড়ে এক পাগলা বৈষ্ণবীর কথা—সে মাঝে মাঝে দুহাতে কাউকে যেন বুকে জাপটে ধরে। আর বলে, "এই যে, এই যে সে এসেছে।" আবার হতাশ হয়ে কেঁদে বলে,—"সে লুকোচুরি খেলছে; আমি দেখতে পাইনে, কিন্তু আমাকে জড়িয়ে ধরে তার বুকের মাঝে।"

পাগল! পাগল!—এরা সবাই পাগল!—আউলিয়ার মনে হয় সেও পাগল হয়ে গিয়েছে। তা না হ'লে দিশেহারা হয়ে কাকে খুঁজে বেড়াচ্ছে সে? নেই, নেই—কেউ নেই তার।

আশ্চর্য হয় আউলিয়া! কত দেশ ঘুরে আবার কি ক'রে যে এখানে ফিরে এসেছে। তা বুঝতেই পারে না। টাঙ্গা, এক্কা আর

রেলগাড়ি—সবই হয়েছে তার বাহন।

আরে সাধুজী! আইয়ে আইয়ে!—টাঙ্গাওয়ালা টাঙ্গায় বসিয়ে পথ পার করে দিয়েছে। তার সুখ দুঃখের কথা বলেছে। রেলগাড়িতে চেপেছে। সাধু ভেবে কেউ কিছুই বলেনি। কখনো বা কেউ গাড়ি থেকে নামিয়ে দিয়েছে। কিন্তু তার চলার বিবাম ঘটে নি।

জীবনের বিচিত্র খেলা। আউলিয়া ভাবে যারা তাকে ছেড়ে চলে গেল, তাদেরও কি চলার বিরাম ঘটেছে! আজ রাতাবী কোথায়? একজনের খোঁজে বেরিয়ে সে কত জনকে চেয়েছে! অথচ গাড়ায় যার জন্য এত আকুলি বিকুলি সে কোথায় ভেসে গেছে!

আবছা আবছা মনে পড়ে,—সই শৈবলিনী—সুরুচি—সুরো! তারপর সাকিনা বাতাবী,—আরো কতকগুলো মুখ! তারা হারিয়ে গেছে। হ্যাঁ, কে যেন সাঁতার কাটতে গিয়ে ডুবে যাচ্ছিল। তাকে বাঁচাতে গিয়েছিল আউলিয়া। কি নরম নরম হাত! কি সুন্দর! আউলিয়ার গলা জড়িয়ে ধরেছিল। কেমন যেন এক আবেশে আউলিয়া সব ভুলে গিয়েছিল। তারপর দম বন্ধ হয়ে মরে আর কি? অথৈ জল। কাজলপুকুর! জলের ভেতর সে কি ধ্বস্তাধ্বস্তি। কিছুতেই মেয়েটার হাত ছাড়াতে পারেনি আউলিয়া। মরিয়া হয়ে হাতটা কামড়ে দিয়েছিল। বেশ, তারপর তাকে জল থেকে তুলেছিল। কাজলপুকুরের পাড়ে লোক জড় হয়ে গিয়েছে। দরদর করে হাত দিয়ে রক্ত ঝরছে! এক রাজীব ছিল সে হয়েছিল রজব তারপর—?

সবই তো স্বপ্ন!

একটা ভাঙা মসজিদের চারপাশে জঙ্গল। গোরস্থান বলেই মনে হচ্ছিল। মহুয়াগাছ—ফুলে ফুলে ভরতি। গুন্‌গুন্‌ করছে মৌমাছি। গোরস্থান—সমাধি—কবর! হঠাৎ চীৎকার করে উঠল আউলিয়া। যে স্মৃতির দুয়ার খুলে গিয়েছিল তা যেন একটা বড় ধাক্কা খেয়ে বন্ধ হয়ে গেল।

মহুয়াগাছের তলায় তখন ঘুমিয়ে পড়েছে আউলিয়া। ঘুম ভাঙলে দেখে তার সামনে একজন দাঁড়িয় আছে। বেলা শেষ হয়ে

এসেছে। পড়ন্ত রোদের রেখা পড়েছে সেই অদ্ভুত লোকটার চোখে-মুখে। লম্বা চুলদাড়ি, গায়ে তালিদেওয়া আলখাল্লা,—দশাসই চেহারা। জ্বলজ্বল করছে চোখ দুটি। তার হাতে ত্রিভঙ্গ এক লাঠি। কাঁধে ঝুলি, আর এক হাতে কাঠের কমণ্ডলুর মত একটি পাত্র।

প্রথমে ভয় পেয়ে গিয়েছিল আউলিয়া। অদ্ভুত চেহারার লোকটির চাউনি যেন তাকে বিঁধছে।

আগন্তুক বললে—খুব ঘুমিয়েছিস। বোঁটা ছিঁড়ে কোথায় এসে পড়েছিস। শুকিয়ে যাবে ঝরাফুল।

ঝরাফুল শুকিয়ে যাবে!—মহুয়াফুলের সোনালী আভা আর মন মাতানো গন্ধ! পাশে কবর—গোরস্থান! সন্ধ্যা নামছে—এলোমেলো চিন্তা আউলিয়ার মনে।

আগন্তুকের কথাগুলো হেয়ালির মত! মাঝে মাঝে হাসছেও লোকটি। সে হাসির কোনো অর্থই বোঝে না আউলিয়া। চারদিকে কোথাও জন-মানবের চিহ্ন নেই। অনেক দূরে গাঁয়ের রেখা দেখা যাচ্ছে।

পীর সাহেব! রজবের গলা দিয়ে যেন কথা বের হতে চায় না।

হ্যাঁ, হ্যাঁ, পীরসাহেব!—বিদ্রূপের হাসি সেই পীরের মুখে।

আমার তো কিছুই নেই! উত্তর দেয় আউলিয়া রজব।

তোর কাছে কি ভিক্ষে নিতে এসেছি ব্যাটা! বল্ কোথা যাবি? কিছুটা যেন অভয়ের সুর শোনে রজব।

—কোথা পীরসাহেবের আস্তানা?

—আস্তানা?—হাসালি ব্যাটা, হাসালি। আগে বল তোর আস্তানা কোথা? দুনিয়াজোড়া আমার আস্তানা। উপরে আকাশ আর নীচে এই মাটি। কত বড়—কত বড় আমি তা কি জানিস?

তাকে চুপ করে থাকতে দেখে ফকির বলে,—চল, অনেক তো হ'ল। এখনো অনেক বাকী। তোর খেলা শেষ হয়নি। এখানে বসে থেকে কি হবে? শেয়াল কুকুর আছে। পারঘাটা যে অনেক দূর।

—অনেক দূর ?

—হ্যাঁ অনেক দূব। জীবনভোব ঘুবে মবছিরে ব্যাটা এখনো ত্যার কূল দেখতে পেলাম না। ঐ যে আশমান দেখছিস্, ওটা কি জানিস ?

—আকাশ—আকাশ। লাখ লাখ তারা, চন্দ্র আব সূর্য !

হাঃ—হাঃ—হাঃ—হাঃ—ফকিব আকাশ বাতাস ফাটিয়ে হেসে ওঠে।

হাজার হাজার লাখ লাখ বাতিবে ব্যাটা ! লাখ লাখ চোখ। ওবা দেখছে। খোদাব দুনিয়া পাহাবা দিচ্ছে। লুকোবাব পথ নেই।

ফকিরের কথাবার্তা আব হাসিব দমকে বজবের বুকের ভেতরটা যেন কেঁপে ওঠে। সে কোনো কথা বলতে পারে না।

ফকিব বলতে থাকে কূলকিনাবা পাচ্ছিনে ব্যাটা। চল, এবাব তোকেই সঙ্গী করি। আমাব চোখে দেখাব ধান্ধা লেগে গেছে। তোর চোখে যদি ধবা পড়ে। মন্দিব আব মসজিদ তীর্থ আব পুণ্যস্থান ! সবই ফাঁকি !

আউলিয়া উত্তর দেয়, কোথা যাব !

তাই তো কথাটা ! কোথায় যাবি ? এই গোবস্থানে পড়ে থেকে কি-ই বা করবি ? চল, বেশীদূর নয়। আবাব ফিরে এসেছিস। আঁখ খুলে যাবে, দুনিয়াটা দেখে নে।

আঁখ খুলে যায়নি বটে কিন্তু বাজীব হ'ল বজব আউলিয়া। চাখের সামনে যা পড়ে, মনে হয় অনেক দিনেব চেনা। কিন্তু ঠিক ঠিক মনে করতে পাবে না।

ফকির বলেছিল খুঁজে দেখ ব্যাটা। কেউ হারায়নি, কেউ মবে যায় নি, সবার মাঝে নতুন ঢঙে তারা রয়েছে ! এমন যে খোদা, এমন যে ঈশ্বর তিনিও আছেন এই দুনিয়া জুড়ে। খুঁজে দেখ, কিছুই হারায় নি।

পাওয়া আর হারানোর পালা আলেয়া আর মরীচিকা—ছুঁই ছুঁই করি ধরতে পারিনে। দু'দণ্ডের দেখা। সবই ভাল লাগে। বুকে

আঁচড় কেটেও যায়। পরশও লাগে সুখের পরশ। শরীর আর মনে কেমন পুলকও লাগে। কিন্তু কোথায়? আউলিয়া রজব ভাবে সবই ফাকি।

ফিরে এসেছে আউলিয়া। মনে পড়ে, সবই তার চেনা। সেই গাঁ, সেই গাছ, সেই নদী সবই রয়ে গেছে। কিন্তু মানুষগুলো সবই নতুন। কোথা গেল তারা? কারো কারো মুখ দেখে মনে হয় যেন তাদের চেনে। কিন্তু তারা কেউ তো তাকে চেনে না।

দীঘির পার, দাসের গ্রাম টিলার উপর স্কুলটা। সারি সারি কমলালেবুর গাছ! পঞ্চখণ্ড, জলঢুপ, এগারসতী, গৌরী গ্রাম, কাটিগড় জিন্দাবাজার, শিলচর, সীলেট—সবই ঘুরে এসেছে আউলিয়া।

এবার বাসা বেধেঁছে এই শহরটায়। কিন্তু এক জায়গায় থাকতে পারে কৈ? খোঁজে শুধু খোঁজে! কার খোঁজে যে ঘুরে বেড়ায় নিজেই জানে না।

ঈশ্বর? আল্লা?

না, না—সবই ভূয়া!

আশমানের দিকে তাকায় আউলিয়া! হাজার হাজার দীপ জ্বলছে দেবতার দেউল। কিন্তু কোথায় দেবতা? কোথায় ঈশ্বর?

দেবতাদের চায় না আউলিয়া।

ঠাকুরদেবতাকে যে এত ডাকে, তারা কি তাদের ডাক শোনে? আকাশের তারাগুলো তাকিয়ে রয়েছে দিনরাত। ওদের চোখ কি ঝলসে যায় না?

পীরের দরগা আর কালভৈরবের বেদী! এক জায়গায় চেরাগ জ্বলে। আর এক জায়গায় বয়ে যায় তাজা রক্ত। পাঁঠার তাজারক্তে লাল হয়ে ওঠে কালভৈরবের বেদী। হাঁড়িকাঠে পাঁঠা প্যা-প্যা চীৎকার করে ওঠে। তারপর খাঁড়ার একটি মাত্র কোপ। কালভৈরবের কি দয়ামায়া আছে? এত পাঁঠার রক্ত খেয়ে মানুষের অমঙ্গল ঘোচাবে কালভৈরব? ইস্! পাঁঠারা যদি কালভৈরবের

বেদী মানুষের রক্তে লাল করে দিতে পারত !

স্বার্থ! সবই স্বার্থের খেলা। সবাইকে বঞ্চিত ক'রে নিজে বড় হবো, এই তো চায় মানুষগুলো। নিজের মঙ্গল? পরের সর্বনাশ না করলে কি নিজের মঙ্গল হয়?—চিন্তার খেলায় মেতে ওঠে পাগলা রজব !

আশ্চর্য! তাকে কেউ চেনে না, অথচ নাম দিয়েছে পাগলা রজব, রজব আউলিয়া। নামটা শুনলেই ক্ষেপে ওঠে আউলিয়া। বুকের ভেতরে তোলপাড় করে ওঠে, যেন রক্তের ঢেউ! আর মাথার ভেতর আগুন জ্বলে।

নামটা মোটেই সইতে পারে না আউলিয়া। তাই যেখানেই তার এই নাম শোনে, সেখান থেকে পালিয়ে আসে। কিন্তু নামটা তাকে যে ছাড়ে না? দিনের পর দিন মাসের পর মাস কত পালিয়ে বেড়াবে !

নাম? একবার দেওয়া নাম মুছে যায় না। নামের ছাপ কি চোখে-মুখে লেগে থাকে। লোকগুলোকে চেনেও না আউলিয়া। কত গাঁ কত শহরে গিয়েছে, তবু সেই নাম। এ এক আপদ জুটেছে। আলখাল্লা-পরা ফকিরসাহেব একি করলে? এত দিন তো এ নামটা তাকে এমন তাড়া করে নি।

-- ফুলছড়ি গ্রাম, বরাকগাঙের পারের ওপর সেই শিমুলগাছ, তার দেবেদের বাড়ির সেই তালগাছটা এখনো দাঁড়িয়ে রয়েছে। কিন্তু,—কিন্তু তার চেনা সেই মানুষগুলো আর নেই। তার মনে হয়েছে, যেন আর এক জন্মে এই গাঁয়েই সে জন্ম নিয়েছিল। এখন আর এক জন্ম নিয়েছে। এরা তাকে চিনবে কেন?

গনির গাঁয়েও গিয়েছিল আউলিয়া। কত ভিটে খালি প'ড়ে রয়েছে। কেউ নেই, কেউ নেই! যত সব নতুন মানুষ। মজুমদারদের স্কুলটা দেখে বুকটা ছ্যাৎ করে উঠেছিল।

স্টীমারঘাট!—নদীর পাড়টা ভেঙে গেছে। কোনো কিছুই নেই। পালপাড়ার অর্ধেকটা গ্রাস করেছে রাক্ষুসে নদী। স্টীমার-

ঘাটটা আর এখানে নেই।

বঙ্কু সাহা আর উপেন অধিকারী!—হ্যাঁ, তারাই বটে। বুড়ো জবুথবু হয়ে গেছে অধিকারী! আউলিয়াকে চিনতেও পারলে না। বৈষ্ণব মালাকার! যাত্রার পালা হ'ত সর্বানন্দ চৌধুরীর চণ্ডীমণ্ডপে। বৈষ্ণবচরণ বেহালা বাজিয়ে গান ধরত—'সময়ে ধর্মবল হয় রে সুপ্রবল।'—নাঃ, আর মনে পড়ে না। ইন্দ্র সাজতেন পাবর্তীশঙ্কর।

'যে চিন্তার চিন্তা কর সুরপতি।
সে চিন্তা আমায় হেরো মূর্তিমতী॥'

বাঃ, কি সুন্দর গান! নেচে নেচে হাতমুখ নেড়ে গান ধরত হৃদয়মালাকার!—কিশোর বালক কিশোরী সাজত।

পূর্বজন্মের কথা!

শঙ্করঠাকুরের ভিটের উপর প্রকাণ্ড বেলগাছ! ঝোঁপঝাড়ের মধ্যে মাথা উঁচু ক'রে রয়েছে। ওই তো, ওখানে সুন্দর নিকানো-পুছানো মাটির ঘর ছিল। সেই বেলগাছটা এত বড় হ'য়ে উঠেছে! বাতাবী নেবুর গাছটা কোথায় গেল!

ইচ্ছে হয়েছিল ডেকে বলে, তোমরা কি আমাকে চিনতে পারছো গো!—কিন্তু পারে নি। তাকে সেলাম করেছে সবাই!—আউলিয়া, দরবেশ।

গনির গাঁয়ের মাতব্বর এখন সিরাজ চৌধুরী! বলেছিল,—দীঘির পাড়ে আস্তানা তুলে দি পীরসাহেব!

হেসেছিল আউলিয়া! আঙুলে দিন গুনেছিল, বছর গুনেছিল! এক দুই, তিন, চার,—চল্লিশ! নাঃ, সবই গুলিয়ে যায়।

সাকিনা আর আনোয়ার! পুড়ে মরেছে। নাসিম শেখকে খুন করেছে। কে খুন করেছিল? কেন করেছিল?—তাদের কোনো চিহ্নই নেই। তার যে সবই ছিল! না, না, পূর্বজন্মের হতে যাবে কেন? সবই যে সেদিনের কথা! আবার মাথাটা গুলিয়ে ওঠে।

—লোকগুলোকে খুন ক'রে ফেলব। গনির গাঁয়ে আর একটি

প্রাণীও থাকবে না। —চীৎকার ক'রে গাঁটা তোলপাড় ক'রে আউলিয়া। রাতের বেলায় তার চীৎকারে আঁত্‌কে উঠত গাঁয়ের জনমানুষ।

বুড়োবুড়ীরা বলতে লাগল,—এ সেই রজব! আউলিয়া হয়ে গেছে। ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা ফিস্ ফিস্ করে কথা বলে,—রজব আউলিয়া! অশ্বিনী চক্রবর্তী আজো বেচে আছেন, থুড়থুড়ে বুড়ো। তাঁর নাতনি হাত ধরে নিয়ে পথ চলে।

অশ্বিনী চক্রবর্তী বলেন,—এরা অন্য জগতের মানুষ। শঙ্করঠাকুরের বংশ তো, আউলিয়া সিদ্ধাই হয়েছে।

কত কথা শোনে আউলিয়া। বুকের মাঝে হাহাকার। তা তো শান্ত হয় না।

অন্য জগৎ,– তাকে আর কেউ আপন ব'লে নিতে পারবে না। না হিন্দু, না মুসলমান। ওরা সবাই তাকে দূরে ঠেলে দিয়েছে। মাঝে মাঝে সকল কথাই মনে পড়ে যায়।

অ্যাঁ,—সে তো পাগল হয়েই গিয়েছিল। রজব,—রজব! সত্যই রাজীর রজব হয়ে গিয়েছিল। সে যে স্বপ্নের কথা।

একদিন গাঁ ছেড়ে উধাও হয়ে গেল আউলিয়া। তারপর কত জায়গা ঘুরেছে, কোথাও শান্তি নেই। এসেছে এই টিলাগড় আর পীরের দরগায়।

শহরের মানুষ দেখে! বিচিত্র সব মানুষ, বিচিত্র তাদের জীবন। ছুনিয়ার মা-কে পেয়েছে। এ যেন সংসার ছাড়া আর এক মানুষ। ছুনিয়াকে আউলিয়ার মাঝে পেয়েছে মঙ্‌লা,—ছুনিয়ার মা!

মা! মা!—ব'লে কেঁদে ভাসায় আউলিয়া। তার সিদ্ধাই, তার পাগলামি সবই ছুনিয়ার মার কাছে এলে কোথায় যেন উধাও হয়ে যায়।

ওই মানুষগুলোই তাকে কিম্ভূতকিমাকার ক'রে তুলেছে। কামধেনু যেন আউলিয়া! আউলিয়ার পায়ের ধুলোয় ফকির রাজা হতে পারে!—কেউ তাকে বোঝে না, বুঝতেও চায় না।

হ্যাঁ, অনেক বছরই কেটে গেছে।

আবার সেই সাদা বাড়িটা চোখের সামনে যেন ধাঁধা লাগাচ্ছে। একটি মানুষকে বড় আশ্চর্য লাগে। ঐ রাস্তা দিয়ে রোজই যায়, কেমন ফ্যালফ্যাল করে বাড়িটার দিকে তাকিয়ে থাকে।

পায়ের চটিটা ছিঁড়ে গেছে; তালির উপর তালি পড়েছে। রুক্ষ মূর্তি। এলোমেলো চুলে পাক ধরেছে। দাড়িওয়ালা লোকটি। দাড়িতে মুখটা এমনই হয়ে গেছে যে আসল লোকটাকে চেনবার উপায় নেই। মনে হয় বেশ গোরাই ছিল। চোখের উপর আবার চশমাও রয়েছে। ডাটিভাঙ্গা চশমাটাকে দড়ি দিয়ে আটকে রেখেছে।

মাস্টার!—গলায় স্টেথিস্কোপও ঝোলে।

তবু মাস্টার! বাড়িটার দিকে তাকিয়ে বিড়বিড় ক'রে চলে যায় ঐ মাস্টার! বুড়ো মাস্টার!

যামিনী মহাজন বলেছিল—পাগলা মাস্টার! ডাক্তারিও জানে। স্কুল করেছে। জয়ন্তিয়ার পাহাড়ে তার স্কুল। পাহাড়ী ছেলেমেয়েদের পড়ায়। ওদের চিকিৎসা করে। মাথায় ছিট্ আছে।

কেউ কেউ বলে,—ইংরেজের জেলে থাকার ফলেই মাথাটা বিগড়ে গেছে। কি অত্যাচারই না করেছে জেলে। হাতকড়ি দিয়ে ঝুলিয়ে রাখত। হাত-পা বেঁধে বরফের উপর ঘণ্টার পর ঘণ্টা ফেলে রাখত। তারপর মারধোর তো আছেই।

এত কথা!—এত কথা ওরা জানল কি ক'রে?

মাস্টারের নাম কেউ জানে না। সবাই ওকে মাস্টারমশাই বলে ডাকে। পাগলা মাস্টার কারো ডাকে বড় সাড়া দেয় না।

পাহাড়ীদের নিয়েই থাকে। ওদের লেখাপড়া শেখায় পাগলা মাস্টার। গরীবের ছেলেমেয়ে! ওদের বই সেলেট কেনারও পয়সাকড়ি নেই। জামাকাপড় তো দূরের কথা, লেংটির মত কোমরে ফালি কাপড় জড়িয়ে রাখে বড়রা। মেয়েরা খাটো ঘাগরা পরে।

শুনেছে আউলিয়া,—সরকারী সাহায্য নিতে মাঝে মাঝে শহরে

দরবার করতে আসে পাগলা মাস্টার! সাহায্য পেয়েছে বলে তো মনে হয় না। হঁ্যা, তার স্কুলটা তো আজকের নয়, হেনরিসাহেব তখন জেলার কর্তা। জয়ন্তিয়ার পাহাড়ে শিকার করতে বেরিয়েছিল হেনরি। সেখানে পাহাড়ীদের মধ্যে এই স্কুলটা দেখে মুগ্ধ হয়ে যায়। টাকাকড়ি দিয়ে সাহায্যও করেছিল। তারপর যুদ্ধের সময় মার্কিন সৈন্যেরা পাশেই তাঁবু গেড়েছিল। তারাও ঘরদোরগুলো তৈরি ক'রে দিয়েছিল। কাঠের কাজ শিখিয়েছিল মার্কিন সৈনিক-মিস্ত্রী।

যুদ্ধ থেমে গেল। ইংরেজরাও চলে গেল। তার পর স্কুলটা টাকাকড়ির অভাবে অচল হয়ে উঠেছে; তব চালিয়ে যাচ্ছে পাগলা মাস্টার। স্বদেশী সবকার দেখেও দেখে না। বছরে একশো দেড়শো টাকা। তাও উশুল করতে দশ মাইল পথ টানা হেচড়া. করতে হয় বছরে দশবার।

পাগলা মাস্টার স্বদেশী ক'রেছিল। গুলি-পিস্তল নিয়ে সাহেব মারতে নেমেছিল একসময়। সে কোন এক যুগের কথা। সরকারী ট্রেজারী লুঠ করতে যেতো? মেল গাড়িতে ডাকাতি করতে গিয়ে ধরা পড়েছিল। আন্দামান ঘুরে এসে ভোল পালটেছে পাগলা মাস্টার। পাহাড়ে পাহাড়ে ঘুরে পাহাড়ীদেব মানুষ ক'রে তোলার জন্য উঠে প'ড়ে লেগেছে। নিজেব দিকে কোনো খেয়ালই নেই।

এত কথা জানে লোকগুলো! তব পাগলা মাস্টাবের আসল খবর কেউ জানে না। কে এই পাগলামাস্টার? গলায় স্টেথিস্কোপ ঝোলায়ই বা কোন? আর এই হতচ্ছাড়ার মত দশমাইল ডিঙিয়ে দরবার করতে আসেই বা কেন? ওর কি কেউ ছিল না, না কেউ নেই?

সন্ন্যেসী? না বিবাগী! কেউ উত্তর দিতে পারে না। আউলিয়াও তাজ্জব বনে যায়। পাগলামাস্টারের চোখদুটো যেন কি গিলতে চায়! না, সাদা বাড়ির মোহ আছে!

ওরা তো সবই করতে পারে। হোমরা-চোমরা সকলেই তো এখানে আসে। যা না বাপু, একবার ওদের কাছে। তোর স্কুলের

সমস্যা মিটে যাবে। শুধু শুধু ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে দেখলে হবে কি ? ধর না ওই বুড়োটাকে। না হয় তার মেয়েকে।

নাঃ, ওই এক ধরনের লোক। ভাঙবে তবু মচকাবে না। তবে তো দেখি হ্যাংলামো আছে। ওই বাড়িটার দিকে তাকিয়ে কি লাভ বুড়োর নাতনিটাকে দেখলে যেন পাগলা মাস্টারের দাড়িওয়াল মুখটাও কেমন খুশীতে ভরে ওঠে।

হ্যাঁ, আউলিয়ার মনে হয় ঐ মেয়েটাকে দেখবার জন্যই পাগল মাস্টার দাঁড়িয়ে থাকে। শুধু একটিবার মাত্র দেখেই চলে যায় যেদিন মেয়েটা বের হয় না, সেদিন চোখ মুছতে মুছতে চলে যায় ঐ পাগলা মাস্টার।

রহস্য,—সবই রহস্যজালে ঘেরা !

আউলিয়া নিজের কথাও ভাবে। সেও তো ঐ সাদা বাড়ির ঘুর্ণিজালে আটকে গেছে ! কেন ? কেন এমন হ'ল ?

বটগাছটার কচিপাতার আড়ালে ডেকে ওঠে একটা পাখি— 'পিউ কাঁহা, পিউ কাঁহা'। কি জানি কি পাখিটার নাম। সত্যই কি 'পিউ কাঁহা পিউ কাঁহা' ডাকে ? না, না, তা হবে কেন ? পাখিটার ডাক এমনই যে, কোন এক রসিক মানুষ নিজের মনের মতন ক'রে পাখির বুলির এ রূপ দিয়েছে।

পিউ-কাঁহা ? কোথায় আমার প্রিয় ? সারাটা জীবন ধ'রে খুঁজে বেড়াচ্ছে পাখিটা। প্রিয়ের সন্ধান পেয়েছে কি ?

আউলিয়া কার সন্ধানে ঘুরে বেড়াচ্ছে ? যা হারিয়েছে, তা যে আর ফিরে আসবে না। তব ওই বাড়িটা আর তার মানুষগুলোর মাঝে কি খুঁজে বেড়ায় তার চোখ দুটি ?

মায়া মায়া ! সবই মায়া !

মনে পড়ে যায় অলকা বৈষ্ণবীর কথা। মুখে শুধু হাসি লেগেই আছে ; বৈষ্ণবী হ'লেও দেহপসারিণী ছিল অলকা। গঙ্গা স্নান করত। বলত,—গঙ্গা স্নানে দেহের ময়লা কেটে যায়। আর হাসিতে কাটে মনের ময়লা। সেই অলকা একজনকে খুন করলে। জজের

এজলাসে কাঠগড়ায় দাঁড়িয়েও হাসছে অলকা বৈষ্ণবী।

কিসের অপরাধ জজসাহেব? বাঁচতে গেলে শিয়ালকুকুর, বাঘ ভাল্লুককে নিশ্চয়ই মারতে হয়। তাতে পাপ কিসের? অপরাধ কিসের? মনে খট্ করে লাগে বটে। একটা প্রাণীকে মেরে ফেললে তার ছটফটানি দেখলে নিজের প্রাণটা ছটফট করে বটে। আর কিছুই নয়। তারপর হাসলেই সব ঠিক হ'য়ে যায়। হাসিই মনের ময়লা দূর ক'রে ধর্মাবতার! মায়া, সবই মায়া!

হাসতে হাসতে এজলাসের আবহাওয়া বদলে দিয়েছিল অলকা বৈষ্ণবী। তব তার জেল হয়েছিল।

কারা থাকে?— কারা থাকে এই বাড়িটায়?

একই প্রশ্ন? ওই পাগলমাস্টার বাড়িটার দিকে আঙুল দেখিয়ে রাস্তার লোকজনকে জিজ্ঞেস করে, কারা থাকে? একদিন নয়, যতদিন আসে, শুধু একই প্রশ্ন।

মাসের মধ্যে কতবার দেখেছে ওই পাগলমাস্টারকে। চোখে মোটা চশমা; মাঝে মাঝে চশমাটা খুলে ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে থাকে।

এপাড়ার ছেলেরা ঠাট্টা-তামাসা করে,—পাগলা। পাগলামাস্টার। রোজ একই প্রশ্ন! তা যাও না মাস্টার, একবার ভেতরে গিয়ে জিজ্ঞেস করলেই পারো।

উত্তর দেয় না পাগলা মাস্টার।

কি উত্তর দেবে? আউলিয়া নিজেই তো বুঝতে পারে না, সে নিজে কেনই বা ওই বাড়িটার দিকে তাকিয়ে থাকে।

সেই আগুন দেখার পর আউলিয়া যেন কেমন হয়ে যায়। দুনিয়ার মা বড়ীকে ছেড়ে দিয়ে রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়িয়েছে। টিলাগড়ে দু'তিনদিন লুকিয়েছিল। তারপর শহর ছেড়ে গাঁয়ের পর গাঁ ঘুরেছে।—খুঁজে বের করতে হবে সেই গাঁ। কোথায় যেন আগুনে সব পুড়ে মরে যাচ্ছে।

গোলকধাধার ঘুরপাক। খুঁজে বেড়াচ্ছে আউলিয়া। মনে হয়,

এসব জায়গাই তার দেখা হয়ে গেছে। কই সে গাঁ? সে গাঁয়ে আছে এক বুড়ী। তার বাড়ির সামনে একটা জারুলগাছ। ছোট্ট একটা ছেলে ছুটোছুটি করছে; ছাগলছানা ধরতে গিয়ে ডিগবাজী খাচ্ছে ছেলেটা। হিঃ হিঃ করে বুড়ীটা হাসছে।

আর দূরে দাঁড়িয়ে ডাকছে ছেলেটির মা!—তারও মুখে হাসি। আরো দূরে দাঁড়িয়ে একটা কদমগাছের আড়ালে থেকে একজন বিড়-বিড় করে কি বলছে। তার চোখ দুটোতে আগুন জ্বলছে। দাঁতে দাঁতে ঠোঁট দুটি চেপে ধরছে।

দুশমন্!—দুশমন্!

বুড়ী আর ছেলের মা লোকটাকে দেখতে পাচ্ছে না। হঠাৎ যেন অন্ধকার নেমে এল। ঝি ঝিঁ পোকা ডাকছে। কি অন্ধকার। কালো ঢিবির মতো একটা ঘর দেখা যাচ্ছে। জনমানুষের সাড়া নেই। ওরা সব ঘুমিয়ে পড়েছে। দুশমনটা এগিয়ে যাচ্ছে।

জারুলগাছের গুঁড়িটার উপর বসে পড়ল আটুলিয়া।

—দেখি দুশমনটা কি করে?

এ্যাঃ, আবার এসেছে সেই ছেলেটি। নাঃ, ছেলেটি নয়। বেশ বড় হয়েছে; পাগলা-পাগলা চেহারা। ডাকছে আটুলিয়াকে, ওরে, আবার আমি এসেছি। শুনবি সে গল্প?

খুঁজে মরছিস্?—আগুন লাগাবে ওই দুশমন।

আঁতকে ওঠে আটুলিয়া—আগুন!

খিলখিল করে হেসে ওঠে সেই যুবক। —না রে না, সব পুড়ে ছাই হয়ে গেছে। আর খুঁজেও পাবিনে। সব মাটি হয়ে গেছে। দুশমনটাও মরে গেছে। কুড়োল দিয়ে তার মাথাটা দুখানা করে দিয়েছিল রজব।

কি বলছ রজব?

হ্যাঁরে রজব? রজবই দুশমনটাকে মেরে ফেলেছে। সে যে অনেক দিন, অনেক বছর হয়ে গেছে।

তাহলে,—তাহলে? ওরা কোথা গেল!

হাঃ-হাঃ-হাঃ—কি বিকট হাসি। আউলিয়া নিজে হাসছে না তার সামনে দাড়িয়ে একটা ছায়ামূর্তি হাসছে,—কিছুই বুঝতে পারে না।

মনে আছে তো, সুখেনদা আর মহেন্দ্রদাকে মনে পড়ে। সেই ডাক্তার সুখেনদা!

আউলিয়ার মাথা গুলিয়ে যায়, সুখেনদা!

বারান আর রাজীবের কথা ভুলে গেলি? ছায়ামূর্তির মুখে বিষণ্ণ হাসি।

রাজীবই হয়ে পড়েছিল বজ্র, সে যে অনেক কথা। সুখেনদা রাজীবকে কলকাতায় নিয়ে গিয়েছিল। কিন্তু সুবিধা হল না। ওরা ছিল বিপ্লবী। তখন বড় ধরপাকড় চলছে। দু'এক জায়গায় জেলার ম্যাজিস্ট্রেটকে হত্যা করেছে বিপ্লবীরা। মহেন্দ্রডাক্তারের কথামত রাজীবকে নিয়ে বারান গা-ঢাকা দিল।

আউলিয়া মাথা নাড়া দিয়ে ওঠে, রায়বাহাদুরের ছেলে!

হ্যারে। আর বারানের সঙ্গে যার বিয়ে হবে, সেও হবু রায়-বাহাদুরের মেয়ে! রাজীব এসেছে বারানের সঙ্গে। বিয়ের তোড়-জোড় চলেছে।

রাজীব তো হতভম্ব! বুঝলি আউলিয়া, তুই সব ভুলে গেছিস। আর বারান কিছু ভোলে নি, সবই তার মনে আছে। কিন্তু মাথাটা একটু বিগড়ে গেছে। মহেন্দ্রদার খবর নেই; বেঁচে আছে কি না, কেউ জানে না। আর সুখেন্দা তো পুলিশের গুলিতে মারা গেছে।

চীৎকার করে ওঠে আউলিয়া, মারা গেছে?

সে যে অনেক দিন হল রে! শোন্ এখন রাজীবের কথা। বিয়ের দু'দিন আগে বারান বললে, তুই এখন গা-ঢাকা দে রাজীব। পুলিশের লোক পেছনে লেগেছে। আমার সঙ্গে তোকে দেখলে ওদের সন্দেহ হবে। সুখেনদা কলকাতায় ধরা পড়েছে।

রাজীব শিউরে উঠল। এ কয়েক মাস তার মনেও তোলপাড় উঠেছে। নিজের গাঁয়ে-ঘরে তার ঠাঁই নেই। কোথা যাবে সে?

তার উপর পালিয়ে এসেছিল সে। এখন কেরামত চৌধুরীর কাছেই বা কি ক'রে ফিরে যাবে? রাজীবকে কেরামত চৌধুরীই রজব করেছিলেন।

বারীনের বিয়ে? বুকের ভেতরটা কেমন যেন মুচড়ে ওঠে. স্থরোর সঙ্গে বারীনের বিয়ে? ওদিকে সাকিনার মুখখানাও ভেসে উঠল চোখের সামনে।

বারীন ডাক্তার! বড়লোকের ছেলে। আর রাজীব? তার কি আছে? তবু মনে হ'ল, কোথায় যেন কি হয়ে গেল। স্থরো রাজী হয়েছে!

না, না, না স্থরোকে ভুলতে হবে। শহর থেকে পালিয়ে গেল রাজীব। কিন্তু কোথায় যাবে। আবার সেই গনির গাঁ। না, ভূজঙ্গ সিং এর সঙ্গে দেখা করা চলবে না। ফুলছড়িতেও তার ঠাঁই নেই। রাজীব আর রাজীব থাকবে না; সত্যই সে রজব হবে। তাই হ'ল। কেরামত চৌধুরী খুশী হলেন। সাকিনাকে পেল রাজীব। এ কয় মাসে সাকিনার যেন কি হয়ে গেল। চোখের জল আগে ঝরত। কিন্তু চোখে আর জল ঝরে না। চোখের জল শুকিয়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গে তার গায়ের জলও যেন শুকিয়ে যেতে লাগল।

সাকিনাকে তার দিদিমা এমন কি চৌধুরীসাহেবও কত বোঝালেন। মনের কথা কাউকেও খুলে বলে না সাকিনা। তার বিয়ের জন্য সাধাসাধি করা হ'ল। কিন্তু সে কিছুতেই রাজী হ'ল না। ভাল ভাল সম্পর্ক এল। চৌধুরীসাহেব নিজে উদ্যোগী হলেন। সাকিনাকে কেউ ভোলাতে পারল না। নাসিম শেখ কত ভয় দেখাল। কিন্তু কিছুতেই কোনো কাজ হ'ল না।

তারপর চাকা ঘুরে গেল, ঐ ছাখ্, ঐ ছাখ্।

বিছানার সঙ্গে মিশে গিয়েছে মেয়েটা। তারই পাশে বসেছে রজব। কেমন হাসি ফুটেছে সাকিনার মুখে। উঠে দাঁড়িয়েছে সাকিনা। বকুলগাছে ফুল ঝরছে; কদমগাছে বসে ডাকছে পাখি 'বউ কথা কও'। রজব সংসারী হ'ল। রজব আর সাকিনা। ঘোমটার

আড়ালে সোনালী হাসি। পায়ে হাসুলীর কিনিকিনি শব্দ। বাচ্চা ছেলে আনোয়ার এল। নতুন মানুষ হ'ল রজব। রজব চৌধুরী। আগের কথা রজব ভুলে গেল। সেই রজব চৌধুরীর ঘরে আগুন দিল নাসিম শেখ। পুড়ে মরল সাকিনা আর আনোয়ার।

ছায়ামূর্তির চোখে আগুন জ্বলছে।

চীৎকার ক'রে ওঠে আউলিয়া, আগুন,—আগুন!

হ্যা, নাসিম শেখকে খুন করল। আর তার জন্যই জেলে গেল রজব। তারপর আর কি শুনবি? জেলখানায় থাকতে থাকতেই পাগল হয়ে গিয়েছিল রজব। তাকে পাগলাগারদে পাঠিয়ে দিয়েছিল। যখন ছাড়া পেল, তখন দেশের চেহারা পালটে গেছে। ফিরে এসে আর কাউকে খুঁজে পেল না রজব।

ও:—ও:—ও:—বিকট আওয়াজ বের হ'ল আউলিয়ার মুখ থেকে। কাঁদছে আউলিয়া, কাঁদছে।

না। সে কান্না যেন মাটির বুক ফুঁড়ে বেরিয়ে আসছে। ফ্যাল-ফ্যাল ক'রে চারদিকে তাকায় আউলিয়া। মাটির ভেতর কে কাঁদে?

ছায়ামূর্তি বলে চলল, বারীনের কথা শুনবি? বারীনের বিয়ে হয়ে গেছে। দু'এক মাস ভালই কাটল। কিন্তু সেই বিপ্লবীদলের টান! বারীন কি তা এড়াতে পারে? আর তার সঙ্গেও সেই মহেন্দ্রডাক্তারের দল যোগাযোগ ছাড়ে নি। মাঝে মাঝে মামা আর বাবা-মায়ের চোখে ধুলো দিয়ে উধাও হয়ে যেতো বারীন। সুরুচি সব জেনেও চুপ ক'রে থাকত। কিন্তু বারীনের এই উধাও হ'য়ে যাওয়া তার বাবা-মাকে উতলা ক'রে তুলল। কি জানি, বউমার সঙ্গে কিছু হয়েছে কি না! হয়ত বউকে মনে ধরে নি! উতলা হয়ে ওঠেন বারীনের মা।

বউমার মুখে হাসি নেই। বারীনের হাবভাবে উৎকণ্ঠা ফুটে উঠল রায়বাহাদুরের মুখে। ঐ খুনে বিপ্লবীদের পিছু ছাড়ে নি বারীন! কিন্তু কি করবেন রায়বাহাদুর?

এদিকে অন্দরের আলোও কেমন ঝিমিয়ে এসেছে। কারো মুখে

হাসি নেই। বউমা যে দিন দিন শুকিয়ে কাঠ হয়ে যাচ্ছে, তাও শাশুড়ীর চোখে পড়ল।

সুন্দরী বউও বেঁধে রাখতে পারল না ছেলেকে! দীর্ঘ-নিঃশ্বাস ফেলেন বারীনের মা। কেন? ছেলের ত নিজেরই পছন্দ ছিল এই মেয়েকে।

জানিস্,—সুরো ভুল করেছিল। ভুলের মাশুল গুনতে হবে তাকে। এটা বুঝেছিল সুরো। তাই সুরো কাঁদত না। কিন্তু তার মুখে হাসি লেগে থাকত। সে হাসিও কোথা উধাও হয়ে গেল। বিয়ের রাতে শুভদৃষ্টির সময় সুরো বারীনের মুখের দিকে তাকিয়ে কি যেন দেখে কেঁপে উঠেছিল জানিস—সুরোর চোখের সামনে আর একজনের মুখ ভেসে উঠেছিল। টপ্ টপ্ ক'রে জল ঝরছিল তার চোখ দিয়ে।

—আর একজনের মুখ? কার মুখ? আউলিয়ার গায়ের লোমগুলো যেন খাড়া হ'য়ে উঠল।

হ্যাঁরে, আর একজনের মুখ। কিন্তু আর উপায় নেই। সবই সইতে হবে। সবই মেনে নিতে হবে। মেনেও নিয়েছিল সুরো। তার বুকের ভেতরটার দিকে এতদিন তাকায় নি। সেই শুভদৃষ্টির সময় ঠিকরে একটা আলো যেন পড়েছিল তার বুকের ভেতর, যাকে আমরা অন্তর বলি। সেখানে সুরো একটি মূর্তি দেখেছিল। ভালবাসা! বুঝলি, সুরো বুঝেছিল সেই মূর্তি কার। তাকে ভুলে যাওয়া বড় শক্ত।

তবু সুরো ভুলতে চাইলে। মনটাকে শক্ত করলে সুরো। কিন্তু বারীনই গোল বাধালে। সুরোকে অবিশ্বাস করলে বারীন। মাঝে মাঝে সুরো কি যেন ভাবত। আকাশের দিকে চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে থাকত সুরো।

সুরো এত কি ভাবে? তা'হলে বারীন কি ভুল করেছে। বারীনের মনে সন্দেহের আগুন। কারণে-অকারণে তা প্রকাশ পেতে লাগল। সুরো কিন্তু বিদ্রোহ করলে না। বারীনকে সুখী

করতেই সে চেষ্টা করতে লাগল। বারীন তা বুঝলে না। আবার উধাও হ'ল বারীন।

এরই মধ্যে একদিন খবর এল কোথায় যেন ট্রেনে ডাকাতি করতে গিয়ে বারীন পুলিশের গুলিতে মারা গেছে। আর কোনো কিছু জানতে পারা গেল না।

কি বললে? বারীনও মারা গেল। হকচকিয়ে ওঠে আউলিয়া।

যাও, যাও, এসব খবর শুনে আমার লাভ কি? চীৎকার করে উঠল আউলিয়া। কোথাকার কে বারীন? তার কোথাকার কে মরো। যাও, যাও, যাও।

ছায়ামূর্তি যেন খিলখিল ক'রে হেসে উঠল।

শুনতেই হবে তোকে। চোখ কান বন্ধ করলেও তোর মগজে ধাক্কা দেবে সে কথা। হ্যাঁ, ওরা তোকে ছাড়বে না। কিছুতেই ছাড়বে না। জানি নে, মরার পর কি হবে? তোকে শুনতেই হবে।

শুনতেই হবে! চমকে ওঠে আউলিয়া।

শোন তবে। বারীন সত্যি সত্যি মারা যায় নি। অবশ্য কেউ কোনো দিন তার খোঁজ-খবরও পায় নি। বারীনের মা-বাবা সে আঘাত সহ্য করতে পারলে না। দু'বছরের মধ্যেই তারা মারা গেলেন। সুরো বাবার কাছে ফিরে গেল। সুবোর কোলে দু'বছরের একটি ছোট্ট মেয়ে।

বারীন এখনো বেঁচে রয়েছে। কিন্তু সে বারীন আর নেই। তাকে বড় ভালবাসত। আবার তোর জন্যই তাকে সংসার ছাড়তে হ'ল, সুরোকে ছাড়তে হ'ল।

আমার জন্যে? আতকে উঠে প্রশ্ন ক'রে আউলিয়া। আমার জন্যে? আমি কে?

অন্ধকারের বুকে জিজ্ঞাসার চিহ্ন বিদ্যুতের মত খেলে যায় সারি সারি, আমি কে?

জেনে কোনো লাভ নেই আউলিয়া। কোনো লাভ নেই। আর সেখানে ফিরে যেতে পারবিনে। পাগলা বুড়ো মাস্টারটাকে

ভাল করে দেখবি। দেখিস্ নি? মাঝে মাঝে এদিকে আসে। বারীনের প্রেতাত্মা রে! প্রেতাত্মা ঘুরে ঘু'রে বেড়াচ্ছে। মায়া কাটাতে পারে নি।

বিকট হাসি ছায়ামূর্তির মুখে হাঃ-হাঃ-হাঃ।

ঐ যে মিলিয়ে গেল! ছায়ামূর্তিটা মিলিয়ে গেল। কি সব আবোল-তাবোল ব'লে গেল!

কিলিবিল করছে সব জিজ্ঞাসার চিহ্ন। স্বপ্ন, সবই স্বপ্ন!

আউলিয়া নিজেই হাসছে,—হাঃ-হাঃ-হাঃ।

সানাই বাজছে। বাতাস ভারি হয়ে উঠেছে।

মাতিয়ে তোলে তার সুর। মনে কেমন সাড়া জাগায়। বিয়ে? সেই হাসিখুশী মেয়েটার বিয়ে। সুতপা! কেমন মিষ্টি নাম। বাড়িটা কেমন সাজিয়েছে। সামনে মস্ত বড় প্যাণ্ডেল। বাহারে গাছ সব বড় বড় টবে। বাড়ির চার ধারে বড় বড় দেবদারু গাছে আলোর ঝিলিমিলি। শহরশুদ্ধ লোকের নিমন্ত্রণ।

সবই শুনেছে আউলিয়া। সুতপার বিয়ে। রায়বাহাদুরের নাতনীর বিয়ে। লোকের মুখে মুখে শুধু এই কথা। অনেক খরচ করছে। সবই পাবে ঐ নাতনী। আর কে ই বা আছে। আহা হা, মেয়েটির বাবা নেই। কেউ নেই। আছে শুধু এই বুড়ো দাদু, আর আছে ঐ মা।

আউলিয়া জ্বরের ঘোরে কাতরাচ্ছে। জ্বর! আউলিয়ার মনে পড়ে, অনেক দিন কোনো জ্বরজাড়ি তার হয় নি। অসুখ-বিসুখ ত ভুলেই গেছে। পীরের দরগায় সেই বকুলগাছটার তলায় শুয়ে আছে আউলিয়া।

আঃ, কি যন্ত্রণা। মাথাটা ছিঁড়ে গেল বুঝি। এরকম ত কোনোদিন হয় নি।

সেই পাগলা মাস্টারটাকে কালও দেখেছে আউলিয়া।

মাস্টারটাও যেন কেমন ! রায়বাহাদুরের বাড়ির সামনে অনেকক্ষণ দাঁড়িয়েছিল। বিড়বিড় করে যেন বকছিল। মাঝে মাঝে হাসছিলও। পাগল ! পাগল ছাড়া এরকম কেউ ক'রে ?

সানাই বাজছে না সানাই কাঁদছে ! সুতপার বিয়ে। যদি তার বাবা বেঁচে থাকত !—শুনেছে আউলিয়া, ওরা বলাবলি করে, স্বদেশী ডাকাত ছিল ওর বাবা। ডাকাত,—স্বদেশী ডাকাত। দেশ উদ্ধার করবে। পুলিশ আর সাহেব ম্যাজিস্ট্রেটগুলো ওদের ভয়ে অস্থির থাকত। আবার স্বদেশী ডাকাতের পেছনে ছায়ার মত লেগে থাকত সব পুলিশ,—যত সব টিকটিকি। কোথা যেন গুলি খেয়ে মরেছে সুতপার বাবা। তার লাসটাও পাওয়া যায় নি।

একুশ বছর !—কালের চাকা গড়িয়ে চলেছে। ওরা তার কথা ভুলেই গেছে। সুতপা তার বাবাকে হয়ত দেখেও নি। এই ডাকাত ছেলের শোকেই মারা গেল তার বাবা আর মা। সরকারী উকিল ছিলেন তার বাবা। একটি মাত্র ছেলে। ছেলের মা-ও পাগল হয়ে গিয়েছিল। এই ত সেদিনের কথা ! গিরিজা সরকার যেন সবই দেখেছে।

বড় সাধ ক'রে বিয়ে দিয়েছিলেন সরকারী উকিল। তিনিও ছিলেন রায়বাহাদুর। সে কি আড়ম্বর ! কলকাতা থেকে ব্যাণ্ডপার্টি এসেছিল। এসেছিল নামজাদা সানাই-বাজিয়ে ওস্তাদ ওমর খাঁন। বাজি পোড়োনো হয়েছিল হাজার হাজার টাকার।

গিরিজা সরকার সবই জানে।—সুখের হ'ল না সে বিয়ে। শুভদৃষ্টির সময় না কি কনের চোখে কেউ কেউ জল দেখেছিল। কৈলাস দত্তের মেয়ে !—তখনো দত্তমশাই রায়বাহাদুর হন নি।

ডাক্তার ছেলে।—মেডিক্যাল কলেজ থেকে সদ্য পাশ ক'রে বেরিয়েছে। যোগ্য পাত্র পেয়েছেন কৈলাস দত্ত। কথা ছিল,—বিয়ের পরই জামাই মেয়ে বিলেত চলে যাবে।

আকাশ কুসুম !—মানুষ ভাবে এক আর হয়ে যায় আরেক।

শহরের বাড়িতেই ঘটা ক'রে বিয়ে হয়েছিল। তারপর আপন

গাঁ ফুলছড়িতে জামাই আর মেয়েকে নিয়ে এসেছিলেন দত্তমশাই। সেখানেও বিরাট ভোজ দিয়েছিলেন কৈলাস দত্ত।

গিরিজা সরকার সে গাঁয়ে গিয়েছিল। বরাকনদীর পারে সেই ফুলছড়ি গাঁ। নদীর ওপারে পাহাড় আর, ফুলছড়ি গাঁয়ের মাঠের ওধারেও পাহাড়। মাঠের এখানে ওখানে ছোট ছোট গাঁ।

কত কথা বলে গিরিজা সরকার। দত্ত মশাইয়ের দোষেই না কি ডাক্তার-জামাই আত্মহত্যা করেছে। হ্যাঁ, আত্মহত্যা বৈ কি। তা না হ'লে এমন সোনার টুকরো ছেলে স্বদেশী ক'রে শ্বশুরের উপর জেদ মেটাতে গিয়েই মেল-ট্রেন লুঠ করতে গেল সেই ছেলে। কোথায় বিলেত গিয়ে ডাক্তারী পড়ে সিভিল সার্জেন হবে, তা না পুলিশের গুলিতে প্রাণটাই দিয়ে বসলে।

ছিঃ। ছিঃ! তাও আবার উড়ো খবর। কেউ খোঁজ খবরও নিলে না। এমন যে পুলিশের বড় কর্তা ছেলের মামা, তিনিও চুপ ক'রে গেলেন। চাকরির মায়া!

—না, না। ওর সঙ্গে আমার কোনো সম্পর্ক নেই। মেয়ে আমার বিধবা হয়েছে। তাই ভাল,—এ কালসাপ বেঁচে থাকলে মেয়ে আমার সুখী হ'ত না।—কৈলাস দত্ত বুক বেঁধেছেন।

আউলিয়া আশ্চর্য হ'য়ে শোনে। সকলের মুখেই এক কথা। ওরা যেন রায়বাহাদুরের নাড়ীনক্ষত্রের সকল খবরই রাখে। রায়বাহাদুরের মেয়ের সম্পর্কেও কানাঘুষায় কত কি বলে।

হাসে আউলিয়া। আজ সুতপার বিয়ে উপলক্ষ্য ক'রেই এদের মুখ খুলে গেছে।—হ্যাঁ, এইত সেই সুরুচিরানী! সে-ই যত নষ্টের গোড়া। আজ পিসীমা মাসীমা সেজে মুরুব্বিয়ানা করছে। কিন্তু সেদিন তোর জন্যই ত বাপু এমন সর্বনাশটা হ'য়ে গেল। রূপের চটক দিল। তা বাপু, বললেই পারতিস, তোর মনের মানুষকে খুঁজে আনত তোর বাবা।

এমনি কত কথা।—আউলিয়া অনেক শুনেছে। এরকম হয়েই থাকে। ঈর্ষা! মানুষের নিজের কোনো স্বার্থ না থাকলেও ঈর্ষায়

মানুষ কি না ক'রে। ওই ত অমূল্য উকিলের সেজো ছেলের বিয়ের কথা হচ্ছিল। মেয়ের পক্ষকে কে নাকি চিঠি দিয়ে জানিয়েছে,—ও বাড়িতে বিয়ে দেবেন না। ছেলের বড় দু'ভাইয়ের বুকের অসুখ আছে। অর্থাৎ যক্ষ্মা। আর ছেলেটি বদ্ধ পাগল। অথচ ছেলেটি কবি, সাহিত্যিক। এরই মধ্যে তার বই দু'চারখানা বেরিয়েছে। নামও করেছে। কিন্তু খেয়ালী মানুষ। বেশভূষার বালাই নেই। উস্কখুস্ক চুল। কখনো বা এক পায়ে মোজা প'রেই বেরিয়ে পড়ল। কখনো বা পাটভাঙ্গা ধূতি পরনে ; তার উপর একটা ময়লা জামা।

নিন্দে ! মানুষের নিন্দে। ঈর্ষার জন্যই মানুষ জ্বলেপুড়ে মরে।—যাক্, ওইত সানাই বাজছে।

কত লোক, কত গাড়ি। সাহেবরাও যাচ্ছে। রঙ-বেরঙের পোশাক। গায়ে পোশাকে ওরা গন্ধ মেখেছে। হাওয়ায় ভেসে আসছে তার সুবাস।—রায়বাহাদুরের নাতনির বিয়ে।

সানাই বাজছে—পো-পো-পো।

ডাকছে সানাই, আদর ক'রে ডাকছে। আনন্দ! সানাইয়ের সুর মনের ভেতরটাকেও মাতিয়ে তুলছে। আকাশে-বাতাসে আজ প্রিয়জন সংবর্ধনার সুর। মাধবীলতা দুলছে। ফুরফুরে হাওয়া। লতাটা কাছাকাছি বকুলের ডালটাকে ছুঁয়ে ছুঁয়ে আসছে। ধরবে ঐ ডালটাকে।

আউলিয়া মাধবীলতার এ খেলা তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছে। তারও মনে আজ কেমন যেন এক পুলকের সাড়া। দেখতে দেখতে ঘরের ঘোরটা কেটে গেছে। আউলিয়া উঠে বসতে চাইল, কিন্তু পারলে না। বিয়েটা দেখতে হবে। রায়বাহাদুরের বাড়িটা যেন তাকে চুম্বকের মত টানছে।

শহরের কেউ বুঝি বাকি নেই। সকলের নিমন্ত্রণ। ছেলে বুড়ো দলে দলে এগিয়ে যাচ্ছে। মেয়েদের হাসির ঢেউ বাতাসে ভেসে আসছে। সাজগোজ ক'রে চলেছে সব। ওদেরই যেন বিয়ে!

নানা রকম কথা,—ও আবার বিয়ে ? ছোড়াটার সঙ্গে ত মেয়েটা

রাতদিন ঘুরে বেড়ায়। সাতপাকটা শুধু বাকি আছে, আর সব পাকই হয়ে গেছে। একজন আর একজনকে—কথাটা বলে ধাক্কা মারে। আবার হেসে লুটোপুটি খায় দুজনে।

আউলিয়াকে কেউ ডাকে না। নিমন্ত্রণও করে না। কোনদিন করবেও না। সে যে মানুষের সমাজের বাইরে। তার সুমুখ দিয়ে বরকনে গেলে তাকে সেলাম জানায়। কেউ বা দু'চার আনা ছুঁড়েও ফেলে দেয়। কেউ কেউ আবার তার পায়ের ধূলোও নিয়ে গিয়ে বরকনের কপালে ঠেকিয়ে দেয়।

তারই নেই নিমন্ত্রণ! আশ্চর্য এ ব্যাপার!—আউলিয়া ভাবে সত্য সে সৃষ্টিছাড়া।

এদিকে সানাই বেজে চলেছে। যাদু আছে এই সানাইয়ের সুরে। ঘরকে পর করে, আর পরকে করে আপন।

আপন জনের বুক ফেটে যায়। নাড়ী ছিঁড়ে যেন বেরিয়ে যায়। তাদের অন্তর আলো-করা একটি ফুল। সে ফুল ছিঁড়ে নিয়ে যায়। না, না, নিজের হাতে ছিঁড়ে দেয় সে ফুল,—মেয়ে! বিয়ে?—মা আর বাবা, দু'জনকেই ছেড়ে যেতে হবে। ছোট ছোট ভাইবোন,—যাদের সঙ্গে এতদিন হুড়োহুড়ি, ছুটোছুটি করেছে তারাই পর হ'য়ে যাবে। অজানা অচেনা একজন হবে বড় আপন। গড়ে উঠবে নারীর বন্ধনে নতুন সংসার।

সুরুচিরাণীর মেয়ের বিয়ে! মায়ের মতনই মুখ আর চোখ! আর একটি মেয়ের কথা মনে পড়ে যায়।

সে যে স্বপ্নের কথা। এ জন্মে না পূর্ব জন্মে ঠিক ধরতে পারে না। ওই রকমই একটা মেয়ে যে তার সঙ্গে খেলা করত। লুটোপুটি, ছুটাছুটি করত। ঠিক্ ঠিক ওই রকমই দেখতে। মনের পর্দায় ছবি ভেসে ওঠে।

নাঃ। সে আর হবার নয়। এ জন্মের কথা নয়। কোন্ এক জন্মে এসব ঘটে গেছে। আউলিয়ার কেউ নেই। যদি থাকত, তাহলে নিশ্চয়ই তাকে চিনত। নিশ্চয়ই তাকে ডাকত।

বিয়ে ? এ এক যাদু। ফুটে উঠবে কিশোরী কন্যার জীবনের ফুল। ফুটি ফুটি ক'রেও যা ফুটে উঠছে না। কি এক লজ্জা, কি এক সরম সংকোচে যেন নিজেকে লুকিয়ে রাখতে চাইছে। নিজের দেহের দিকে তাকিয়ে নিজেই পুলকে সরমে আত্মহারা হয়ে যায়। আজ তার সমাপ্তি ঘটবে। সানাই তারই গান গাইছে। থমকে গেছে লজ্জা সরমের আবরণ। হ্যাঁ, ঘোমটা পড়বে তার সেই সংকোচের, তার সেই সরমের উচ্ছলতায়। ঘোমটা টেনে দেবে অচেনা এক অতিথি।

ওরা দু'জনেই দু'জনের শূন্যতা পূরণ করবে। তারা এক হ'য়ে যাবে। পুরুতের মন্ত্র না সানাইয়েয় সুর ? কিসে দু'টি হৃদয়কে এক ক'রে দেয় ? আউলিয়া আশ্চর্য হয়।

সে নিজে ত আউলিয়া ফকির। তার জীবনে এমন দিন কখনো আর আসবে না। সে শুধু সানাইয়ের সুর শুনবে। সে যে মানুষের জগতের লোকই নয়। ওদের আনন্দ উৎসবের সঙ্গে তার কোনো যোগ নেই। সে শুধু দেখবে আর চলতে থাকবে। তার বিরাম নেই, বিশ্রাম নেই। নেই তার ঘর। সে ঘর বাঁধেনি, আর বাঁধতেও পারবে না। ঘর থাকলে ত ঘরনীর প্রয়োজন। তার ঘর যে এই অনন্ত আকাশ। ঘরনী এই পৃথিবী,—পায়ের নীচে। সে কোলই দেয়।

--জ্বলুক, জ্বলুক হাজার বাতি। নিজের হাতে মোমবাতি জ্বেলে দেয় আউলিয়া। কি জানি কেমন এক খেয়াল তাকে পেয়ে বসেছে।

—নিভবে না, সারারাত জ্বলবে।—ওই সানাইয়ের সুরই সব গোলমাল ক'রে দিলে। কেমন যেন এক মায়া ছড়াচ্ছে সানাইটা। আউলিয়ার মনেও পুলকের ঢেউ লেগেছে। জ্বর আর নেই,—যাঃ, বাঁচা গেল !

—বেশ মেয়েটি। সুখী হোক্। সুখে থাকুক। জ্বলুক সুন্দর ওই আলোর মত। মায়ের মত নয়। আহা-হা ! মা-টি ত জ্বলেপুড়ে

মরছে। বাইরে ঠাট দেখালে কি হবে? তার আসল রূপটি কেউ দেখতে পায় না। উপরের খোলসটা খুলে ফেললে সব বেরিয়ে পড়বে।

—সুখী হোক্ মেয়েটি। কি জানি যেন নাম?—হ্যাঁ, সুতপা। বেশ সুন্দর নাম। মনে মনে নামটি আওড়ায় আউলিয়া।

বাঃ! বেশ মজা ত। পাগলা মাস্টারটাও এসে জুটেছে। অন্টরম্ভা! তোমারও নেমন্তন্ন হয়েছে না কি?—বিড়বিড় ক'রে বকছে আউলিয়া।

ও কি? রায়বাহাদুরের বাড়ির দিকেই যাচ্ছে পাগলা মাস্টারটা। তারও নেমন্তন্ন হয়েছে না কি? ওকে সেখানে কে পুছবে? পাগলা!—পাগলামাস্টার! আচ্ছা, লোকটা ওরকম থাকে কেন? নিশ্চয়ই কোন কারণ আছে। কারণ?—কারণ ছাড়া কিছুই হয় না। কিন্তু, আউলিয়া কেন আউলিয়া হ'ল,—এর কি কোনো কারণ রয়েছে?

যাঃ, সব গুলিয়ে গেল। পাগলমাস্টার যাচ্ছে। ওখানে বিয়ে বাড়িতে যত সব বড় বড় লোক জড় হয়েছে। কত গাড়ি! না, না, ও সেখানে পাত্তাই পাবে না। তাড়িয়ে দেবে! নিশ্চয়ই তাড়িয়ে দেবে। গলায় আবার স্টেথিস্কোপ ঝুলিয়েছে। মাস্টার না ডাক্তার!

নিশ্চয়ই খাওয়ার লোভে যাচ্ছে। বিয়েবাড়ির এঁটোপাতা! কুকুর আর কাকের সঙ্গে কাড়াকাড়ি করছে কয়েকটা ভিখারী,—পাগলা! পাগলা আর কি! কি ময়লা নেকড়া ওদের পরনে। কুড়িয়ে খাচ্ছে,—আবার কাড়াকাড়ি লাগিয়েছে একটা ছেলে আর একটা মেয়ে!

হ্যাঁ, এরকম কত দেখেছে আউলিয়া। রায়বাহাদুরের বাড়িতেও এরকম হবে। রাতের অন্ধকারে ওই ঝিলমিল করা আলোর তলায় অন্ধকারে লুকিয়ে আছে তারা,—কুকুর-কুকুরী! না, না, মানুষের যত বাচ্চা। তবু ওরা মানুষ নয়। সবাই দেখে, আবার তাড়াও ক'রে।

দয়া আর মায়া ?—মিছে কথা। কাঙালীদের ভোজ খাইয়ে মজা দেখে যত সব বড় বড় লোক! ওরা জয় জয় করে। বড় লোকদের বুকের ছাতি কেমন ফোলে সে জয় জয় শুনে।

সত্য কথা বলেছে মিঠাইওয়ালা যামিনী মহাজন। সন্দেশ-মিঠাইয়ের দৌলতে যামিনী ময়রা আজ যামিনী মহাজন। তারও বাড়িগাড়ি হয়েছে। যামিনী বলেছে,—বড় কড়া লোক এই রায়-বাহাদুর। সকলে মনে ক'রে ইজিচেয়ারে বসে বসে বড়ো মানুষটি ঝিমোচ্ছেন। উনি চোখে দেখতে পান না। কিন্তু আসলে সবই দেখতে পান। চেনা লোক সামনে দাঁড়ালে জিজ্ঞেস করেন,—কে তুমি বাবা। চিনতে পারলুম না।—তারপর পরিচয় দিলে বলতে থাকেন,—কি ভুলো মন আমার! চোখে দেখতে পাইনে, কানেও শুনতে পাইনে। তা বেশ, বসো, বসো।

-অথচ বড় মজা। রায়বাহাদুর সকলের নাড়ী নক্ষত্রের খবর রাখেন। কার ছেলে কি করছে, কোন্ মেয়ে কার সঙ্গে আশনাই করছে, কোন বাব কোন্ পথে চলেন,—সবই জানেন রায়বাহাদুর। কোন্ ডালে কোন্ পাখি বাসা বাঁধছে, —সবই তার নখদর্পণে।

—সাহেবরাও খাতির করে। করবে না? স্বদেশীদের হাত থেকে কোন্ এক ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের জান বাঁচিয়েছিলেন দত্তমশাই। সেদিন থেকেই তাঁর বরাত ফিরে গেল।

উপাধি পেয়েছিলেন কৈলাস দত্ত। কিন্তু উপাধিটা আজো তাকে ছাড়েনি। সবাই বলে রায়বাহাদুর। সেই রায়বাহাদুরের নাতনীর বিয়ে!

—সুখ আছে কি ওই রায়বাহাদুরের মনে? তবু দাপট আছে. হাসতেনও রায়বাহাদুর। তারই মেয়ে,—সেই মেয়েটার ভরাযৌবন নষ্ট হয়ে গেল। রাতদিন ব্যস্ত থাকতেন রায়বাহাদুর। সাহেবসুবো নিয়ে কারবার। তারপর মাড়োয়ারী, ভাটিয়া আর গুজরাটি সব কারবারীর দল। ব্যবসা, কনট্রাক্ট আর লাইসেন্স! বড় বড় পার্টি!

মেয়েটি কিন্তু সেদিক্ দিয়ে যায় না। তারও শুধু কাজ আর

কাজ। মেয়েদের জন্যে স্কুল করলে। কিন্তু এ ধরনের স্কুল নয়। মেয়েরা যাতে কাজকর্ম শিখে নিজের পায়ে দাঁড়াতে পারে সে স্কুল—নারীশিক্ষা প্রতিষ্ঠান। স্বদেশীরই হেরফের! কোলে একটি মেয়ে। সেই মেয়ে আজ বড় হয়েছে। দেশের হাওয়াও পালটে গেছে। রায়বাহাদুরও ভোল পালটেছেন। লর্ড ওয়াভেলের ডাকে একদিন দিল্লীতে দেশী নেতারা এসে হাত মেলালেন।

—হ্যা, সেদিন রায়বাহাদুরের কানে কানে জেলা ম্যাজিস্ট্রেট খাস বিলিতি সাহেব কি এক মন্ত্র দিয়ে গিয়েছিলেন, কেউ জানে না। রাতারাতি দেশের কাজে নেমে পড়লেন রায়বাহাদুর। দেশে দাঙ্গা লেগেছিল। ঘরবাড়ি পুড়িয়ে দিয়েছে ; কত মানুষ যে কাটা-কাটি মারামারি ক'রে মরেছে, তার ঠিক-ঠিকানা নেই।

রায়বাহাদুর অন্নছত্র খুললেন। নিজে দাঁড়িয়ে তদ্বির করেন রায়বাহাদুর! শাড়ি, ধুতি ও জামা বিলি করলেন। ধন্য ধন্য প'ড়ে গেল। হিন্দু-মুসলমানে বাচ্‌বিচার নেই।

ফুঃ! বড় মজা! রায়বাহাদুরের কাহিনী। কিন্তু তারই মেয়ে প্রতিশোধ নিয়েছিল।- কার উপর প্রতিশোধ?

হ্যা মনে পড়ছে,—কিন্তু এই মেয়েটি কি সে-ই?

ছায়ামূর্তি বলছে,—জানিস্ বারীনকে বিয়ে ক'রে রাজুর উপর প্রতিশোধ নিয়েছে মেয়েটা। বারীনকে সে দুচোখে দেখতে পারত না। বারীনও তাকে সহ্য করতে পারত না।

আরো শোন,—নাসিম শেখ যে আগুন দিয়েছিল, তারও গোড়ায় ছিল এই মেয়েটা। শোধ নিয়েছিল,—রাজুকে ঘরছাড়া, দেশছাড়া করবার মতলবে ছিল মেয়েটা। কিন্তু এত ক'রেও কি শান্তি পেয়েছে?

ছায়ামূর্তি মিলিয়ে যায়। স্বপ্নও ভেঙ্গে যায়।

—কে সেই মেয়ে?

আউলিয়া দু'হাতে চোখ রগড়ায়। গাছের ডালে পাখির ডানার ঝটাপট শব্দ!

অন্ধকারের বুকেও ছবি দেখে আউলিয়া। অন্ধকার থেকেই আলো। গর্ভযন্ত্রণায় কাঁদছে অন্ধকার,—তার ভেতরটা দেখতে পাচ্ছে আউলিয়া—মায়ের গর্ভের ভেতরে জলের মধ্যে শিশু ভাসে। অন্ধকার, শুধু জল আর জল! মুক্তি চায় শিশু।

হায়রে, তারা আলোর মাঝে মুক্তি পেয়েই সব ভুলে যায়।

আকাশে আলোর ঝিলিমিলি।

আলোর ঝিলিক দেখা যাচ্ছে। দুমদুম আওয়াজ হ'ল। আকাশে ফুটে উঠল ফুলের মালা,—লাল, সবুজ, নীল! কত রঙের ফুল। বাজি পোড়াচ্ছে। আর সঙ্গে সঙ্গে বাজছে সানাই।

হঠাৎ এ কি হ'ল। সানাই থেমে গেছে। কি একটা গোলমাল, —কি একটা কলরব! বিয়ে বাড়ি থেকে ফিরছে কেউ কেউ। ওদের মুখে নানা কথা। অ্যাঁ, কি বলছে ওরা?

—সব পণ্ড ক'রে দিলে একটা পাগল। মেরেছে। খুব মার খেয়েছে। একেবারে অন্দরে ঢুকে পড়েছিল। একেবারে বাসর ঘরে।

—তাই, না কি?—একেবারে বাসরঘরে।

হ্যাঁ। বিয়ে বাড়ি, কে কার খবর রাখে। কত লোক আসছে, যাচ্ছে। কে কাকে চেনে, অগুনতি লোকের মাঝে এমনি কতজন যে খেয়ে গেছে তার ঠিক-ঠিকানা নেই।

—এরকম ও হয়েই থাকে। আমি ত দেখলুম, আমাদের হরিদাস বুড়োর নাতি নাতনী সব পংক্তিতে ব'সে বেশ আরামে লুচিসন্দেশ খাচ্ছে। ওদের নিমন্তন্ন হয়েছিল না কি

—আরে, ছ্যা, ছ্যা!—যাক্, ওই পাগলটার সাহস কম নয়। একেবারে বাসরঘরে,—কি সর্বনাশ করেছে বল ত

—হ্যাঁ, বিয়ের কনে না কি মূর্ছা গেছে।

—হ্যাঁ। রায়বাহাদুরের নাত্‌নি ওই পাগলটার চোখের দিকে তাকিয়ে না কি হঠাৎ চীৎকার ক'রে ওঠে। তারপর কেঁপে কেঁপে

লুটিয়ে পড়ে। পাশে বরটি বসেছিল,—সে বেচারী ত হতভম্ব। মেয়েরা সব চীৎকার করে ওঠে। ভয়ে সব কাঠ হয়ে গিয়েছে। ক্ষীরোদ উকিলের সেই মোটাগিন্নী ত পালাতে গিয়ে চৌকাঠে হুচোট্ খেয়ে পড়ে গেছেন। মোটা মানুষ,—কি আতান্তর বল দেখি!

বিয়েবাড়ি, বিয়ের রাত। কি কাণ্ড বল দেখি?

আরেক জনের গলা শোনা যায়, বেশ করেছে। ব্যাটাকে খুন করে নি, তাই তার বাপের ভাগ্যি। যত সব পাগলের কাণ্ড। সেই পাগলা মাস্টারটা। দেখোনি তাকে?

কোন্ মাস্টার গো?

আরে, সেই যে মাঝে মাঝে রায়বাহাদুরের বাড়ির কাছে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা যায়। মুখময় দাঁড়ি গোঁফ, ছেঁড়া তালি দেওয়া গলাবন্ধ একটা কোট গায়ে। গলায় ঝুলছে একটা ভাঙা স্টেথিস্কোপ।

ছিঃ, ছিঃ, কি উৎপাত বলত? কয়েকটা ছোকরা ত নানা কথা রটিয়ে দিলে। ওরা বলছে, পাগলামাস্টার হতে যাবে কেন? সেই রবীন ঘোষাল, অবনী ব্যারিস্টারের ছেলে। ওর সঙ্গে না কি মেয়েটার ভাবসাব ছিল। মাথা ঠিক রাখতে পারে নি ছোক্রা, বাসরে ঢুকে না কি যা মুখে আসে তা-ই বলছিল।

না, না। মিছে কথা।

কি জানি ভাই! লোকে বলে শাক দিয়ে মাছ ঢাকার চেষ্টা। পাগলা মাস্টারটা কাছেই ছিল। তার উপর দিয়েই চালিয়ে দিয়েছে।

না। আমি নিজের চোখে দেখেছি। আমার দিদি বাসর ঘরে এখনো রয়েছে কি না। আমি দিদির খোঁজে গেছলাম। দিদিই সব বললে। দিদি এখনো সেখানে রয়ে গেছে।

—তা-ই ভাল। শুনেছি, পাগলা মাস্টারটাকে পুলিশে ধরে নিয়ে গেছে।

—হ্যাঁ। খুব মার খেয়েছে বাছাধন। নাকটা থেতঁলে দিয়েছে। পুলিশ আর কি করবে। পাগল,—নেহাৎ পাগল।

—পাগল নয়ত কি?

—হ্যাঁ। বাসর ঘরে ঢুকে ব'লে কি না একটি বার দেখতে দাও। যত মার খাচ্ছে, তত চীৎকার করছে, আমায় একটি বার দেখতে দাও। ওরে—আমি, আমি—।

—সব পণ্ড ক'রে দিয়েছে পাগলাটা। মেয়েটার জ্ঞান ফেরে নি শুনছি।

কান পেতে আউলিয়া পথচারিদের কথা শোনে।

—হ্যাঁ, বিয়ে হয়ে গেছে। সাতপাকের আগে এরকম হ'লে কোনো উপায়ই থাকত না।

হাসির ঝিলিক আউলিয়ার মুখে—জ্বলুক্ একশো বাতি, একশো রোগ জ্বলুক্।—বিয়ে হয়ে গেছে! রায়বাহাদুরের নাত্নীর বিয়ে হ'য়ে গেছে।

•

সানাই আর বাজছে না। রাতও গভীর হ'তে চলেছে। নিঝুম, নিঃশব্দ হয়ে যাচ্ছে সব। বিয়ে বাড়ির আকাশে আলোর ঝিলিকেও যেন থমথমে কালো ছায়া পড়েছে।

—অ্যা,—লোকগুলো কি বলে গেল? বিয়ের কনে মূর্ছা গেছে। পাগলা মাস্টারটা সব পণ্ড ক'রে দিয়েছে!

—কেন?—কেন এমন হ'ল?—পাগলা মাস্টার!—চীৎকার ক'রে ডাকে আউলিয়া—পাগলা মাস্টার!

অন্ধকারের বুক চিরে চিরে আউলিয়ার সে আওয়াজ দূরে,—বহু দূরে চলে যায়। অন্ধকারের মধ্যেও ওঠে যেন অন্ধকারের ঢেউ। তারাগুলোও চমকে চমকে ওঠে—'পাগলা মাস্টার!'

হাতের লাঠিটা শূন্যে ঘোরাতে থাকে আউলিয়া। তার চোখ বিকট ও ভয়াল হ'য়ে ওঠে।

দরগার মধ্যে পাগলের মত পায়চারি ক'রে আউলিয়া। তার মাথার মধ্যে কেমন যেন ঢেউ উঠেছে—মিছিল চলেছে মগজের ভেতর। চোখ বুঁজেও দেখতে পাচ্ছে, মানুষের মিছিল, পথঘাট, বাড়িঘর, পাহাড় জঙ্গল ছেলেবুড়ো কত জন!—কত জাতের মানুষ!

—রাতরাণী! সেই রাতরাণীর কথা মনে প'ড়ে যায়। সেই ভৈরবী! কোথায় তারা? এই মিছিলের মাঝে তারা কোথায়? এত মানুষ! ছবির পর ছবি! খুঁজছে, আউলিয়া খুঁজছে! এ যে ছায়া-মিছিল! তব ছুটে যায়, ধরতে যায়। সামনে ত তার কেউ নেই! ধরবে কাকে? নিজের মগজের ভেতর ছবির মিছিল।

কেঁদে ওঠে আউলিয়া।

মনে প'ড়ে যায় সেই পাগলা ফকির বলেছিল, কেউ তারা হারায় নি বাবা! খুঁজে দেখ, সবাইকে পাবি। ওই মানুষগুলোর মাঝেই তারা লুকিয়ে আছে। শুধু রূপ পালটেছে। শুধু কি রূপ? কেউ বা ঘাসের ফুল হ'য়ে হাসছে। কেউ হয়েছে পাখি। আবার কেউ প্রজাপতি হ'য়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে।

—মিছে কথা। কি ক'রে তারা থাকবে? এত খুঁজছি, তব কেউ ত ধরা দিচ্ছে না। রূপ পালটেছে! তারা আমাকে ভুলে গেছে। শুধু রূপ নয়, তাদের মনও পালটে গেছে। তাদের নামও ভুলে গেছি। আর রূপ?—না, না, কিছুতেই যে মনে পড়ছে না!

আঃ! আঃ! আঃ!

আউলিয়ার বুক ফেটে যেন আর্ত চীৎকার বেরিয়ে আসছে।

তাই ত? রায়বাহাদুরের নাতনীর বিয়ে!—বিয়ে, সে ত তাজ্জব কাণ্ড। বিয়েতে সুখ কোথায়? বিয়ে ভেঙে যায়। ছাড়াছাড়ি হয়। ওই যে মাধবী সেন! ওরা ব'লে তার নাম ছিল শ্যামলী। শ্যামলীর বিয়ে হয়েছিল এক অধ্যাপকের সঙ্গে—কলেজের মাস্টার। আপন-ভোলা মানুষ। সুখে দিন কাটাছিল। হঠাৎ কি যেন এক রোগে পঙ্গু হ'য়ে গেল সেই মাস্টার। দিন আর চলে না। সংসারের খরচ চলে না। অধ্যাপকের বন্ধু,—হ্যাঁ, বন্ধু বটে। বন্ধুটি ছিল কি জানি এক সিনেমার ডাইরেক্টার না কি! সে-ই যুক্তি দিল শ্যামলীকে—সিনেমায় নেমে পড়ো। চিন্তা কি? ওরা ব'লে লভ্ ম্যারেজ। বড়লোকের মেয়ে শ্যামলী ভালবেসে সেই কলেজের মাস্টারকে বিয়ে

করেছিল। বাপ-মার সঙ্গে মুখ দেখাদেখি নেই। অজাত!—অজাতে বিয়ে করেছিল শ্যামলী। বড় তেজী মেয়ে।

শ্যামলী বাপের কাছে ফিরে গেল না। স্বামীকে বাঁচাবার জন্যে বন্ধুরা পরামর্শ নিল। সিনেমায় নামল শ্যামলী,—এখন মাধবী সেন। ওরা ব'লে চিত্র-তারকা। পঙ্গু স্বামী বিছানায় পড়ে ছিল, বাধাও দিয়েছিল। কিন্তু ভরসা দিয়েছিল বন্ধুটি। কিন্তু সে ভরসার কোনো দামই রইল না। দু'চার মাস বেশ কাটল। তারপর শ্যামলী মাঝে মাঝে রাত্রেও বাড়ি ফিরত না। স্বামীর শুশ্রূষার জন্য নার্স রেখেছিল শ্যামলী।

কিন্তু শ্যামলা যে আর শ্যামলী নেই। বেচারী অধ্যাপক তা বুঝেছিল। শুকিয়ে মবল সে বেচারী চিন্তা-জ্বরে। শুকিয়ে মরল। কত কথা শুনেছে আউলিয়া,—মাধবী সেন চিত্র-তারকা। তাকে দেখবার জন্য ভিড় লেগে যায়।

না,—না, না। ওই যে সানাই বাজছে। সুতপার বিয়ে। তাবা সুখী হবে।

মাধবী সেনেবা বেঁচে থাক্ গোল্লায় যাক। ছেলেবুড়োরা হল্লা ক'রে মাধবী সেনকে দেখবাব জন্যে ভিড় লাগাক্। ক্ষতি নেই। সুতপা সুখী হোক্ তার স্বামীকে নিয়ে।

এ কি? আজ যে প্রার্থনা করছে আউলিয়া। কেন? কেন? সুতপার জন্য কেন তার মন আকুলিবিকুলি করছে। সে ত আউলিয়া। তার কোনো বন্ধন নেই। মায়া-মমতা নেই তার।

বিয়ে? সে ত এক হাসির ব্যাপার? ঘর বাঁধতে যাচ্ছে মানব আর মানবী। আদম আর ঈভ সর্বনাশ ক'রে গেছে। স্রোত নেমে আসছে আদম আর ঈভ থেকে। স্রোত বইছে মানুষের। কামনা? কাম!

হঠাৎ সম্বিৎ ফিরে পায় আউলিয়া।

এ কি? সানাইটা বাজছে না কেন? রাত যে কাবার হ'য়ে এল। তা হ'লে কি ওরা ঘুমিয়ে পড়েছে। এত কোলাহল, এত

হৈ চৈ হঠাৎ থেমে গেল !

ভোঁস্ ভোঁস্ ক'রে দু'একখানা মোটর চলে যাচ্ছে। গভীর রাত। কি যেন এক থমথমে ভাব। ফাল্গুনের রাতেও কালো ছায়া যেন পাখা মেলেছে শকুনের মত। তালগাছের মাথায় হি-হি কান্নার মত শব্দ।

লোকজন ছুটাছুটি করছে। কি যেন বলাবলি করতে করতে কেউ কেউ যাচ্ছে।

নাঃ। আশা নেই। কর্নেল চ্যাটার্জিকে ডেকে পাঠানো হয়েছে। বিজিত ডাক্তার ত হতাশ হ'য়ে পড়েছে। কি জানি কি হয়? এমনি কত কথা কানে ভেসে আসে।

আউলিয়া অস্থির হ'য়ে ওঠে, কি হ'ল ?

—বাঁচবে না। মেয়েটা বাঁচবে না। ভয়ে না কি শক্ পেয়েছে ! মেয়ের মা ত মাথা খুঁড়ে মরছে। তাকে ধ'রে রাখতে পারা যাচ্ছে না।

এঁ্যা ! এরা এ কি বলছে ? আতকে ওঠে আউলিয়া।

হ্যাঁ, ওই পাগলা মাস্টারটা না কি অন্দরে ঢুকে পড়েছিল ?

আরে বাবা ! সে-ই যত নষ্টের গোড়া। বিয়ের রাত, কত লোক আসছে যাচ্ছে। কে কার খবর রাখে বলো।

পাগলাটার সেই মূর্তি দেখেই মেয়েটা মূর্ছা গেছে। এখনো তার মূর্ছা ভাঙেনি। কাঁদছে। সবাই কাঁদছে।

পাগলাটাকে ত শুনেছি ধ'রে নিয়ে গেছে।

হ্যাঁ, শুধু কি ধ'রে নেওয়া ? উত্তম মধ্যম খুব দেওয়া হয়েছে। আমি ত দেখেছি, লোকটার নাকমুখ দিয়ে রক্ত ঝরছে। ঘাড়ে ধ'রে নিয়ে গেছে পুলিশ। তবু ত চীৎকার করছিল।

আউলিয়ার কানে কথাগুলো তীরের মতন বেঁধে।

আউলিয়া ছটফট করে ওঠে। বাসরঘরের বিভীষিকা যেন তার চোখের সামনে। পায়চারি করতে করতে আওড়ায়—পাগল মাস্টার ! পাগলামাস্টারকে আমি খুন করব।

ওরে পাগল! কে যেন আউলিয়াকে ডাকছে।

সামনে সেই ছায়ামূর্তি। উস্কখুস্ক তার চুল। চোখে যেন জল ছলছল করছে!

আবার? আবার এসেছো তুমি?

হ্যাঁরে। আমি আবার এসেছি। ওই মেয়েটার কথা বলতেই এসেছি। শোন, মেয়েটি, ওই সুতপা তার বাপকে দেখলেও তখন এত ছোটো ছিল, তার মনে থাকার কথা নয়। মাকে জিজ্ঞেস করত, বাবার কোনো ছবি নেই মা? তার মা চুপ করে থাকত। আবছা আবছা বাপের একটা ছায়ামূর্তি মনের মাঝে ভাসত মেয়েটির। সে শুনেছিল, তার বাবা স্বদেশী ডাকাতি করতে গিয়ে পুলিশের গুলিতে প্রাণ দিয়েছে। স্বদেশী করত তার বাবা।

আউলিয়া প্রশ্ন করে.—তারপর কি হ'ল?

মেয়েটাকে ছোটবেলা থেকেই একটা বাতিকে পেয়ে বসল। কোথাও কোনো পুরুষ মানুষের ছবি দেখলেই তা একমনে দেখত। আরো দেখা গেল, যে ছবিটা তার চোখে সুন্দর লাগত, তা জোগাড় ক'রে লুকিয়ে রাখত। খবরের কাগজে আর বইয়ের পাতা কেটে কেটে তার খেলার বাক্সে জমা করতে লাগল মেয়েটি। এই ত ছিল তার ছেলেবেলার খেলা।

—বেশ খেলা ত! বাপের ছবি আর পেল না বঝি!—আউলিয়া প্রশ্ন করে।

—না, পায়নি। মেয়েটি শুনেছিল তার বাবা ডাক্তার ছিল। হাসিখুশী মানুষটি। কোনো ডাক্তারকে দেখলেই তার মনটা কেমন ক'রে উঠত। বড় হ'ল মেয়েটি। ছবি কেটে রাখার বাতিকও কেটে গেল। মেয়েটির মা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচল। তব মেয়েটির বাবার কথা উঠলে মেয়ের মা চঞ্চল হয়ে উঠত।

—কি যেন কি এক ব্যাপার ওরা মেয়েটির কাছে লুকোতে চায়। মেয়েটি হাসিখুশী চঞ্চলতার মাঝেও আনমনা হ'য়ে উঠত।—বিয়ে ঠিক হ'ল মেয়েটির। খুব ধুমধাম। রায়বাহাদুরের নাতনীর বিয়ে।

বিয়ের ঠিক আগের দিন মায়ের আলমারিটার ভেতরে কি খুঁজতে গিয়ে একটা সুন্দর পুরনো বাক্স মেয়েটির হাতে পড়ল। বাক্সটা খুলে ফেলল মেয়েটি।

—খুলে ফেললে? কি পেল তার ভেতর?—আউলিয়া চঞ্চল হ'য়ে প্রশ্ন করে।

—তার ভেতর পেল একখানি ফোটো। —বারীন···। কি জ্বলজ্বলে চোখদুটি। সুতপার দিকে তাকিয়ে যেন কথা বলছে সেই ছবির মুখ।

চমকে ওঠে আউলিয়া—কি বললে?—বারীন

অতল অন্ধকার মন্থন ক'রে আলোর ক্ষীণ রেখা যেন বিচ্ছুরিত হচ্ছে। আউলিয়ার চোখে বিদ্যুতের ঝিলিক। চীৎকার ক'রে ওঠে আউলিয়া,—বারীন!—ডাক্তার বারীন?

—হ্যাঁ, মাথা ঠাণ্ডা ক'রে শোন। মেয়েটা ফোটোখানি দেখে চোখের জল ফেললে। মাথায় ঠেকাল ফোটোটা।—তার বাবা! এই সেই ছবি!—অস্ফুট স্বরে ডাকে, বাবা, বাবা, বাবা! এরই সন্ধান করেছে সে এতদিন ধ'রে।

আউলিয়ার বুক ফেটে বের হয় আর্ত চীৎকার—বারীন! বারীনের মেয়ে? তারপর কি হ'ল?

—কি আবার হবে? ছবিটা যেখানে ছিল, সেখানেই রইল। চুপ করে গেল মেয়েটি। উথালপাতাল ঢেউ তার মনে—কেন? এ ছবি মা তাকে এতদিন দেখায় নি?

—ওই রায়বাহাদুরেরই ভয়ে লুকিয়ে রেখেছিল। ভয় কিসের জানিস্? হবু রায়বাহাদুর তখন রাজদ্রোহীদের সঙ্গে যে তার কোনো সম্পর্কে আছে, তা একেবারে মুছে দিতে চেয়েছিল। আর তার মেয়ের মনে ছিল দারুণ ক্ষোভ! সে যে ভুল করেছিল রে, ভুল করেছিল।

—হ্যাঁ, আরো শোন। ওদিকে বিয়ে বাড়ির হট্টগোল। কিন্তু পাগলা মাস্টারটাই গোল বাধালে।

—সে আবার কি করলে ?

—পাগলা মাস্টার বাসরঘরে ঢুকলো। পাগলাটার চোখের দিকে যেমনি তাকাল মেয়েটা, অমনি তার চোখে কি যেন দেখতে পেলে, আর সঙ্গে সঙ্গেই মূর্চ্ছা গেল।

—মূর্চ্ছা গেল ! তাজ্জবকাণ্ড ! পাগলাটা কি কোনো কিছু করেছে ?

—কি আবার করবে ! তার চোখেই যাদু আছে রে, যাদু আছে।

—সে আবার কি ?

—হ্যাঁ, তুইও যদি ওই পাগলটার চোখের দিকে ভাল ক'রে তাকাস্, তোরও এমন হবে। তোর খোঁজাখুঁজিরও শেষ হয়ে যাবে।

—এ আবার কি বলছিস্ ?

—ঠিকই বল্ছি। সবই দেখতে পাবি। সবই বুঝতে পারবি।

উতলা হয়ে উঠল আউলিয়া,—পাগলা মাস্টার !—রায়বাহাদুরের মেয়ে আর নাতনী। বিয়ে আর বাসরঘর !—ছোটবেলা থেকে বাবাকে খুঁজত মেয়েটি। ছবি কেটে কেটে রাখত !

কান পেতে শোনে আউলিয়া,—নাঃ। সানাই ত আর বাজছে না। ওরা কি বলে গেল।—মেয়েটির মূর্চ্ছা ভাঙে নি। বাঁচবে না। আহা ! কেন এমন হ'ল ? পাগলা মাস্টার সব ভুল ক'রে দিল। হ্যাঁ, বাবার ছবি খুঁজে পেয়েছিল মেয়েটি। তারপর ?

আপন মনে বকে চলেছে আউলিয়া, ডাক্তার-বদ্যি পারলে না। এমন আনন্দের দিনটা মাটি হ'ল ! না, তা হ'তে দেবো না। আমি যাবো, আমি আউলিয়া, আমি সিদ্ধপুরুষ। আমার পায়ের ধুলোবই কত গুণ, কত ক্ষমতা !

—নাঃ। আমি ত কাউকে দয়া করিনে। তবু ওরা পায়ের ধুলো নিয়ে যায়। লাথি মেরে তাড়িয়ে দি, তবু মুঠো মুঠো ধুলো নিয়ে গায়ে মাখে।

এমন সময় দুটি লোক রাস্তা দিয়ে বলাবলি ক'রে যাচ্ছে,—আমিও বলেছি, আউলিয়া-বাবার কাছে আসতে, ওর দয়ায় সবই হয়। কিন্তু ওরা কি আসবে? আরেক জন বলে,—কি জানি, ডাক্তারগুলো ত কিছুই করতে পারছে না। বিজিত ডাক্তার বললে,—ম্যেণ্টাল শক্। কোন্ শিরা ছিঁড়ে গেছে।—বাঁচবার আশা নেই।

চীৎকার ক'রে ওঠে আউলিয়া,—চুপ রও সব হারামীর বাচ্চা। কে বললে বাঁচবার আশা নেই! নিশ্চয়ই বাঁচবে।

—বাবা! আপনার দয়া! ঠক্ ঠক্ ক'রে কাঁপতে থাকে দু'জনে।

—কি বললি? দয়া! দেখি, আছে কি না?—নিজের বুকে হাত বুলিয়ে দেখে আউলিয়া।—অ্যাঁ, নেই, নেই, সবই শক্ত হ'য়ে গেছে। নাঃ, আছে, আছে। এই ত বুকের ভেতরটা গুর্‌গুর ক'রে উঠছে। আমি সিদ্ধপুরুষ। আমি বলছি,—বাঁচবে, বাঁচবে।

ওরা বলে,—বাঁচিয়ে দিন বাবা! আপনি—

আউলিয়া পায়চারী করে, আর হাতের লাঠি ঘোরাতে থাকে। —আলবৎ আমি বাঁচিয়ে দেবো—চীৎকাব করে ওঠে আউলিয়া আর সঙ্গে সঙ্গে নিজের পায়ের তলা থেকে মুঠো মুঠো ধুলো তুলে নিজের গায়েই মাখতে থাকে।

—রোগ সেরে যায়!—যত পাপতাপের জ্বালা জুড়িয়ে যায়।

নাঃ। বাঁচাতে হবে। কাউকে ত কোনোদিন বাঁচাতে যায় নি আউলিয়া। আজ বাঁচাতে যাবে,—শুধু এই মেয়েটিকে।

ভগবান,—আল্লা,—ঈশ্বর! সত্যি কি কেউ আছো? যদি কেউ থেকে থাকো, সাড়া দাও—সাড়া দাও।—আল্লা!—ঈশ্বর!

পায়ের ধুলো দিয়ে কি হবে? তাকে জড়িয়ে ধরব! সে বেঁচে উঠবে,—আমি সিদ্ধপুরুষ! আমি ত মিথ্যে নই,—এই ত আমি আছি। আমি,—আমি!

অ্যাঁ, আমার বুকের ভেতটা এমন করছে কেন? আউলিয়া চোখ মোছে আর চোখের সামনে হাত মেলে দেখে—এ্যাঃ! সত্যি, আমার

চোখে জল।

অ্যাঁ! কান্না, কান্নার রোল উঠেছে। ওই যে ওদিক থেকে আসছে। কারা কাঁদছে, কে কাঁদছে ?—এ কি চেরাগগুলোও নিভে যাচ্ছে। আকাশের দেউলে লাখো-লাখো চেরাগ,—লাখো-লাখো তারা, সবই নিভে যাচ্ছে।

না, না,—নিভতে দেবো না।

আকাশের দিকে লাফ দিয়ে হাত বাড়ায় আউলিয়া।

—কারা এদিকে ছুটে আসছে ?—কে ?—কে ওই মেয়েছেলে ? কাপড়ের আঁচলটা মাটিতে লুটোচ্ছে,—কাঁদছে,- বুকে কান্না আটকে গেছে।

—কে ?—কে তুই "

আউলিয়ার পায়ের উপর ওপুড় হয়ে পড়ল একটি মেয়ে। পা টেনে লাথি মেরে সরিয়ে দিতে গিয়েও পারল না আউলিয়া। তার বুকের ভেতরটায় যে বিদ্যুৎ খেলে যাচ্ছে।—কে ? কে তুই ?

মেয়েটি !—না, এক মহিলা আউলিয়ার পা জড়িয়ে ধ'রে মাথা খুঁড়ছে।

—বাঁচাও, বাঁচিয়ে দাও, আমার মেয়েকে বাঁচিয়ে দাও তুমি।

হক্‌চকিয়ে ওঠে আউলিয়া।—'আঃ-আঃ-আঃ'—বিকট এক করুণ আওয়াজ সেই তরল অন্ধকারে ঢেউ তোলে।

আউলিয়া হতভম্বের মত তাকিয়ে থাকে।

—এ কি কাণ্ড। মেয়েটার পেছনে পেছনে ছুটে এসেছে এক দঙ্গল মানুষ। ভদ্র ?—সবাই ভদ্রলোক। ঐ যে ঠক্ ঠক্ ক'রে কাঁপছে বড়ো রায়বাহাদুর।

বলো, বলো পীরসাহেব ! আমার মেয়ে বেঁচে উঠবে,—আবার কথা বলবে ? বলো,—শীগ্‌গির বলো—। আমার সুতপা—।

আর বুঝি তার মুখে কথা জোগায় না। রায়বাহাদুরের মেয়ে সেই দেমাকী মহিলা আউলিয়ার পায়ে মাথা খুঁড়ছে। হতভম্ব আউলিয়া। তারও মুখে কথা সরছে না।

—বিয়ের রাত কাল-রাত হয়ে উঠল পীরসাহেব। তুমি ত কত লোককে দয়া করে থাকো। আমার উপর কি দয়া হবে না? তোমায় সোনার লাঠি দেবো পীরসাহেব।—

—সোনার লাঠি?—বিড়বিড় করে ওঠে আউলিয়া।

—বলো, বলো, কি চাও তুমি?

পা আর ছাড়ে না। তার চোখের জলে আউলিয়ার পা ভিজে গেল। আউলিয়া চুপ ক'রে শোনে। পা ছাড়াতে গিয়েও পারে না।

—না, না, না—ছাড়ো, পা ছাড়ো।

—না। তোমার পায়ে মাথা খুঁড়ে মরব। বাঁচাও, আমার মেয়েকে বাঁচিয়ে দাও।

আরে যারা এসে দাঁড়িয়ে আছে, তাদের চোখে-মুখেও করুণ আকুতি।

—বাঁচাও,—বাঁচাও।

—কি, মরা মানুষ বাঁচাতে হবে?—ডাকো, ডাকো, তোমাদের সেই ভগবানকে। কাঁসর ঘণ্টা বাজিয়ে পূজো দাও,—বাড়ি বাড়ি নৈবিদ্যি দাও,—ছাগল-পাঠা বলি দাও—। হাঃ—হাঃ—হাঃ।

আউলিয়ার হাসিতে হাহাকার ঝরে।

মাথা খুঁড়ছে সেই মহিলা—রায়বাহাদুরের মেয়ে।

—একি? রক্ত না চোখের জল?

আঁতকে ওঠে আউলিয়া—এ্যাঁ! কে কথা বলছে। কোথা থেকে ভেসে আসছে এক ভুলে-যাওয়া সুর। কে?—কে তুমি? আকাশের দিকে তাকায় আউলিয়া,—আবার, আবার এক মিছিল, তরল অন্ধকারে ভেসে ভেসে আসছে এক মিছিল। অনেকগুলো মুখ, মুখের মিছিল! অনেকের কথা, গলায় আওয়াজ কানে ঢেউ তুলেছে। কে তুমি?

—বলো, বলো, আমার সুতপা বেঁচে উঠবে।

—এ্যাঃ! কে কথা বলছে?——এ সুর, এ আওয়াজ যে কত দূরের—অনেক দিন আগেকার। কতযুগ কেটে গেছে, কত জন্ম

কেটে গেছে। এ যে এক হারিয়ে যাওয়া সুর।

ভিজে গেল পা দুখানি। জড়িয়ে ধরে মাথা খুঁড়ছে।—এ কি? শিউরে উঠছে সমস্ত শরীর।—এ যে এক হারিয়ে যাওয়া স্পর্শ।—জাতিস্মর!

হঠাৎ জোর ক'রে পা ঝাড়া দিয়ে উঠল আউলিয়া। যেন কোন্ অতীতে ফিরে গেছে সে। তার কানে ভেসে আসছে,—বাঁচাও। বাঁচাও। ডুবে যাচ্ছি, রাজুদা!

দূর হ'য়ে গেছে তরল অন্ধকার।

এঁ্যা।—সেই মহিলাটিকে হাত ধ'রে তুলতে যায় আউলিয়া।

ওঠো,—ওঠো,—পা ছাড়ো।

এ কি? এই যে সেই দাগ। এক দিন সুরোর হাতে কামড়ে দিয়েছিল সে, সে কোন জন্মে। সেই জলে ডোবার দিন। এ কি স্বপ্ন?—চমকে ওঠে আউলিয়া।

কে?—কে তুমি?

আবার আউলিয়ার চোখের সামনে এসে সেই ছায়ামূর্তি দাঁড়িয়েছে। হাসছে,—খিলখিল ক'রে হাসছে। বাতাসও যেন কথা বলছে, তাকেই ডাকছে রাজু,—রাজীব!

পুব আকাশে রঙ ধরেছে। সেই ছায়ামূর্তিটা যেন আকাশ থেকে নেমে এসে আউলিয়ার মাঝে মিলিয়ে গেল। আউলিয়া ফিরে গেছে কোন্ এক অতীতে। সে ডাকছে—

—সই, সুরো! সই!

আউলিয়ার বুক আর গলা তোলপাড় ক'রে বেরিয়ে আসে আর্ত কান্না সুরো, সুরো! কোথায় তুমি?

চমকে ওঠে সেই মহিলা, রায়বাহাদুরের মেয়ে।

কে ডাকে আমাকে? এ নাম ত সবাই ভুলে গেছে। শুধু এক জনই এ নাম ধরে আমাকে ডাকত। সে নেই,—নেই।—নিশ্চয়ই আউলিয়া সিদ্ধপুরুষ। তা না হ'লে আমার এ নাম ধরে ডাকবে কেন?

কাঁপতে থাকে স্নুরুচিরাণী। বুকফাটা কান্নায় চীৎকার ক'রে ওঠে,—পারবে। তুমি আমার মেয়েকে বাঁচাতে পারবে। পারবে পীরসাহেব!

স্নুরুচিরাণীর চোখের দিকে তাকিয়ে কেমন যেন হয়ে পড়ে আউলিয়া। স্নুরুচির মাঝে কি যেন খোঁজে,—কিন্তু হতাশ হ'য়ে বলে ওঠে,—না, না, না।—আউলিয়া দূরে সরে যায়।

—আমায় তুমি ফাঁকি দিতে পারবে না। তুমি বাঁচাতে পারবে। ছুটতে গিয়ে হুমড়ি খেয়ে পড়ে যায় স্নুরুচিরাণী।

হাঃ—হাঃ—হাঃ।

বিকট হাসিতে গাছপালাও যেন চমকে ওঠে। আউলিয়া ছুটছে আর স্নুরুচিরাণী তাকে ধরতে যাচ্ছে। আবার তার পা জড়িয়ে যেই ধরতে যাবে অমনি পা ছুঁড়ে তাকে ঠেলে ফেলে দিয়ে ছুটে বেরিয়ে যায় আউলিয়া।

—হ্যাঁ, বাঁচবে,—বাঁচবে।—বাঁচতেই হবে তাকে।

বাতাসে ভেসে আসে আউলিয়ার কণ্ঠস্বর। ছুটছে,—ছুটছে আউলিয়া। আর আউলিয়া যেখানটায় দাঁড়িয়েছিল, সেখানকার ধুলাবালি মুঠো মুঠো করে আঁচলে তুলে নেয় স্নুরুচিরাণী।

স্নুরুচির কানে শুধু বাজছে—স্নুরো—স্নুরো—সই!

সে এক মধুর গুঞ্জন!—অতীতের বুক চিরে বেরিয়ে আসছে শুধু একটি স্নুর—স্নুরো, স্নুরো!—সই!

স্নুরুচির চোখের সামনে ভাসছে এক স্বপ্নের জগৎ। স্বপ্ন নয়, —সত্যি একদিন সে জগতেই সে মানুষ হয়েছে। একটি ছেলে— হ্যাঁ, তাদের গাঁয়েরই একটি ছেলে—

স্নুরুচি ভাবতেই পারে না। কত কথা মনে পড়ে,—স্নুরুচিরাণীরও বিয়ে হয়েছিল।—তরুণ ডাক্তার বারীন—।

বুকের ভেতরটা মোচড় দিয়ে উঠল—স্নুরুচিরাণী ছুটছে। তার মেয়েকে বাঁচাতে হবে। ওগো সে বাঁচবে,—আমার খুকী কথা বলবে।

কানের ভেতর গুন্‌গুন্‌ আওয়াজ—সই—সুরো।

আপন মনে আওড়াচ্ছে সুরুচিরাণী—সই, সুরো! কে এই আউলিয়া?

ছুটে এসে বাড়ির ভেতব ঢুকল সুরুচিরাণী।

বাসরশয্যা!—এখানে ওখানে ফুলেব ছড়াছড়ি। এমন চোখ-জুড়ানো মন-মাতানো সাজসজ্জাব জৌলুষের উপব যেন কালোছায়া পড়েছে। শয্যার উপর সুতপা যেন অসাড়ে ঘুমোচ্ছে। একপাশে বসে আছে সৌমিত্র নতুন বর। উৎকণ্ঠা তাব চোখে-মুখে। দুপাশে দাঁড়িয়ে দুটি নার্স। পাশেব চেয়ারে বসে আছেন ডাক্তার—কর্নেল চ্যাটার্জি।

নাঃ। একটু যেন সাড় এসেছে। একবাব পাশ ফিবে শুয়েছে সুতপা।—সৌমিত্রের বুকেও যেন এতক্ষণে সাড় এসেছে।

মেয়ের কাছে এসে দাঁড়াল সুরুচি। তার মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে লাগল।

কিন্তু সুরুচির কানে সে গুন গুন্‌ আওয়াজ সুরো, সুবো—সই! হঠাৎ হিঃ-হিঃ ক'রে হেসে উঠল সুরুচিবাণী।

সচকিত হ'য়ে উঠলেন কর্নেল চ্যাটার্জি।

সুতপার চোখের পাতা বুঝি নড়ে উঠল। একবার বুঝি চোখ খুলে তাকাল। অস্ফুটস্বরে কি যেন বলছে,—মা, আমাব বাবা।

সুরুচি চমকে উঠল। তাব কানে বাজছে সই, সুরো। মেয়ের কথা শুনে আবার হিঃ হিঃ করে হেসে উঠল সুরুচি,—সুরো সুরো, সই!

হিঃ—হিঃ—হিঃ।

সৌমিত্র ভাবছে। তার হাতে এসেছে একটি আংটি। হুড়ো-হুড়ির মাঝে সেই পাগলা মাস্টারটা ছুঁড়ে এই আংটিটা ফেলে দিয়েছিল। ওরা পাগলাটাকে নিয়ে ধ্বস্তাধ্বস্তি করছে আর পাগলা বলছে, শুধু একটি বার দেখতে দাও। আমি আশীর্বাদ করব

আবোল তাবোল কত কি? পাগলের খেয়াল।

কর্নেল চ্যাটার্জি একটা ওষুধ নিজের হাতে সুতপার মুখে ঢেলে দিলেন। উৎকণ্ঠার ছাপ তাঁর মুখ থেকে কেটে গেছে! আর ভয় নেই, বললেন কর্নেল চ্যাটার্জি।

কিন্তু সুরুচিরাণীর এ কি হ'ল? শুধু হাসছে আর আপন মনে বিড়বিড় করছে,—সুরো, সুরো, সই।

খবর এসেছে পাগলা মাস্টারটা পুলিশের গাড়ি থেকে ঝাঁপ দিয়ে পালিয়ে যেতে গিয়ে আর একটি চলন্ত গাড়ির তলায় চাপা পড়েছে। তখনই মারা গেছে পাগলাটা। স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন রায়বাহাদুর। তব—তবু এই শুভদিনে এ কি কাণ্ড।

সুতপার দিক থেকে ডাক্তার অভয় দিয়েছেন। সৌমিত্রের মুখের উৎকণ্ঠার ছাপ কেটে গেছে।—কিন্তু এই আংটি!

সৌমিত্র আংটিটা রায়বাহাদুরের হাতে দিল—দেখুন ত, আমার মনে হয়, পাগলাটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছিল এটা।

আংটিটা হাতে নিয়ে নেড়েচেড়ে দেখলেন রায়বাহাদুর। থরথর ক'রে তিনি কেঁপে উঠলেন। অকস্মাৎ যেন নিশ্চল হ'য়ে পড়লেন তিনি। হঠাৎ সুরুচি খপ্ ক'রে আংটিটা কেড়ে নিলে,—এ্যাঁ, আতঙ্কে কেমন যেন বিবর্ণ হ'য়ে গেল সুরুচিরাণীর মুখখানি।

রায়বাহাদুরের মুখে কে যেন কালি ঢেলে দিল। শিউরে উঠলেন রায়বাহাদুর। এ যে বারীনকে দেওয়া সেই বিয়ের অংটি!

সুরুচিরাণী হাসছে—হিঃ-হিঃ-হিঃ।

হতচকিত সৌমিত্র। রায়বাহাদুর ঠক্ ঠক্ ক'রে কাঁপছেন। তাঁর চোখের সামনে বিভীষিকা। কি ক'রে এ আংটি এখানে এল? কে এই পাগলা মাস্টার? বারীন? বারীন ত কবে পুলিশের গুলিতে মারা গেছে।

ওরে তোরা আমায় নিয়ে চল্। কোথায় সেই পাগলাটা? চল্, চল্, শীগ্‌গির চল্।—রায়বাহাদুর বেরিয়ে যাচ্ছেন।

সুরুচিরাণী হিঃ হিঃ হিঃ ক'রে হাসছে—সুরো, সুরো, সই!

পাগল হয়ে গেছে সুরুচিরাণী।

আউলিয়া রজব ছুটে চলেছে। তাকে হাতছানি দিয়ে কে যেন ডাকছে। তার চোখে আজ নতুন দৃষ্টি, এত দিন পরে তার খোঁজা-খুঁজির যেন শেষ হ'য়ে গেছে

ঐ যে আকাশের পর্দা খুলে গেছে। অন্ধকার আর নেই। তার উপর পড়েছে আলোর ছোপ। সোনালী কাঁকন-পরা কালো মেয়ের হাত তু'খানি বাঙাজবার থালা এগিয়ে দিচ্ছে পুবের আকাশে।

ঐ যে সেই সূর্য আর কালো মেয়ের খেলা শুরু হ'ল। আলো আর অন্ধকারেব খেলা।

এই পৃথিবীটা কোন আদি কাল থেকে এই খেলা দেখে আসছে। তারও বুকে চলেছে এই খেলা। মিলন আর বিরহ, জন্ম আর মৃত্যু। ভেল্‌কি দেখায় এই পৃথিবী। তারও রূপ পালটায়। তারও কি দয়া আছে, মমতা আছে? তার উপর যারা আসে, যাদের জন্ম দেয় এই পৃথিবী, তাদের কি সত্যি ভালবাসে?

পৃথিবীর বকেই মিশে যায় পৃথিবীব মানুষ। তাদের হাসিকান্না একদিন থেমে যায়। নিত্য চলছে এই খেলা। কেমন সহ্য করছে এই পৃথিবী। হাসি কান্নার পর চিতা জ্বলে, আগুন, শ্মশানের আগুন।

ঘর বাঁধে মানুষগুলো। বড় সাধের ঘর ঘরনী, ছেলেমেয়ে, স্বজন। সবই ছেড়ে চলে যেতে হয়। তবু বাঁধে। দিন দিন এগিয়ে চলেছে, না নতুন ক'রে যে জন্ম নিচ্ছে তা বুঝতেও পারে না তারা।

দিনে দিনে তিলে তিলে মানুষ এগিয়ে চলে,—নেয় নতুন জন্ম। তার যে রূপান্তর ঘটে, রূপ পাল্টায়, তা চলার পথে বুঝতেই পারে না। তাই ত হারানোর ব্যথা বড় বাজে।

আপন মনে হাসছে আর বিড় বিড় ক'রে আওড়াচ্ছে আউলিয়া —হাঁ পেয়েছি, আবার ফিরে পেয়েছি।

তার হারানো অতীত ফিরে এসেছে। এত দিনের খোঁজাখুজির বুঝি আজ শেষ হ'ল। ধরা দিয়েছে হারানো অতীত।

কিন্তু তার যে রূপ পালটে গেছে। ইচ্ছে করলেই তাকে ধরা

যায় না। তার সুরো, তার সেই সই নতুন রূপ ধরে তার সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। আবার তারই দয়া ভিক্ষা করছে।

—এ্যাঁ, বাঁচাও, বাঁচাও রাজুদা!

সুরো কি তলিয়ে গেল? কাজলপুকুরে তলিয়ে যাচ্ছে সুরো। ঐ যে শুধু তার হাত দু'খানি জলের উপরে দেখা যাচ্ছে।

না, না, না। এ সুরো নয়, সে যে স্বপ্নের সুরো! সেই সুরো পালটে গেছে। নতুন রূপ ধরেছে সুরো। সে আজ সুরুচিরাণী। মান্যগণ্যা মহিলা। দেশের সব লোকই তাকে মান্যি করে।

দয়া ভিক্ষা করছে—তার পা দুটি জড়িয়ে ধরেছে সুরুচিরাণী। —আউলিয়া যে সিদ্ধপুরুষ। তার দয়ায় কি না হয়? ডাক্তার-কবরেজ যা পারে না, তার পায়ের ধুলোতে তাও হয়।

হাঃ—হাঃ—হাঃ।

আউলিয়া হাসছে, আর ছুটছে। নাঃ। আর ধরা দেবে না। কিন্তু এ কি হ'ল। তারই চোখের সামনে সুরুচিরাণী। এত দিন কি চোখে দেখেনি আউলিয়া। তা চিনবে কি ক'রে? সেই সুরো ত আর নেই।

সুরোর নবজন্ম হয়েছে। এই একই জন্মের মাঝে তিল তিল ক'রে রূপ পালটায়,—মানুষ পালটে যায়। তার হয় নবজন্ম। পুরনো অতীত লুকিয়ে থাকে নতুনের আড়ালে।

শুধু কি সুরো?

আজ কোন এক পরশকাঠির পরশ পেয়ে গেছে আউলিয়া,—তার সকল বাঁধা কেটে গেছে। সেই রাজীব রজব হয়েছিল। রাজীব যে সুরোকে কত ভালবাসত, তা কি রাজীব সেদিন বুঝেছিল!

ধাঁধায় পড়েই রাজীব রজব হ'ল। আবার সাকিনা এল। সাকিনা আর আনোয়ার!

তারপর সবই অন্ধকার,—আগুন জ্বলেছিল। সেই আগুনেই সব পু'ড়ে ছাই হয়ে গেল।

ওই মানুষগুলোই দুশমনি ক'রে তাকে আউলিয়া ফকির বানিয়ে

দিলে। সাধু হ'য়ে, ছনিয়াটা নতুন চোখে দেখল।—হ্যাঁ ঈশ্বর, আল্লা,—আকাশের দিকে তাকিয়ে কত খুঁজেছে কোনো হদিসই পায়নি।

এতদিন কি যেন এক আলেয়ার পিছু পিছু ঘুরে মরেছে আউলিয়া। কোনো কূল-কিনারা পায় নি। আর কোনোদিন কূল-কিনারা পাবেও না। অতীত মায়াজাল বুনে ফাঁদ পেতে পিছু ডাকে,—কিন্তু ফেরাবার সাধ্য তার নেই।

পিছু ডাকে,—পিছু ডাকে। হাতছানি দেয়, ওই যে মিছিল চলেছে। এই মিছিল দেখে দেখেইএ গিয়ে যেতে হবে।

এঁ্যা, সুরো ডাকছে—তার মেয়েকে বাঁচাতে হবে।

তাই হোক্,—তাই হোক্,—এই যে ওই মিছিলের মাঝে শুধু সুরোরই মখ ভাসছে দেখছি,—সব মুখগুলো কি সুরোর? তাই ত! সুরো? কই?—তোর মেয়ে—বাঁচবে,—বাঁচবে, ভয় নেই।

আমার কথা মিথ্যা হ'তে পাবে না। আমি আউলিয়া সিদ্ধপুরুষ। যমদূত আমার কথা শোনে,—হাঃ—হাঃ—হাঃ।

উপরের দিকে হাত তুলে আকাশের গায় কার যেন মূর্তি দেখে আউলিয়া—খোদা—ঈশ্বর! বাঁচাও, বাঁচাও।

আউলিয়ার বুক চিরে যেন কথাগুলো বের হচ্ছে,—বাঁচাও, বাঁচাও।

এই তার প্রথম প্রার্থনা। এরকম আর কোনো দিন ক'রে নি আউলিয়া।

আজ তার বুকের ভেতরটা যেন গুমরে উঠছে। তারও যে মায়া-মমতা আছে! মনটা কেমন নরম হয়ে গেল!—বুকে হাত বুলিয়ে দেখে আউলিয়া। সত্যি,—বুকের মাংসও কেমন থলথলে নরম হয়ে গেছে।

ঈশ্বর কে আউলিয়া তা জানে না। ওই সাধুসন্ত, ফকিরগুলোও তাকে তার সন্ধান দিতে পারেনি! মানুষগুলো তাকেই ঈশ্বর বানিয়ে বসেছে,—সিদ্ধপুরুষ।

ভাঙা আর গড়া!—জন্ম আর মৃত্যু!—সবই ত আপনাআপনি চলেচে! কোথায় ঈশ্বর?—কোথায় আল্লা?— কাল,—মহাকাল,—ঐ যে, ঐযে লম্বা রাজপথ,—। তার এমোড়ও দেখা যায় না, ওমোড়ং কোথায় কে জানে? শুধু চলতে হবে। রাজপথের ধূলোকাদাও সঙ্গে যাবে না।

—মিছিল। আকাশে-বাতাসে মিছিল। সবই মিশে রয়েছে আকাশে-বাতাসে। যাদের চোখ আছে, তারাই দেখতে পায়। কানে শোনা যায়—তাদের কথা,—কতযুগের কত মানুষের কথা।

ঝিলমিল করছে প্রভাতী সূর্য!

সূর্যটাও হাসছে।—সুরো, সুরো,—সই!

সুরো আমাকে চিনতে পারলে না। যে রাজুদাকে সে এ: ভালবাসত, সেই রাজুদাকে চিনতে পারলে না! কি আশ্চর্য!

আঃ!—অতীত ফিরে এসেছে আউলিয়ার সামনে।— এই যে কাজলপুকুর! সুরো জলে ডুবে যাচ্ছে!—না, না, ঢিল ছুঁড়ে মারছে দুষ্টু মেয়েটা। আর সেই রাত! আমবাগানের পথে রাজুকে আটকে রেখে কত কথা বলেছিল সুরো। তার পায়ে হাত দিয়ে চোখের জল ফেলেছিল।

আর দেখেনি সুরোকে। আর দেখেনি আউলিয়া। বারীন: এসেই যত গোল বাধালে। সুরোকে কেড়ে নিলে বারীন।

কে শোধ তুলেছে? বারীন না সুরো—সুরুচি? সে যে কোন যুগের কথা। আজ বারীন কোথা?

হ্যাঁ, পাগলা মাস্টার। কে ওই পাগলা? সুতপা মূর্ছা গেছে। কেন? কেন এমন হ'ল?

ওরা ত তারই কাছে ছুটে এসেছে। আউলিয়া রোগ সারিয়ে দেবে! রাজুর কাছে সুরো আসেনি। আবদার করতে আসে নি সুরো,—রাজুদা, ওই আমটা পেড়ে দাও। একটা টিয়াপাখি ধ'রে দিতে হবে। সেই সুরো কোথায়? সুরুচিরাণীর মাঝেই সুরোর মৃত্যু ঘটে গেছে।

, সুরো আমাকে চিনতে পারলে না। আমি ত তাকে চিনতে পেরেছি। শুধু সেই হাতের দাগ—দাঁতের কামড়। চিহ্ন র'য়ে গেছে। দরদর ক'রে রক্ত ঝরেছিল। সেদিন এমন কামড় না দিলে দু'জনেই দম বন্ধ হয়ে জলের তলায় তলিয়ে যেতাম। গলাটা জড়িয়ে ধরেছিল সুরো।

আউলিয়া নিজের গলায় হাত বুলিয়ে দেখে, এখনো যেন সে হাতের স্পর্শ অনুভব করছে। হাসির ঝিলিক আউলিয়ার মুখে।

আঃ! সুরো, সুরো, সই!

এই যে আবার সানাই বাজছে। সুরুচির মেয়ে উঠে বসেছে। ওই ত সানাই বাজছে। সানাই বাজছে, কথা কইছে সানাই। ভূতপাও কথা কইছে।

হাঃ—হাঃ—হাঃ।

প্রভাতী বাতাসে হাসির ঢেউ খেলে যায়।

থমকে দাঁড়ায় আউলিয়া। অন্ধকার আর নেই, মনে পড়ে যায় হিমালয়ে সেই সাধুবাবার কথা,—অন্ধকারের বুক চিরে জন্ম নেয় আলো, আবার অন্ধকারের বুকেই মিলিয়ে যায়। অন্ধকারকে কি ভয় ব্যাটা? আরাম দেয় ঐ অন্ধকার। দেয় বিশ্রাম, দেয় ঘুম,—নিদ্রা। আবার জাগাব, নতুন জন্ম পাবি।

আউলিয়ার জীবনের অন্ধকার কেটে গেছে। নতুন জন্ম পেয়েছে আউলিয়া। ওই যে সূর্য হাসছে, আলো ছড়িয়ে দিচ্ছে। দিনের আলোই জীবন, তারপর আবার অন্ধকার, আবার মৃত্যু।

শুধু এগোতে হবে, এগিয়ে যেতেই হবে। পেছনে ফেরবার উপায় নেই। রূপ থেকে রূপান্তর ঘটছে, চারাগাছ মহা বৃক্ষে পরিণত হচ্ছে। আর ত সে চারাগাছে ফিরে যেতে পারবে না।

রূপান্তর—মৃত্যু, নবজন্ম! সামনে সাগরদীঘি।

দীঘির জলে ভোরের আলো ঝিক্‌মিক্‌ করছে। বাতাস খেলছে দীঘির জলে, শিউরে শিউরে উঠছে দীঘির বুক। ছোট ছোট ঢেউয়ের লহরে লহরে আলোর ঝিলিমিলি।

কাজল দীঘি !—কাজল পুকুর চোখের সামনে।

হাসির ঝিলিক আউলিয়ার চোখেমুখে। নাঃ, ঐ যে ফি এসেছে, ফিরে এসেছে ফেলা-আসা সোনালী রঙিন দিনগু সাঁতার কাটতে হবে। সাঁতার কেটে অতীতে ফিরে যা আউলিয়া.--ঐ যে ওপারে জামগাছটার তলায় দাঁড়িয়ে সুরো,—দুষ্টু মেয়ে। চোখে তার দুষ্টুমির হাসি !

মুঠো মুঠো জাম কুড়িয়ে নিয়ে ছুঁড়ে দেয় সুরো। হাসছে, শু কেমন জব্দ ! রাজুদা ! কেমন জব্দ !

--দাঁড়া, দাঁড়া ! মজা দেখাচ্ছি।

সাগরদীঘির জলে ঝাঁপিয়ে পড়ে রজব আউলিয়া। ঝপাঝপ শব্দে জলটা তোলপাড় হ'ল। ওপাশে দুটো রাজহাঁস সাঁতা কাটছিল। ওরা চমকে ওঠে—ক্যাঁ-ক্যাঁ আওয়াজ তুলে দূরে সরে যায়।

কি ভাবছে আউলিয়া ? সোনালী রোদের ছাপ পড়েছে তার চোখেমুখে। তৃপ্তির আনন্দে আজ আউলিয়ার মন ভরপুর। ফিরে গেছে সে সোনালী অতীতে।

ফুর্‌ফুরে হাওয়া ! হিঃ-হিঃ ক'রে হাসছে রাজীব। তার খেলার সঙ্গীরা সকলেই ফিরে এসেছে। কাজল পুকুরে নামছে তারা। ওই যে সুরো, --সুরুচি।

সাগর দীঘির জল,—কাচের মত স্বচ্ছ।

আঃ !—আজল ভ'রে জল তুলে খেলা করতে যায় আউলিয়া। জল ছুঁড়ে মারবে—

এ্যাঁ !—দীঘির জলে পড়েছে তার ছায়া,—প্রতিবিম্ব। নিজের ছায়ার দিকে তাকিয়ে থমকে যায় আউলিয়া।

—এ কি ? কার এই মূর্তি ?—আমি ? কোথায় আমি ? এ তো আমি নই !

রাজহাঁসগুলে রছে। তার চোখের সামনে থেকে ছায়ামূর্তিগুলো মিলিয়ে গেছে। কোথায় কে ?

আঃ—আঃ—আঃ!

আর্ত স্বরে চীৎকার করে ওঠে আউলিয়া,—কোথায় আমি! আমি রাজীব,—রাজীব কোথায়? কার মূর্তি? জটা-জটা চুল,—লম্বা লম্বা দাড়ি। সব পেকে পিঙলে হয়ে গেছে। ভূত না প্রেত? নিজের ছায়ার দিকে তাকিয়ে চমকে ওঠে আউলিয়া।

বিদ্রূপ করছে তারই ছায়ামূর্তি।

দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে আউলিয়া।

চোখের সামনে নিজের হাত মেলে ধরে। আঙুলগুলো নেড়ে পরখ ক'রে দেখে আউলিয়া। নিজের দেহের দিকেও তাকায়। বুকটাও টিপে টিপে দেখে।

এ্যা! কত বছর, কত কাল কেটে গেছে। রাজীব মরে গেছে। কত সুন্দর ছিল রাজীব। রাজীবকে দেখলে সকলের চোখ জুড়াত। আর সেই রাজীবের দেহ ভর ক'রে দাঁড়িয়ে আছে আজ কার মূর্তি?

সিদ্ধপুরুষ আউলিয়া। ভয়াল তার মূর্তি।

নিজেকে ভেংচি কাটে আউলিয়া।

রাজীব পালটে গেছে। আর সুরো? সুরো কি সেই সুরোই রয়ে গেছে? সুরোও পালটে গেছে। রাজীব নেই, সুরোও নেই। সুরুচিরাণী আর আউলিয়া কেউ কাউকে চেনে না।

—তব আমি চিনেছি। সে কোন আমি? হঠাৎ রাজীব জেগে উঠেছিল। পরশ কাঠির পরশ পেয়েছিল রাজীব। সুরো পালটে গেছে, শুধু রয়ে গেছে সেই চিহ্নটা। তা আজো মুছে যায়নি। সুরো আমাকে চিনতে পারে নি। কেন? কেন?

ক্যাঁ-ক্যাঁ-ক্যাঁ,—হাঁসগুলো ডাকছে।

আমি! আমি!—কোথায় আমি! নিজের গায়ে খামচে খামচে রক্তারক্তি ক'রে আউলিয়া। চুল আর দাড়ি ছিঁড়তে থাকে।

রক্ত ঝরছে। তার দিকে খেয়াল নেই। সাঁতার কাটা আর হ'ল না। নিজের ছায়ামূর্তির দিকে তাকিয়ে ভেংচি কাটে আর বলে,—বল্ বল্, কোথায় আমি?

জল থেকে উঠে পড়ল আউলিয়া।

যারা সামনে এসে দাঁড়িয়েছিল, তারা কোথায়? সে কি স্বপ্ন দেখছিল? কোথায় কাজল পুকুর? আবার নিজেকে হারিয়ে ফেলে আউলিয়া।

দীর্ঘপথ। পথের শেষ নেই। শুধু পথ ভাঙতে হবে। যারা হারিয়ে গেছে, তাদের খুজে বের করতে হবে। রাজীব আর বজর হারিয়ে গেছে।

পথে চলে যাযাবর আউলিয়া।

দিনের শেষে সূর্য ডুবছে। তার মাঝে আউলিয়া পায় নতুন ইঙ্গিত। অতল অন্ধকারে ডুবছে সূর্য। অন্ধকারের অতলে খুঁজতে যাচ্ছে নিজের দয়িতাকে। আবার ফিরে আসবে, আবার জন্ম নেবে সূর্য। আবার চলবে পরিক্রমা। যুগের পর যুগ খুঁজেই চলেছে। পেয়েছে কি তার দয়িতাকে? বিরাম নেই, বিশ্রাম নেই, কতকাল খুজতে হবে কে জানে?

ডুবন্ত সূর্যের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে পথ চলে আউলিয়া।

শেষ